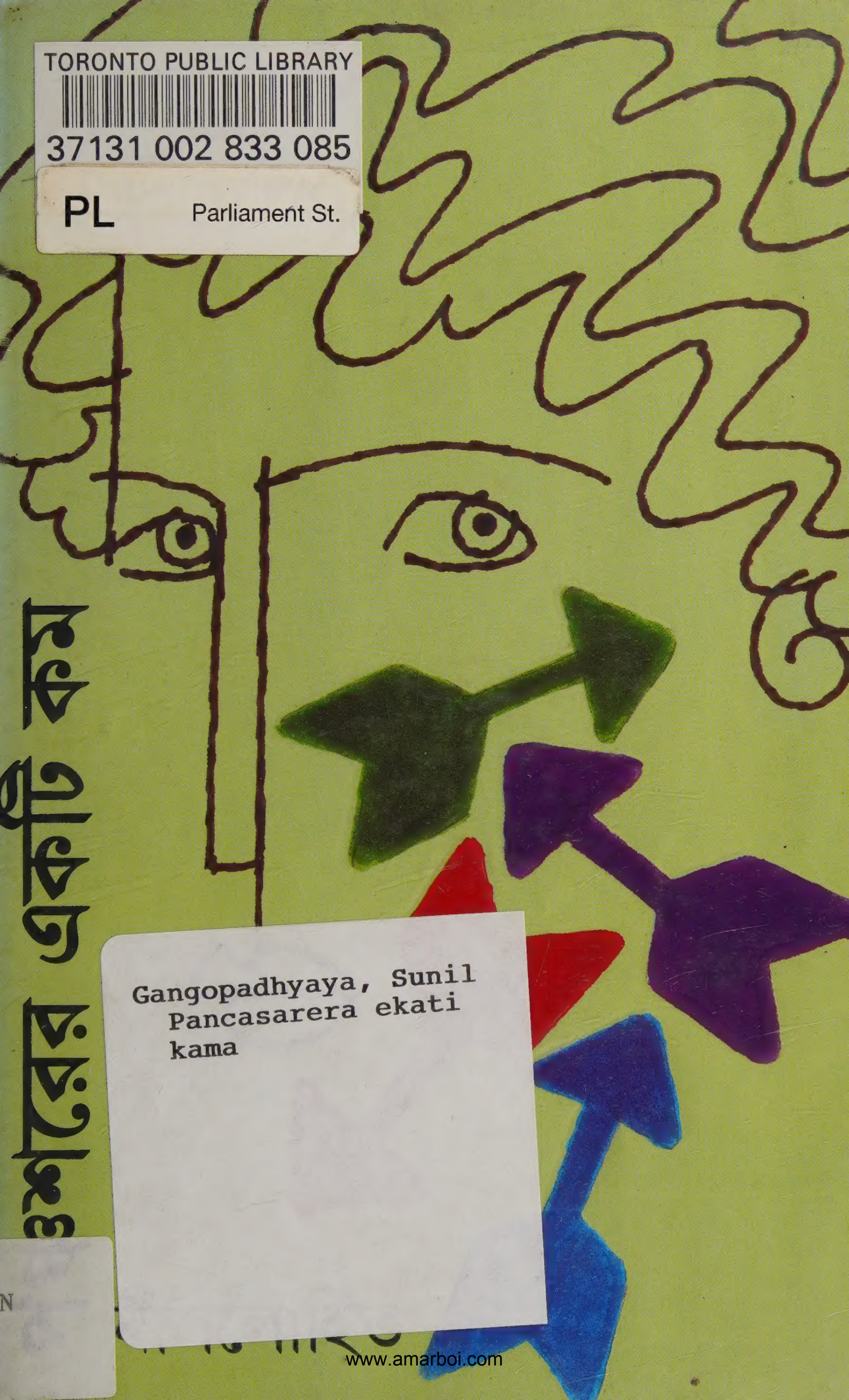

TORONTO PUBLIC LIBRARY
37131 002 833 085
PL Parliament St.

Gangopadhyaya, Sunil
Pancasarera ekati
kama

www.amarboi.com

'পঞ্চশরের একটি কম' গল্পের আদি-অন্ত ছেয়ে আছে এক মিষ্টি প্রেমের আবহে। প্রথমাকে ভালবাসতে চায় আলোকচিত্রী প্রীতম। তার কাছে খবর আছে মায়ের সঙ্গে সে বেড়াতে গেছে ঝাড়গ্রামের কাছে চিলকিগড়ে। সেখানে শোভন রায়ও গেছে। এই লোকটি জুনের সঙ্গে ভাব জমাতে চায়। প্রীতম ওর বন্ধু নীললোহিতকে পাঠালো চিলকিগড়ে জুন আর শোভনের মেলামেশা কতদূর গড়িয়েছে দেখার জন্য। সেখানে গিয়ে আশ্চর্য সব ঘটনার মুখোমুখি হল নীললোহিত। তারপর?

'গভীর রাতে দিঘির ধারে' উপন্যাসের কাহিনী জুড়ে এক আধিভৌতিক বাতাবরণ। ঝরনামাসি, রবীনমেসো আর ওঁদের ছেলেমেয়ে টিনা এবং রণের সঙ্গে নীললোহিত বেড়াতে এসেছে পাড়াগাঁ ভোলানাথপুরে। এখানে রবীনমেসোর পূর্বপুরুষদের বিশালবাড়ি। ওরা আসার পর থেকেই বাড়িটায় ঘটতে থাকে নানা ভৌতিক কাণ্ড। চূড়ান্ত দুর্বিপাক ঘটে বাড়ির পুকুরে একটি মেয়ের আত্মহত্যার ঘটনায়। নীললোহিত আবিষ্কার করে এক গভীর রাতে পাশের গ্রামের এক পুকুরের দিকে এগিয়ে চলেছে ঝরনামাসি। কিন্তু কেন?

ডায়মন্ডহারবারের কাছে এক নির্জন গ্রামে, একটি বাড়ির তিনতলায়, নীললোহিত চকিতে দেখে ফেলল রুমাবউদিকে। ভদ্রমহিলা এখানে কেন? একটি কচ্ছপ চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে নীললোহিত ঢুকে পড়ল সেই রহস্যময় বাড়িতে। রুমা বউদির সঙ্গে আবার দেখা হয়ে গেল। কিন্তু এ কোন রুমা বউদি? মহাভারতের কুন্তীর মতো তার এই গোপন ভুবনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নীললোহিত হতবাক্। নীলুর ভূমিকা সেই মুহূর্তে কর্ণের মতো কি?

ISBN 81-7756-258-4

www.amarboi.com

22

www.amarboi.com

পঞ্চশরের একটি কম

নীললোহিত

আ ন ন্দ

www.amarboi.com

www.amarboi.com

পঞ্চশরের একটি কম

www.amarboi.com

www.amarboi.com

আমার বন্ধু প্রীতমের অনেক গুণের মধ্যে একটা শুধু মস্ত দোষ, যখন তখন বাড়িতে চলে আসে। এসে এমন ভাব করে, যেন তার সব অতি দরকারি কথা শোনার জন্য আমাকে সব সময় তৈরি থাকতে হবে।

বন্ধুদের দেখা পেলে ভালই লাগে, তা বলে ভোর পাঁচটায়?

আমি ঘুম-কাতুরে, অনেক বেলাতেও ডাকাডাকি না করলে সহজে উঠি না।

অনেকে সূর্য ওঠার আগেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে প্রাতর্ভ্রমণে যায়। সেই সময়কার তলতলে আকাশ আমি জীবনে মাত্র দু-একটি বার দেখেছি বাধ্য হয়ে।

অনেকে জিজ্ঞেস করে, তুই এতক্ষণ ধরে ঘুমোস কেন রে, নীলু?

আমার খুব সহজ উত্তর আছে। আমি কি মোরগ যে সূর্য উঠতে না উঠতেই ঝুঁটি তুলে কোঁকর-কোঁ করব? সেটা তাদের ডিউটি। পৃথিবীতে সবচেয়ে আগে জেগে ওঠার কথা পাখিদের, কারণ তারা সন্ধে হতে না হতেই ঘুমিয়ে পড়ে। তারপর জাগবে বাচ্চা ছেলে-মেয়েরা, রাত আটটা-নটা বাজতে না বাজতেই যে তাদের জোর করে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া হয়। তাই তারা সকালবেলা আগে আগে উঠে মা-বাবাদের জ্বালাতন করে প্রতিশোধ নেয়।

ছোটবেলা ইস্কুলে পড়ার সময় বাবা রোজ সকাল ছটা-সাড়ে ছটার মধ্যে পড়তে বসাতেন। শীত-গ্রীষ্ম সমান। তখন মনে হত, ওঃ কবে যে বড় হব, ইস্কুল-কলেজের হাত থেকে মুক্তি পাব, আর স্বাধীনভাবে যত রাত পর্যন্ত ইচ্ছে জেগে থাকব, যত বেলা পর্যন্ত ইচ্ছে ঘুমোব! বড় হয়ে ওঠার শুধু এই একটাই সুবিধে।

ভোরবেলা জাগতে হলে আমার বেশ রাগ হয়। তার কারণ ভোরের দিকেই ভাল ভাল স্বপ্ন দেখি। এক একদিন এমন একটা মধুর স্বপ্ন চোখে লেগে থাকে যে তা নিয়েই সারাদিন বিভোর হয়ে থাকা যায়।

প্রীতম বাড়ির মধ্যে কী করে ঢুকে পড়ল কে জানে। হয়তো এমন জোরে দরজা খটখটিয়েছে যে বাড়ির কেউ বিরক্ত হয়ে উঠে এসে খুলে দিয়েছে, ওকে বকুনিও দিয়েছে নিশ্চয়ই, কিন্তু প্রীতমের তাতে লজ্জা নেই।

আমার ঘরের দরজায় ছিটকিনি থাকে না। প্রায় রাতেই বই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়ি, আলো জ্বালা থাকে, মা কোনও এক সময় এসে নিভিয়ে দেয়। মা-বাবা শ্রেণীর মানুষেরা রাত্তিরে বেশ কয়েকবার জাগে, আবার ঘুমিয়েও পড়তে পারে। আমাদের তো সারারাত এক ঘুম।

প্রীতম ডাকাডাকির ধার ধারে না।

প্রথমেই এসে গা থেকে কম্বলটা সরিয়ে ফেলে। ভোরবেলাই শীত পড়ে বেশি, তখন কম্বল কেড়ে নেওয়ার মতন নিষ্ঠুরতা আর হয়? তবু শরীরের গরমটা কিছুক্ষণ

থাকে, তারপর শিরশিরে ভাব আসে, তখন গা মোড়ামুড়ি দিয়ে অন্ধভাবে কম্বলটা খুঁজতে হয়। এই সময়টায় প্রীতম শুরু করে কাতুকুতু দিতে। রুমাল পাকিয়ে ঢুকিয়ে দেয় নাকের মধ্যে।

চোখ মেলেই প্রথম মনে হয়, খাটের পাশে দাঁড়িয়ে আছে যমদূত। এই রে, আমাকে নিতে এসেছে বুঝি। এত তাড়াতাড়ি?

প্রীতমকে যমদূত বলা অবশ্য খুবই অন্যায়, ও জানতে পারলে দুঃখ পাবে। প্রীতমের চমৎকার চেহারা, সব সময় সেজেগুজে ফিটফাট থাকে। জামা-কাপড়ের ব্যাপারে বেশ শৌখিন। এখন রোজগারও করছে অনেক টাকা। ফটোগ্রাফার হিসেবে প্রীতম সেনগুপ্ত অনেক প্রাইজ পায়।

প্রীতম প্রথম কথাটাই বলল, এই নীলু, চিলকিগড় কোথায় রে?

কোনও একজন বিখ্যাত মহাপুরুষ বলেছেন, ভোরবেলা যে যত ভাল ভাল স্বপ্ন দেখে, তার জীবন তত বেশি সুন্দর হয়। কে বলেছেন, তা অবশ্য মনে নেই।

আমিও কী যেন একটা ভাল স্বপ্নই দেখছিলাম, তা ভাঙিয়ে দিয়ে এরকম একটা বিতিকিচ্ছিরি প্রশ্ন করার কোনও মানে হয়?

প্রীতমের স্বভাবই এরকম। ও ভূমিকা করতে জানে না, সব কিছুই মাঝখান থেকে শুরু করে।

ওর কথায় পাত্তাই না দিয়ে আমি বললুম, পাশে জায়গা আছে, শুয়ে পড়। আরও ঘণ্টা দুয়েক ঘুমিয়ে নেওয়া যাবে।

প্রীতম বলল, মাথা খারাপ! এমন চমৎকার ভোর হচ্ছে। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাওয়া। এই হাওয়া গায়ে লাগালে কী ভালই না লাগে!

তুই হাওয়া লাগিয়ে আয়।

আমি তো প্রায়ই ভোরে বেরোই। চল, তুই আজ আমার সঙ্গে হাঁটবি। একটা কথা আছে জানিস না, ভোরের হাওয়া লাগলে গায়, সকল অসুখ দূরে যায়!

বোঝা গেল, আমার আর ঘুমের আশা নেই। ভাঙা স্বপ্ন আর ফিরিয়ে আসাও যায় না। প্রীতম এখন বকবক করে যাবেই।

বেরিয়ে গিয়ে বাথরুমে চোখ-মুখে জল দিয়ে ও জল ছেড়ে ফিরে এসে তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বললুম, মেথর, মুদ্দোফরাস।

কী? কাকে বললি?

তোকে নয়। তুই যে বললি, ভোরের হাওয়া লাগলে গায়, সকল অসুখ দূরে যায়। তাই যদি সত্যি হত, তা হলে মেথর আর মুদ্দোফরাসদের কোনওদিন কোনও অসুখ হত না। ওরা বেশিদিন বাঁচত, তাই না? তুই আজ পর্যন্ত কোনও বুড়ো মেথর দেখেছিস?

বুড়ো মেথর?

ওরাই তো ভোরের হাওয়া রোজ গায়ে মাখে। থুত্থুড়ে বুড়ো মুচি দেখতে পাবি, বুড়ো ধোপা, বুড়ো মাস্টার, বুড়ো বড়বাবু, বুড়ো ভিখিরি, কিন্তু একটা বুড়ো মেথর খুঁজে বার কর তো!

www.amarboi.com

প্রীতম এমনভাবে চোখ সরু করে তাকাল, যেন কালই সে যেখান থেকে পারে একটা বুড়ো মেথরের ছবি তুলে আনার চেষ্টা করবে!

আমি বললুম, ইংরিজিতে একটা কথা আছে না, অ্যান অ্যাপল আ ডে, কিপ্‌স দা ডক্টর অ্যাওয়ে। তার মানে কী বল তো? রোজ একটা করে আপেল ছুঁড়ে মারবি ডাক্তারের দিকে, কোনও ডাক্তার ভয়ে তোর বাড়ির দিকে আসবে না!

প্রীতম বলল, আমি অবশ্য আপেলটাপেল খাই না।

আমি বললুম, মহাত্মা বিশেষানন্দ বলেছেন, যে ব্যক্তি অপরের কাঁচা ঘুম ভাঙায়, সে সারা জীবন অনিদ্রা রোগে ভোগে!

প্রীতম উঠে দাঁড়িয়ে বলল, নীলু, এই মহাত্মা বিশেষানন্দ কে, আর কোন বইতে এ কথা লেখা আছে, আমাকে পরে লিখে দিস! আমি সারা রাত ঘুমোতে পারিনি, মাথার মধ্যে শুধু ঘুরেছে, চিলকিগড়! চিলকিগড়!

বদহজম হয়েছে। জেলুসিল খাসনি কেন?

খেয়েছি। কোনও কাজ হয়নি। চল বেরোই। মোড়ের মাথায় দেখলুম, জিলিপির দোকানটায় উনুন ধরাচ্ছে, এক্ষুনি ভাজা শুরু করবে। গরম জিলিপি স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব ভাল, তা তো মানবি?

তা মানি। বিশেষত রাত্তিরে ঘুম না হলে সকালে জিলিপি খুবই উপকারী। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, ও দোকানটায় আমার বত্রিশ টাকা ধার আছে, তাই ক'দিন ও দোকানের সামনে দিয়ে যাচ্ছি না।

তোর এ কথাটা যদি সত্যি হয়, এই বত্রিশ টাকা আমি এক্ষুনি শোধ করে দেব। ভোরবেলাতেই বউনির সময় ধারের টাকা পেলে লোকটা খুশি হয়ে আশীর্বাদ করবে। আর যদি সত্যি না হয়, তোর বত্রিশ টাকা ফাইন।

রাত্তিরে শোওয়া পা-জামাটার ওপরেই চাপিয়ে নিলাম একটা পাঞ্জাবি। বাইরে শীত লাগবে, তাই খুঁজতে লাগলুম শালটা। দেখি যে, সেটা চেয়ারের গায়ে, আর প্রীতম তার ওপরেই আবার বসে পড়েছে।

ওঠ, আলোয়ানটা নেব।

আলোয়ান? এটা তো একটা নস্যি রঙের শাল দেখছি। আলোয়ান আবার কী?

তা জানি না। শাল আর আলোয়ানে নিশ্চয়ই তফাত আছে। আমার বাবা আলোয়ান বলতেন। এটা বাবার জিনিস, তাই আমি আলোয়ানই চালিয়ে যাচ্ছি!

পাঞ্জাবিটাও তোর বাবার?

ধ্যাৎ! বাবার সব পাঞ্জাবির পকেট ফুটো থাকত।

এটাকেও তো দেখে মনে হচ্ছে, তিরিশ-চল্লিশ বছরের পুরনো।

পুরনো পোশাক খুব মোলায়েম হয়। এটা আমার ছোট মামার।

আর পা-জামাটা?

এটা তুই-ই তো আমাকে দিয়েছিলি, মনে নেই?

তোকে আমি অনেক কিছু দিয়েছি, কিন্তু পা-জামা কখনও দিইনি। জুতোও দিইনি, ঠিক কি না? আমার এই সোয়েটারটা কেমন রে?

www.amarboi.com

প্রীতম মাত্র ক'দিন ধরে এই ফুলহাতা, সামনে কাটা সোয়েটারটা পরছে। তার মানে নতুন। খুব উজ্জ্বল হলুদ রঙের, তার মধ্যে অস্পষ্টভাবে একটু সবুজও মিশে আছে। লেবু-হলুদ বলা যেতে পারে। সত্যি সুন্দর। প্রীতমকে ভাল মানিয়েছে।

নীলু, তুই মাঝে মাঝে এই সোয়েটারটার দিকে দু -তিন পলক বেশি তাকিয়ে থাকিস। তার মানে, এটা তোর বেশ পছন্দ। এই সোয়েটারটা আমি তোকে দিতে চাই, আজই, এক্ষুনি!

ভাই প্রীতম, অন্যের কোনও পোশাক ভাল লাগলে বা সেটার প্রশংসা করলেই যে সেটার জন্য লোভ করতে হবে, সেরকম শিক্ষা তো আমি পাইনি! তোর টিকোলো নাকটাও তো দেখতে আমার বেশ ভাল লাগে। তা বলে কি আমি তোর নাকটা চাইব?

বাজে তুলনা দিস না। তোকে সোয়েটারটা এমনি এমনি দিচ্ছি না। তার বদলে তোকে একটা কাজ করতে হবে। তোকে চিলকিগড় যেতে হবে। কোথায় জানিস তো?

চিলকিগড় নামটা শোনা শোনা। ঠিক কোথায়, মনে পড়ছে না। এত ভোরে কি আর স্মৃতির সব দরজা খোলে? সূর্যের আলো পরিষ্কার হলে ফুল যেমন বিকশিত হয়, তেমনি মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি কাজ করতে শুরু করে।

কিন্তু সে কথা প্রীতমকে এখন জানাবার দরকার নেই।

সারা দেশে এত জায়গা থাকতে কেন আমাকে চিলকিগড় যেতে হবে। সেটা আগে বল!

তোকে বিশেষ কিছুই করতে হবে না, তুই চিলকিগড় যাবি, কোনও একটা হোটেলে উঠবি, খাবিদাবি, ব্রেকফাস্টে ডাবল ওমলেটও খেতে পারিস, ইচ্ছে মতন ঘুরে বেড়াবি! ব্যস, আর কিছু না। সব খরচা আমার।

তোর সঙ্গে কোথাও বেড়াতে গেলে এই এক ঝামেলা, সুন্দরভাবে ঘুমোবার উপায় নেই, তুই ভোরের স্বপ্ন ভাঙিয়ে দিবি!

আমার সঙ্গে তো যেতে বলছি না। তুই একা যাবি।

আমি একা চিলকিগড়ে গিয়ে খাবদাব ঘুরে বেড়াব? এর মানে কী?

আর কোনও মানে নেই। এটাই তোর অ্যাসাইমেন্ট। চল, আগে জিলিপি খাই।

বেরিয়ে প্রথমেই একটি মেথরের মুখ দেখলাম। বেশ তরুণ। ঘড় ঘড় শব্দ করে লোহার গাড়ি ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। ছেলেটি সিনেমার লাইনে গেলে কোনও এক সময় ওমপুরি হতে পারত। মুখে বেশ ভাব আছে।

প্রীতম জিজ্ঞেস করল, নীলু, তুই মুদ্দোফরাস কথাটা কোথা থেকে শিখলি রে? ওটা তো নাইনটিনথ সেঞ্চুরির শব্দ।

মাঝে মাঝে পুরনো শব্দ বলতে আমার বেশ ভাল লাগে। আমার ঠাকুমা সব কাপকেই বলতেন পেয়ালা। এক কাপ চায়ের বদলে এক পেয়ালা চা শুনতে ভাল না? ঠাকুমা সব রকম প্লেট বা ডিশকেই রেকাবি বলতেন।

রেকাবি তো পেতলের হয়। চায়ের কাপের তলায় যে ডিশটা থাকে, সেটাকে রেকাবি বলা ঠিক হবে না।

www.amarboi.com

আমাদের এক মাস্টারমশাই বলতেন, চায়ের কাপের তলায় যেটা থাকে, সেটার সঠিক ইংরিজি নাম সসার, কাপ-ডিশ বলে অর্ধ শিক্ষিতরা।

তুই আমাকে অর্ধ-শিক্ষিত বলতে চাইছিস তো? তা হলে এখন সারা দেশটাই তাই।

রাস্তার অন্য মানুষের মধ্যে ঝাঁকে ঝাঁকে কাজের মেয়েই বেশি। আর কয়েকজন কেডস জুতো ও হাফপ্যান্ট পরা মর্নিং ওয়াকার। তাদের একজন হঠাৎ আমাদের সামনে থমকে দাঁড়াল। দু-এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, ক'দিন বেশ জব্বর শীত পড়েছে, তাই না?

আমি বললুম, যা বলেছেন!

লোকটি বলল, এ বছর দার্জিলিং-এ নির্ঘাত বরফ পড়বে!

আমি বললুম, তাই তো মনে হয়।

লোকটা সন্তুষ্ট হয়ে মাথা নাড়তে নাড়তে, আপন মনে কিছু বলতে বলতে চলে গেল?

প্রীতম জিজ্ঞেস করল, কে রে? তুই চিনিস বুঝি?

কোনওদিন দেখিনি।

তা হলে দার্জিলিং-এ বরফ পড়বে কি না, তা তোকেই জিজ্ঞেস করল কেন? আর তুই-ই বা কেন?

শোন, শাস্ত্রে বলেছে, যারা নিত্য প্রাতর্ভ্রমণ করে, তাদের সঙ্গে ওই সময় কোনও বিষয় নিয়ে তর্ক করতে নেই। তা হলে যে কোনও এক পক্ষের মাথা খারাপ হয়ে যায়।

এটা কোন শাস্ত্রে আছে?

এখন ঠিক মনে পড়ছে না।

জিলিপির দোকানের সামনে এর মধ্যেই তিন চার জনের ভিড় জমে গেছে।

তাদের ফাঁক দিয়ে মালিকটি আমার দিকে সরু চোখে তাকাল।

আমি বললুম, দুর্গাদা, আমার অ্যাকাউন্টে কত আছে দেখুন তো।

কোনও রকম খাতা-পত্র না দেখেই সে বলল, বত্রিশ!

প্রীতম এক মাইল লম্বা অবাক হয়ে বলল, তুই সত্যি... সত্যি কথা বলেছিস?

আমি বললুম, আমি নিজের বিছানায় শুয়ে কক্ষনও মিথ্যে কথা বলি না। যা দু-একটা বলতেই হয়, তা রাস্তায় দাঁড়িয়ে।

তুই ক'খানা জিলিপি খাবি?

একখানা। আর দুটো কচুরি। আর চাও দু'কাপ।

জিলিপি-কচুরি ওখানেই দাঁড়িয়ে খেয়ে নিয়ে আমরা চলে এলুম চায়ের দোকানে। এটাও রাস্তার দোকান, পার্কের রেলিং-এর পাশে, দুটো বেঞ্চি পাতা, ওপরে তেরপলের ছাউনি।

চায়ে চুমুক দিয়ে প্রীতম জিজ্ঞেস করল, তুই সত্যিই জানিস, চিলকিগড় কোথায়?

জানব না কেন? ধলভূমগড়ের কাছে।

www.amarboi.com

ধলভূমগড়? সেটা আবার কোথায়? মধ্যপ্রদেশে?

আগে তুই বল প্রীতম, চিলকিগড় নিয়ে তোর এত মাথাব্যথা কেন?

মাথাব্যথা, মানে, সে রকম কিছু না। কাল সত্যিই আমার মাথার যন্ত্রণা হচ্ছিল, সেটা ওই চিলকিগড়ের জন্য নয়, অন্য কারণে, অ্যাসপিরিন খেতে হয়েছিল। জায়গাটা কোথায়, আগে বল না।

তুই নিশ্চয়ই ঝাড়গ্রাম চিনিস? ঘাটশিলাও চিনিস। এই চিলকিগড় আর ধলভূমগড় হচ্ছে ওই দুটো জায়গার মাঝখানে।

বাংলায় না বিহারে?

বাংলা না বিহার না নতুন ঝাড়খণ্ড রাজ্যে, তা বলতে পারব না। মোট কথা আমি গিয়েছিলুম একবার।

তা হলে আর একবার ঘুরে আয়। আজই স্টার্ট করবি? অন্তত কাল সকালে—

আমি এই চমৎকার শীতকালে চিলকিগড়ের মতন আরও চমৎকার একটা জায়গায় বেড়াতে যাব, খাবদাব, ঘুরে বেড়াব তোর পয়সায়, এতে আপত্তির কোনও কারণই থাকতে পারে না। কিন্তু মনের মধ্যে খচ খচ করবে, কেন, কেন, কেন? কেন প্রীতম আমাকে এখানে পাঠাল। একটা কারণ এই হতে পারে যে কোনও কারণে তুই আমাকে লোভ দেখিয়ে কলকাতার বাইরে কোথাও পাঠাতে চাস। কয়েক দিনের জন্য। তুই এর মধ্যে এমন কিছু একটা করবি এখানে, যা আমাকে জানাতে চাস না। কিংবা, আমি থাকলে বাগড়া দেব ভাবছিস!

মোটেই তা নয়। নীলু, তোর কাছে আমার কিছুই লুকোবার নেই।

হ্যাঁ, আছে। তুই কিছুদিন আগে আমাকে দিয়ে একটা প্রেমপত্র লিখিয়ে নিয়েছিলি। কিন্তু চিঠিটা কাকে পাঠাবি, তা বলিসনি!

আমি ভেবেছিলুম, তুমি আন্দাজ করতে পারবি।

আন্দাজের চেষ্টা করিনি। চিঠিটা এমন ভাবে লেখা, যাকে পৃথিবীর যে-কোনও মেয়েকেই পাঠানো যেতে পারে। পার্সোনাল ডিটেইল্‌স পেলে চিঠিটা আরও মাখো মাখো হতে পারত।

প্রথমা।

প্রথমা? তার মানে, এই মেয়েই তোর জীবনে প্রথম? বাজে কথা বলিস না!

না, প্রথমা ওর নাম।

বড্ড পুরনো ধরনের।

ওর আর একটা নাম জাহানারা।

এ নামও তো শাজাহানের আমলের।

ডাক নাম জুন।

জুন? মানে এপ্রিল-মে-জুন, সেই জুন?

হ্যাঁ, জুন মাসে ওর জন্ম।

এটা তবু একটু নতুন ধরনের। ভাগ্যিস সে মেয়ে অক্টোবর মাসে জন্মায়নি। তা হলে কি ওর ডাক নাম হত অক্টো? বাবা রে!

www.amarboi.com

অনেক মেয়ের নাম বৈশাখী হয়, শ্রাবণী হয় না?

জুন মানে খানিকটা জ্যৈষ্ঠ, খানিকটা আষাঢ়। নাঃ, বাংলায় চলবে না, জুনই ভাল। যাই হোক, এই প্রথমা, ওরফে জাহানারা ওরফে জুন বিষয়ে নতুন কী ঘটেছে? আর একটা চিঠি লিখে দিতে হবে?

জুন চিলকিগড়ে বেড়াতে গেছে, খবর পেয়েছি।

খুব ভাল কথা। তা আমাকে সেখানে যেতে বলছিস কেন? তুই নিজে চলে যা। প্রথম দু-একদিন লক্ষ রাখবি, বিকেলবেলা ও কোন রাস্তা দিয়ে বেড়াতে যায়। তুই ঠিক সময় উল্টোদিক দিয়ে আসবি তোর এই ভাল সোয়েটারটা গায়ে দিয়ে। মুখোমুখি এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়বি! দারুণ অবাক হবার ভাব করে বলবি, আরে, আপনি এখানে কবে এলেন? এই ভাবে আগেকার দিনে গণ্ডা গণ্ডা প্রেমের গল্প শুরু হত।

আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব না যে, নীলু!

তোর অন্য কাজ আছে? যারা প্রেমের চেয়েও কাজকে বেশি গুরুত্ব দেয়, তাদের জীবনে প্রেম হয়ে যায় লবডঙ্কা! রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই এরকম কথা লিখে গেছেন কোথাও। কাজ ফাজ গুলি মেরে চলে যা চিলকিগড়। চমৎকার স্বাস্থ্যকর জায়গা। পকেটে ভাল ভাল চকলেট রেখে দিবি।

যাঃ! জুন কি বাচ্চা মেয়ে যে চকলেট দিয়ে—

সব বয়েসের মেয়েরাই চকলেট ভালবাসে। তবে, বড় মেয়েদের প্রথমেই চকলেট দিতে নেই, তা ঠিক। কিন্তু একটি যুবতী মেয়ে বিকেলবেলা একলা একলা বেড়াতে বেরুবে, তার কি কোনও ঠিক আছে? গল্পে ওরকম হয়। জেনারেলি এদের সঙ্গে একটা-দুটো ছোট ভাই বোন থাকে। কোনও মেয়ের সঙ্গে ভাব জমাবার সবচেয়ে বড় বাধা এই ছোট ছেলেমেয়েরা। তারা কথাই বলতে দেয় না, নানারকম বায়নাক্কা করে। তাই অনবরত চকলেট দিয়ে তাদের অন্যমনস্ক রাখতে হয়।

জুনের ছোট ভাই বোন নেই।

মাসতুতো-পিসতুতো থাকতে পারে।

শোন নীলু, আমার যাওয়ার অন্য অসুবিধে আছে। তুই শোভন রায়কে চিনিস?

না, চিনি না। শোভন রায়, নিরুপ বসু, সুজয় মিত্র, অপূর্ব সেন এই টাইপের নামের লোকের বাস্তব অস্তিত্ব আছে কি না জানি না, তবে গল্পের বইতেই এই সব নাম দেখি। দু' অক্ষরের পদবিওয়ালা নামগুলোই নায়ক হয়, লেখকদের সুবিধে হয়, লিখতে। বন্দ্যোপাধ্যায়, দাশগুপ্ত, পত্রনবীশ এইসব পদবিরও কি ভাল ভাল লোক নেই? কিন্তু গল্পের নায়ক হওয়া তাদের ভাগ্যে জোটে না। যাই হোক, এই শোভন রায়টি কে? ত্রিভুজের তৃতীয় বাহু?

সেটাই তো আমি জানতে চাই। শোভন রায়ও চিলকিগড় গেছে কি না, সেটা তুই দেখে আসবি।

শোভনের ঠিকানা জোগাড় করে একটা ফোন করলেই তো জানা যায়। এইটুকু খবর জানবার জন্য অতদূরে যেতে হবে কেন?

www.amarboi.com

তুই আমার খরচায় কয়েকদিন বেড়িয়ে আসবি, এটা তোর পছন্দ হচ্ছে না?

শুধু বেড়ানো নয়, গোয়েন্দাগিরিও করতে হবে?

তোর কিছু নয়। শুনেছি চিলকিগড়ের রাজবাড়ির কাছেই মোহনপ্রসাদ সিং নামে এক ভদ্রলোকের বাড়িতে জুন আর তার মা অতিথি হয়ে থাকছেন। বাড়িটা খুঁজে পেতে নিশ্চয়ই তোর অসুবিধে হবে না। তুই শুধু দেখবি, শোভন রায়ও সেখানে গেছে কি না। যদি গিয়ে থাকে, তা হলে জুনের সঙ্গে তার কতটা ভাব। যদি দেখিস হাত ধরাধরির স্টেজে পৌঁছে গেছে, তা হলে আমার আর দরকার নেই।

কী দরকার নেই?

তা হলে জুনের কথা আমি আর ভাবব না। একদম মুছে ফেলব মন থেকে। এখন জুনের মুখটা মনে পড়লেই কিছুক্ষণ পরে আমার মাথার যন্ত্রণা শুরু হয়।

মাথার যন্ত্রণা? বুকের যন্ত্রণা নয়? বেরসিক আর কাকে বলে। প্রেমটা মাথার ব্যাপার নয়, বুকের। হৃদয় ঘটিত যাকে বলে!

ইয়ার্কি মারিস না, নীলু। তুই এইটুকু কাজ করতে পারবি না?

পারব, আর যদি দেখা যায়, শোভন রায় বলে কেউ সেখানে যায়নি, ছোট ভাই-বোনও নেই, জুন একা একা বেড়াতে বেরোয়, তা হলে আমি কি তার সঙ্গে কথা বলব, ভাব জমাব?

প্রীতম ভাব-গম্ভীর মুখে আমার দিকে নিষ্পলক ভাবে তাকাতেই আমি তার কাঁধ চাপড়ে সান্ত্বনা দিয়ে বললুম, আমার জন্য নয়, তোর জন্য!

॥ ২ ॥

বন্ধুদের জন্য, বিশেষত প্রীতমের জন্য আমাকে বেশ কয়েকবার সিরানো দ্য বারজেরাক সাজতে হয়েছে।

সে লোকটা আবার কে?

সিনেমার কল্যাণে অনেকেই জেনে গেছে। দু' দু'বার সিনেমা হয়েছে তার গল্প নিয়ে। তবু আমি কাহিনীটা সংক্ষেপে জানিয়ে দিই।

এটা ফরাসি দেশের একটা উপকথা। সিরানো ছিল দারুণ এক বীরপুরুষ, তলোয়ারে তার সমকক্ষ কেউ ছিল না। আবার কাব্য-সাহিত্যেও তার দারুণ দখল। রোমান্টিক ধরনের মানুষ।

চেহারার আর সব কিছুই সুন্দর, শুধু একটাই খুঁত, তার নাকটা বড় বেশি লম্বা। তাকে প্রথম দেখে অনেকেই হেসে ফেলত। চেহারার এই খুঁতের জন্য সে কোনও মেয়ের সঙ্গে মিশতে পারত না। না মিশেও তো দূর থেকে প্রেমে পড়া যায়।

সিরানো গভীর ভাবে প্রেমে পড়েছিল তারই দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়, রুকসান নাম্নী একটি মেয়ের। সে বিদুষী আর কাব্য-সাহিত্য খুব ভালবাসে। সিরানোকে সে পছন্দ করে। কিন্তু তার প্রেমের কথা জানে না, সে পছন্দ করে বসল এক লালটুমার্কা যুবককে, যে সিরানোর অধীনেই যুদ্ধবিদ্যা শিখছে। নব কার্তিকের মতন চেহারা ছাড়া

www.amarboi.com

সে ছোকরার আর কোনও গুণই নেই। রুকসান বুদ্ধিদীপ্ত, কাব্যময় চিঠি লিখলে তার উত্তর দেবার ক্ষমতা নেই এই নব কার্তিকের। রুকসানের সঙ্গে দেখা হলে নবকার্তিক তার আবেগময় কথার উত্তর না দিতে পেরে থতমত খেয়ে যায়। তার মনের দুঃখ সে নিবেদন করেছিল সিরানোকেই। তখন থেকে শুরু হল সিরানোর অপরূপ আত্মত্যাগ। নব কার্তিকের হয়ে সে লিখে দেয় চিঠির উত্তর। রাত্তিরবেলা রুকসান দোতলার ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে থাকে, নীচে সেই নব কার্তিক, ঠিক যেন রোমিও-জুলিয়েটের দৃশ্য, তফাত হচ্ছে এই, আধো-অন্ধকার আড়ালে দাঁড়িয়ে সিরানো তার হয়ে সব কথা জানায় রুকসানকে। এ তারই প্রেমিকার প্রতি বুক ফাটা বিলাপ, কিন্তু তার কৃতিত্ব পায় নব কার্তিক।

সিরানোর তুলনায় আমি নগণ্য হলেও সামান্য মিলও আছে।

আমার নাক লম্বা নয়, বরং বোঁচাই বলা যেতে পারে। আমি যুদ্ধবিদ্যা জানা দূরের কথা, কোনওদিন তলোয়ার-বন্দুক হাতেই নিইনি। তবে এ যুগে অসি'র চেয়ে মসীই বেশি শক্তিশালী বলে মাঝে মাঝে কলম তুলে ধরি।

আমার নিজের কোনও প্রেমিকাকে আমি অন্য কারও হাতে তুলে দিইনি, কারণ সে রকম কারও প্রেমে পড়ার সৌভাগ্যই আমার এ পর্যন্ত হয়নি। যারা প্রেমে সার্থক হয়, তারা ভাল প্রেম পত্র লিখতে পারে না। তাদের আর দরকার কী? যারা এখনও কিছু পায়নি, তারাই চিঠিতে আবেগের বন্যা ঢেলে দিতে পারে।

আমি প্রেমের চিঠি মোটামুটি ভালই লিখি বলা যেতে পারে। আমার বানান ভুল হয় না। প্রেমের চিঠিতে বানান ভুল অনেকটা পায়েসের মধ্যে কাঁকর কিংবা মাছের ঝোলে চুলের মতন।

এখনকার দিনে কটা ছেলে বা মেয়ে প্রেমপত্র লিখতে বা পেতে চায়? অনেকেই মনে করে, ওসব ন্যাকামি। কিংবা চিঠি-ফিঠির দরকার হয় না, সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায় অনেক তাড়াতাড়ি। সে সম্পর্কের মধ্যে প্রেম ব্যাপারটাই হয়তো অবান্তর।

কলেজের ক্যান্টিনে আমি এরকম সংলাপ শুনেছি :

বান্টি, তোর সঙ্গে কি কাল শ্রেয়ার দেখা হয়েছিল?

হ্যাঁ, দেখা হয়েছিল। না হয়নি। কিংবা লাস্ট সোমবার। শনিবারও হতে পারে। কেন জিজ্ঞেস করছিস?

তোর সঙ্গে ওর কত ডিগ্রি চলছে? নাইন্টি ডিগ্রি হয়েছে?

আমি ওসব ডিগ্রিবাজির মধ্যে আর নেই। শ্রেয়ার জন্মদিনে ডেকেছিল। যাইনি।

কেন যাসনি?

আমি অন্য নদীতে সাঁতার কাটছি।

সে কীরে! শ্রেয়ার সঙ্গে তোর অতখানি... এর মধ্যে কাটাকুটি হয়ে গেল?

ওর জন্মদিনে যাইনি, সেইটুকু বলাই কি যথেষ্ট নয়?

তুই ওর সঙ্গে কি দু-একবার। ইউ নো হোয়াট আই মিন।

দ্যাট্স নান্ অব ইয়োর বিজনেস!

শ্রেয়া যখন সিঁড়ি দিয়ে অন্যমনস্ক ভাবে নামে, তখন ওকে টেরিফিক দেখতে

www.amarboi.com

লাগে। আমি ভাবছি, ওর সঙ্গে একটা অ্যাংগ্‌ল করব। তোর কোনও আপত্তি নেই তো?

তুই অ্যাংগ্‌ল কর, কিংবা অ্যাংগলিং কর, যা খুশি, আমি মাথাই ঘামাব না। গো অ্যাহেড।

আর এক রকম সংলাপও শোনা যায়। সেটা অন্য দিকের।

উঃ, বাপিদা-টা কী ন্যাকা, কী ন্যাকা! দিনে অন্তত পাঁচ বার ফোন করে। একদিন সকাল পৌনে ছ'টায়—

বাপিদা যে নেভি ব্লু রঙের শার্টটা কাল পরে এসেছিল, ডিজাইনটা একেবারে এক্সক্লুসিভ!

ওটা নেভি ব্লু নয়, টারকোয়াজ ব্লু। তুই রং চিনিস না। বাপিদার দিকে তুই খুব তাকিয়ে থাকিস, কথা বলিস না কেন?

বলি তো কথা। বাপিদা আর যাই-ই হোক, ন্যাকা নয়। তোকে অতবার ফোন করে, তোর ভাল লাগে না?

দিতি, তোর বাপিদাকে খুব পছন্দ মনে হচ্ছে, বলে দেব, তোকে পাঁচ বার ফোন করতে!

যাঃ, কী বলছিস মিষ্টুনি, বাপিদার সঙ্গে তোর কত দিনের...তা কি আমি জানি না? আমি কক্ষনও বন্ধুদের বিট্রে করি না।

বিট্রে করার প্রশ্ন নেই। তোকে সত্যি কথা বলছি, আজকাল আমি বাপিদা'র সঙ্গে ঠিক কথা খুঁজে পাই না। বাপিদা যখন বড্ড পজেটিভ হয়ে ওঠে, তখনই আমার দম বন্ধ দম বন্ধ লাগে। সেইজন্যই বলছি রে দিতি, তুই যদি, মানে তোর যদি বাপিদার জন্য আঠা হয়ে থাকে, তুই এগোতে পারিস।

তার মানে কীরে মিষ্টুনি? তুই বাপিদাকে ডাম্প করে দিতে চাস? অন্য কেউ লাইনে এসে গেছে?

না, সে রকম কিছু না। বাপিদাকেও কিছু বলিনি। এক এক সময় বাপিদাকে নিশ্চয়ই ভাল লাগে, কিন্তু সব সময়ের জন্য নয়। তা হলে আমরা দু'জনে শেয়ার করে নিতে পারি।

বাপিদা কি একটা মাল যে দু'জনে শেয়ার করব?

রণটা তো যখন তখন আমাদের মাল বলে।

রণের কথা বাদ দে। ওটা আবার একটা পুরুষ নাকি? ইউনাক।

ঠিক আছে, তুই বাপিদাকে খানিকটা শেয়ার কর, তাতে যদি আমাকে টেলিফোনটা কমায়...

তুই তো দেড়মাসের জন্য দিল্লি যাচ্ছিস, এই সময়টায় আমি বাপিদাকে একটু সাইজ আপ করি। আমার ভাই মাঝে মাঝে ন্যাকামি করতে ভালই লাগে।...

এই ধরনের সংলাপের মধ্যে প্রেম কোথায়?

অবশ্য একটি ছেলে আর একটি মেয়ে একেবারে নিভৃতে কী কথা বলে, তা আমি জানি না। তবে তারা চিঠি বিনিময় করে না, এটা ঠিক।

www.amarboi.com

সে যাই হোক, এ রকম ছেলে মেয়ে এখন বেশ কিছু দেখা গেলেও এটাই প্রকৃত সমাজ চিত্র নয়।

তা হলে খবরের কাগজে পাতার পর পাতা জুড়ে এত পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপন বেরোয় কেন?

এখন শহুরে ছেলে মেয়েদের মেলামেশার অগাধ সুবিধে। তাদের মধ্যে প্রেম হোক বা না হোক, কিছুদিন এর তার সঙ্গে ঘোরাঘুরি করে তারপর এক সময় যখন জীবনে থিতু হবার সময় আসে, তখন দুটি নারী-পুরুষ পরস্পরকে বেছে নিয়ে বিয়ে করে ফেলে, সংসার পেতে বসে। তাদের মধ্যে এক ধরনের ভালবাসার ফর্মালিটি থাকে, প্রেম না থাকলেও চলে।

এটাও কিন্তু সঠিক শহুরে সমাজ চিত্র নয়। এখনও অনেক ছেলে কিংবা মেয়ে স্কুল-কলেজ জীবনে অনেকের সঙ্গে মেলামেশা করে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সঙ্গী কিংবা সঙ্গিনী বেছে নিতে পারে না। বাবা-মায়ের ওপর নির্ভর করতে হয়। চেনাশুনো লোকেরা 'সম্বন্ধ' আনে।

আমাদের প্রীতমেরও প্রায় সেই দশা।

এমনিতে কত সপ্রতিভ অর্থাৎ চালু, ফটোগ্রাফারদের চালু হতেই হয়। তারা প্রথমবার কারও বাড়িতে গিয়ে চেয়ারের ওপর দাঁড়িয়ে উঠতে পারে। সে এত ভাল ফটোগ্রাফার, অনেক মেয়েই পছন্দ করে তাকে। সব মেয়েরাই নিজের ছবি ভালবাসে, প্রীতম সুন্দরী মেয়েদের ছবি এনলারজ করে উপহার দেয়, কিন্তু কাউকে মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে না। কোনও রূপসী মেয়ে তার প্রতি আগ্রহ দেখালেই তার মুখখানা তেলতেলে হয়ে যায়, আর জিভটা হয়ে যায় তোত্‌লাদের মতন।

তবু প্রীতম জেদ ধরে আছে, সে কিছুতেই খবরের কাগজের পাত্র-পাত্রী বিজ্ঞাপন দেখে বিয়ে করবে না, তার বিয়েতে মা-বাবাদের কোনও ভূমিকাও থাকবে না। তার ভরসা বন্ধুদের ওপর। আর বন্ধুদের মধ্যে আমিই একমাত্র বেকার ও লক্ষ্মীছাড়া বলে খাটা-খাটনির কাজ আমাকেই করতে হয়।

একবার প্রীতমের পছন্দ হওয়া একটি যুবতীকে অনুসরণ করে আমাকে চুঁচড়ো পর্যন্ত যেতে হয়েছিল। মেয়েটি চাকরি করে ডালহাউসিতে, আমি দাঁড়িয়ে ছিলুম তার অফিসের সামনে। ছুটির পরে তার সঙ্গে এক বাসে চেপে গেলুম হাওড়ায়, তারপর একই কম্পার্টমেন্টে উঠে চুঁচড়ো। সে একটা সাইকেল রিকশা নিল, আমিও আর একটা। ঠিক ডিটেকটিভ গল্পের মতন।

শুধু মেয়ে পছন্দ হলেই হবে না, বিয়ের প্রস্তাব দেওয়ার আগে জেনে নিতে হবে, মেয়েটির বাড়ি অ্যাঁকাব্যাঁকা গলির মধ্যে না বড় রাস্তায়। বাড়িতে ক'জন লোক, বিশেষত বড় দাদাটাদা আছে কি না। সরু গলির মেয়েকে সে বিয়ে করবে না, আর কেন জানি না, দাদাদের ওপর তার খুব রাগ। একজন দাদা থাকলেও বিয়ের প্রশ্নই ওঠে না, ছোট ভাই-বোন চলতে পারে।

চুঁচড়োর মেয়েটির তিন দাদা। তাদের একজনের হাতে আমার প্রায় মার খাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। যাক গে, সে গল্প বলতে গেলে অনেক লম্বা হয়ে যাবে।

www.amarboi.com

এমন সহজ মেলামেশার যুগেও অনেক ছেলে কিংবা মেয়ের শেষ পর্যন্ত বিয়েই হয় না।

প্রীতমের যোগ্যতার খামতি নেই, বরং অনেকের চেয়ে বেশি। চেহারা-টেহারা ভাল, বাড়ির অবস্থা সচ্ছল, নিজেও প্রচুর রোজগার করছে, বিয়ে করার ইচ্ছেও যথেষ্ট, তবু কিছুতেই কোনও মেয়ের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা হচ্ছে না। এ জন্য তার মায়ের খুব দুঃখ। মাঝে মাঝেই আমাদের ডেকে বকুনি দেন, তোরা কিছু ব্যবস্থা করতে পারিস না। এই নীলুটা কোনও কম্মের না।

প্রীতম সব সময় কাঁধে তিন-চারটে ক্যামেরা ঝুলিয়ে রাখে, যখন কোনও প্রেস কনফারেন্সে লম্ফ ঝম্প করে, হাঁটু গেড়ে বসে, এক একবার শুয়েই পড়ে মাটিতে, তখন তাকে দেখে কে বুঝবে যে এই দারুণ স্মার্ট যুবকটিই মেয়েদের কাছে একেবারে মুখচোরা।

চিলকিগড় যাবার আগে আমাকে কিছু খোঁজ খবর নিতে হল।

এই প্রথমা ওরফে জাহানারা ওরফে জুন নামের মেয়েটির প্রধান যোগ্যতা, তারও ফটোগ্রাফির নেশা আছে, পেশাদারদের মতন ভাল ছবি তোলে, তার ছবি মাঝে মাঝে নানান খবরের কাগজে ছাপা হয়। এখন তো দেখি, যে-কোনও উৎসবে ফটোগ্রাফারদের ঝাঁকের মধ্যে কয়েকটি মেয়ে থাকেই। পুরুষদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তারা এই পেশায় বেশ এগিয়ে যাচ্ছে।

অনেক ডাক্তারের সঙ্গে লেডি ডাক্তারের বিয়ে হয়, স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই চার্টার্ড, দু'জনেই আই এ এস, দু'জনেই স্কুল বা কলেজে পড়ায়, এমন তো আকছার দেখা যায়, এমনকী শিল্পীর সঙ্গে শিল্পীর বিয়ে কিংবা কবির সঙ্গে কবির, তাও খুব বিরল নয়। কিন্তু ফটোগ্রাফারের সঙ্গে ফটোগ্রাফারের পরিণয় আগে কখনও হয়েছে কি না জানি না। না হয় বিশ্বে এটাই হবে প্রথম, নাম উঠে যাবে গিনেস বুক রেকর্ডস-এ।

জুন আর প্রীতমের বয়েস ঠিক সমান, সাতাশ।

আগেকার দিনে স্বামীদের বয়েস স্ত্রীর চেয়ে অন্তত সাত-আট বছর বেশি হত। কে এই নিয়ম চালু করেছিল কে জানে! অতি বাজে নিয়ম। মাঝ বয়েসে এসে অধিকাংশ স্বামীর চেহারাই হয়ে যায় জ্যাঠামশাইদের মতন, তার স্ত্রীকে মনে হয় কাকিমা!

এখন সমবয়সিদের মধ্যে বিয়ে বেশ চালু হয়েছে।

ডাক্তারি পড়তে পড়তে কিংবা আই এ এস-এর ট্রেনিং নিতে নিতে কোনও ছেলে ও মেয়ের মধ্যে যদি ভাব হয়, পরে যদি তারা জোড় বাঁধে, তবে তাদের বয়েস তো এক হবেই। এমনকী কম বয়সি ছেলের সঙ্গে বেশ কয়েক বছর বেশি মেয়েদের বিয়েও হয় এবং পরবর্তী জীবনে বেশ মানিয়ে যায়। এখন মেয়েদের শরীর ও সৌন্দর্য অনেক বেশিদিন টিকে থাকে। আগে বলা হত, মেয়েরা কুড়ি পেরুলেই বুড়ি, এখন সাড়ে তিন কুড়ি বছর বয়েসেও অনেক মেয়ে যুবতী থাকে।

সুতরাং বয়েসের দিক থেকে প্রীতম ও প্রথমাকে রাজযোটক বলা যায়।

প্রথমা জাহানারা জুনের একটা ছবি প্রীতম আমাকে দেখিয়েছে। গোপনে তোলা। মুখখানা সাউন্ড অব মিউজিকের জুলি অ্যান্ড্রুজ-এর মতন। নাকটা একটু ওপরের

www.amarboi.com

দিকে তোলা। (জুলি অ্যান্ড্রুজ আমার বড্ড প্রিয়, কতবার তাকে স্বপ্নে দেখেছি। সম্প্রতি গলার একটা অপারেশানের পর সে আর গান গাইতে পারবে না, এই খবরটা পড়ে মন খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল।) যে-সব মেয়েদের নাকটা একটু উঁচু হয়, তারা নারীবাদী আন্দোলনের নেত্রী হতে পারে। এও কি তাই? দেখা যাক।

যতদূর মনে হল, প্রীতমও স্বীকার করল, জুন প্রীতমের চেয়ে অন্তত দেড় ইঞ্চি বেশি লম্বা। মেয়েদের দেড় ইঞ্চি অনেকখানি। তা হোক। পৃথিবীর অধিকাংশ স্বামী আর স্ত্রী যখন পাশাপাশি হেঁটে যায়, স্বামীদের মাথাটা উঁচুতে থাকে, এই একঘেয়েমির অবসান হওয়া দরকার। মাঝে মাঝে কিছু কিছু স্ত্রীর মাথা যদি স্বামীকে ছাড়িয়ে যায়, তা হলে তো দেখতে ভালই লাগবে।

আমিও ঠিক নারীবাদীদের মতনই কথা বলছি না?

বন্ধুরা বলে, নীলু, তুই সব সময় মেয়েদের দিকটা টেনে কথা বলিস। হ্যাঁ, তা তো বলিই, আমি নির্লজ্জভাবে মেয়েদের পক্ষপাতী। শিল্পী রেনোয়া বলেছিলেন, পৃথিবীতে মেয়েরা না থাকলে তিনি ছবিই আঁকতেন না। আমি আরও একটু বেশি করে বলি, পৃথিবীতে মেয়েরা না থাকলে আমার বেঁচে থাকতেই ইচ্ছে করত না।

জুন সম্পর্কে মোটামুটি তথ্য পাওয়া গেলেও শোভন রায় সম্পর্কে কিছুই জানা গেল না। শুধু ওই ছোট্ট নাম নিয়ে সে নায়ক হবার যোগ্যতা পেয়ে গেছে।

প্রীতম এমনই অধীর হয়ে আছে যে আমি দু -একদিন দেরি করতেই যেন শোভন রায় জুনকে কব্জা করে নেবে।

সুতরাং পরদিনই ব্যাগ গুছিয়ে বেরিয়ে পড়তে হল।

প্রীতম হিসেব করে ট্যাক্সি ভাড়া দিয়েছিল, কিন্তু প্রথম থেকেই কিছু কিছু পয়সা বাঁচাবার চেষ্টা করতে হবে তো। বাসে করে যেতে যেতে খানিকটা দেরি হয়ে গেল, হাওড়া স্টেশানে পৌঁছতেই ট্রেন ছাড়ো ছাড়ো। দৌড়ে গিয়ে উঠে পড়লুম একটা কামরায়।

সে কামরায় বেশ ভিড়। আমার রিজার্ভেশান নেই। অন্য অনেকের মতন আমাকেও দাঁড়িয়ে যেতে হবে।

কামরার একদিকে দশ বারোটি একই বয়সি মেয়ে এখনও সিট বদলাবদলি করায় মেতে আছে, তাদের কল-কাকলিতে কান পাতা দায়।

ওর মধ্যে একটি মেয়েকে দেখেই আমার চক্ষু স্থির। ট্রেন চলতে শুরু করেছে, এখন আর কামরা বদলাবারও উপায় নেই।

যথা সম্ভব নিজেকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে রইলুম। তাও কিছুক্ষণ মাত্র। মুমু ঠিক আমাকে দেখতে পেয়ে গেল।

উঠে দাঁড়িয়ে, অনেকটা দূর থেকেই চেঁচিয়ে বলল, এই নীলকাকা, তুমি কখন উঠলে? কোথায় যাচ্ছ?

যাক, তবু এত লোকের মধ্যে আমাকে কাকা বলে ডেকে সম্মান দিয়েছে। ও মেয়ের মুখে তো কিছুই আটকায় না।

মুমু হাতছানি দিয়ে বলল, এদিকে চলে এসো। নীলকাকা, এদিকে।

www.amarboi.com

আমি হাত নেড়ে বললুম, না, ঠিক আছি এখানে।

মুমু তা শুনবে কেন?

উঠে এসে আমার হাত ধরে বলল, আমাদের ওখানে বসবার জায়গা হয়ে যাবে। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে!

অনেকের ঈর্ষাকাতর দৃষ্টির মাঝখান দিয়ে মুমু আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল ওদের কোণটিতে।

অন্য মেয়েদের ঠেলেঠুলে বলতে লাগল, এই সরে সরে বোস তো!

আমাকে চেপেচুপে বসিয়ে দিল নিজের পাশে।

মুমুদের সঙ্গে বড় কেউ নেই। এক বয়সি এক ডজন মেয়ে, তাদের দশজনই শালোয়ার-কামিজ, দু'জন জিনস, একজনও শাড়ি পরেনি।

কোথায় যাচ্ছ তোমার?

ঘাটশিলা। আমরা তো জিওলজি পড়ি, স্টাডি ট্যুরে যাচ্ছি। কপার মাইন দেখব।

তারপর মুমু অন্যদের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিল। এই আমার নীলকাকা। আপন কাকা নয় অবশ্য, এই এমনি। ওর একটা বিচ্ছিরি নাম আছে, নীললোহিত। আর একটা নাম অবশ্য একটু ভাল, ব্লু, সেটা বললে আর আংকল বলতে হয় না। জাস্ট ব্লু।

মুমুর এক সঙ্গিনী বলল, আমার দাদার এক বন্ধুর নাম নীললোহিত। আপনি কি সে-ই? আমার দাদার নাম সপ্তর্ষি।

মুমু তাকে এক ধমক দিয়ে বলল, এই দাদা ফাদার কথা একদম তুলবি না। নীলকাকা, তুমি কোথায় যাচ্ছ?

আমি খানিকটা আলগা ভাবে বললুম, দেখি, ঠিক নেই?

অন্য মেয়েটি বলল, আপনি কোনও স্টেশানের টিকিট কাটেননি?

অন্য একজন বলল, ডব্লু টি?

মুমু আবার দু'জনকেই ধমক দিয়ে বলল, শাট-আপ! বসবার জায়গা না পেলে টিকিট কাটার নিয়ম নেই।

আমার দিকে ফিরে বলল, তুমি নিশ্চয়ই দিকশূন্যপুরে যাচ্ছ? আমাকে একবার ও নিয়ে গেলে না।

তোমার এখনও যে বয়েস হয়নি।

আর বেশি দেরি নেই স্যার। সতেরো বছর সাত মাস। আঠেরোয় পা দিলেই কী কী কথা আছে, মনে আছে?

আঠেরো বছর বয়েস হলে তুমি ভোটের অধিকার পেয়ে যাবে। আর কী হবে?

মুমু বলল, বাঃ মনে নেই? তখন দেখিয়ে দেব মজা!

মুমু অনেকদিন থেকেই দাবি করে আসছে, ওকে একটা চুমু খেতে হবে। আমি বলেছি, আঠেরো বছরের আগে নয়। সে কথা প্রায়ই মনে করিয়ে দেয়।

ওর আর একটা দাবি, ওকে একবার দিকশূন্যপুরে নিয়ে যেতে হবে, সঙ্গে আর কেউ থাকবে না।

www.amarboi.com

একটা বাদামওয়ালা আসছে এদিকে।

মুমু বলল, অ্যাই ব্লু, আমাদের জন্য বাদাম কেনো!

আমি বললুম, হ্যাঁ হ্যাঁ।

বাদাম খাওয়াতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু আইসক্রিম কিংবা ডাবওয়ালা এলেই বিপত্তি। বারোটা মেয়েকে আইসক্রিম বা ডাব খাওয়াতে গেলে ফতুর হয়ে যাব!

বাদাম ভাঙতে ভাঙতে একটি মেয়ে জিজ্ঞেস করল, ব্লু আংক্ল, আপনি কী করেন?

বললুম, কিছুই না, ভেরেন্ডা ভাজি।

বলেই মনে হল, এখনকার ইংরিজি মিডিয়ামে পড়া ছেলে-মেয়েরা ভেরেন্ডা ভাজার ব্যাপারটা বোধহয় বুঝতে পারবে না।

মুমু তাকে বলল, অ্যাই, বললুম না, ব্লু বলে ডাকলে আর আংকল বলার দরকার নেই। ব্লু আংকল বিচ্ছিরি শোনায়। গ্লোব ট্রটার কাকে বলে জানিস তো? ব্লু হচ্ছে ইন্ডিয়া ট্রটার। অ্যান্ড বাংলাদেশ!

সেই মেয়েটি আবার জিজ্ঞেস করল, আপনি শুধু ঘুরে বেড়ান? কেন?

আমি কিছু বলার আগেই মুমু উত্তর দিল, জাস্ট ফর দা হেক অফ ইট!

ওঃ, এরা আজকাল এত বেশি ইংরিজি বলে! কত ভাল ভাল বাংলা উপমা, উৎপ্রেক্ষা, প্রবাদের এরা মর্মই বুঝবে না।

আমি বললুম, পায়ের তলায় সর্ষে, আমি বাধ্য হয়েই ভ্রমণকারী। সর্ষে কাকে বলে জানো?

চার-পাঁচজন একসঙ্গে বোঝাবার চেষ্টা করল যে তারা সর্ষে চেনে, সর্ষে বাটার ঝোল দিয়ে ইলিশ মাছ খেয়েছে, সর্ষে বাটা আর মাংস দিয়ে ভিন্ডালু হয়। তবে 'পায়ের তলায় সর্ষে'-এর মানে বোঝে না।

একজন জিজ্ঞেস করল, আপনি যে ঘুরে বেড়ান, থাকেন কোথায়? হোটেল ঠিক করা থাকে?

আমি বললুম, ভোজনং যত্রতত্র, শয়নং হট্টমন্দিরে।

অট্টমন্দির? খট্টমন্দির? মানে কী?

দেশে দেশে মোর ঘর আছে, আমি সেই ঠাঁই মরি খুঁজিয়া...

বলুন না, খট্টমন্দির কোথায়?

এ তো বড় রঙ্গ জাদু এ তো বড় রঙ্গ। তিন কাল দেখতে পারো, যাব তোমার সঙ্গ।

সব ক'টি মেয়ে খল খল করে হেসে উঠল। বলাই বাহুল্য, কিছুই না বুঝে। একেই বলে না বোঝার আনন্দ।

আমি ঠিক করে ফেলেছি। এই সব আধো ইংরিজি বলা মেয়েদের সামনে শুধু বাংলা ছড়া আর কবিতায় কথা বলে যাব।

মুমু বলল, ব্লু, সত্যি করে বলো তো, তুমি কোন স্টেশানে নামবে?

ঠিক নেই।

তা হলে আমাদের সঙ্গে ঘাটশিলা চলো।

www.amarboi.com

উহুঁঃ!

কয়েকটি মেয়ে একসঙ্গে চেঁচিয়ে বলল, এই মুমু, তোর আংকল ভারী মজার লোক, চল, চল, আমাদের সঙ্গে নিয়ে চল।

আমি দু'দিকে ঘাড় নাড়লুম।

মুমু চোখ পাকিয়ে বলল, শোন ব্লু, দিকশূন্যপুরে তোর দু'-একদিন পরে গেলেও চলবে। তুই আমাদের সঙ্গে ঘাটশিলায় কেন যাবি না রে।

এই রে, মুমু বোধহয় এরপর আমাকে শালা-টালাও বলা শুরু করবে। এ মেয়ের মুখে কিছুই আটকায় না। ওকে সামলাবার জন্য তাড়াতাড়ি বললুম, তোমাদের সঙ্গে বড় কেউ যাচ্ছে না?

মুমু বলল, দু'জন টিচার যাচ্ছেন, তাঁরা অন্য কম্পার্টমেন্টে আছেন।

তাঁদের নিয়ে তোকে মাথা ঘামাতে হবে না। তুই না গেলে—

কী হবে না গেলে?

তোর চোখে চুলের কাঁটা ফুটিয়ে দেব।

চক্ষুরত্ন বড় রত্ন। চোখ নষ্ট হলে খুবই মুশকিল। ঠিক আছে, যেতে পারি, তার আগে আমাকে দুটি প্রশ্নের ঠিকঠাক উত্তর দিতে হবে। উত্তর দিতে না পারলে কিন্তু যাব না, আমার অন্য জায়গায় কাজ আছে। ঠিক আছে?

প্রমিস!

প্রথম প্রশ্ন, তোমাদের সকলের বয়ফ্রেন্ড আছে?

আমরা কো-এড কলেজে পড়ি। আমাদের বয়ফ্রেন্ড থাকবে না? ওই যে দেয়া, ওর তো স্কুলের শেষ ক্লাস থেকেই আছে একজন স্টেডি বয়ফ্রেন্ড!

বেশ! তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে বাংলায় প্রেমিক বলে একটা কথা আছে। এই প্রেমিক আর বয়ফ্রেন্ড কি এক? যদি এক না হয়, তা হলে কতটা তফাত!

এক মিনিট প্রগাঢ় স্তব্ধতা। এ ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছে। তারপর দেয়া নামের মেয়েটিই ফস করে বলল, বয়ফ্রেন্ড হচ্ছে প্রেমিক হবার আগেকার অ্যাপ্রেন্টিস!

আমাকে মনে মনে স্বীকার করতেই হল, এই সব ইংরেজি-মাধ্যম বালিকারা অনেক সপ্রতিভ এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্বসম্পন্ন, বাংলা স্কুলে পড়া কোনও মেয়ে এত তাড়াতাড়ি এ রকম একটা উত্তর বোধহয় দিতে পারত না?

মুমু বলল, দেয়া ঠিক বলেনি?

আমি বললুম, হ্যাঁ, এটা ভাল উত্তর। তবে ওর নিজের পরিচয় দিক। নামের মানে বলুক, তা হলে ফার্স্ট প্রাইজ পাবে।

দেয়া বলল, আমার নাম দেয়া সিংহরায়, (যাক তা হলে শুধু বসু, রায়, সেন নয়, সিংহরায়রাও নায়িকা হতে পারে) আমার বাবা পোর্ট কমিশনার্সের ডেপুটি চেয়ারম্যান, থাকি সল্ট লেকে, আমি প্রেসিডেন্সিতে জিওলজি অনার্স নিয়ে পড়ছি। আর দেয়া মানে দেয়া!

দেয়া, মানে দেয়া? অর্থাৎ দেওয়া-নেওয়ার মতন?

বোধহয় তাই।

www.amarboi.com

নিজের নামের মানে বলতে গেলে বোধহয় টোধহয় চলে না। এই জন্য কুইজ কম্পিটিশানে তুমি পুরো নম্বর পেলে না। একটা ক্লু দিচ্ছি। একটা রবীন্দ্রসঙ্গীত আছে, গগনে গগনে ডাকে দেয়া, (দেওয়া নয় কিন্তু) ছায়া ঘনাইছে বনে বনে। এই দেয়া'র মানে খুঁজে বার করো। আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন, একটা অতি সাধারণ কবিতার লাইন, শুধু বলতে হবে, কার লেখা। 'বাসাখানা গায়ে গায়ে আর্মানি গির্জার, দুই ভাই সাহেবালি জোনাবালি মির্জায়!'

একেবারে নিস্তব্ধতা। মেয়েগুলি অসহায় সারল্য নিয়ে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাচ্ছে।

একজন ফস করে বললে, নজরুল ইসলাম!

আমি বললুম, তুমি আউট!

ওদের বাবা-মা অল্প বয়েসে এই সব কবিতা ছেলে-মেয়েদের শেখায়নি। বড় হয়ে তো আর এসব পড়া হয় না।

মুমু হার মানবার পাত্রী নয়। সে বলল, ব্লু, এটা তোমার অন্যায়। আমরা বেশি বাংলা পড়িনি। স্কুলে পড়ায় না। তুমি একটা ইংরেজি কবিতা জিজ্ঞেস করো। যে-কোনও জায়গা থেকে।

আমি বললুম, মুমু, তুই বুঝি ভাবছিস, আমি বাংলা ইস্কুলে পড়েছি বলে ইংরিজি একদম জানি না? একটু একটু জানি। ঠিক আছে, আমি একটা অতি বিখ্যাত ইংরিজি বই থেকে জিজ্ঞেস করছি। এটা সবারই জানা উচিত। কোনও বিশ্ববিখ্যাত বইয়ের শেষ লাইন, 'অ্যান্ড দা রেস্ট ইজ সাইলেন্স!'

আবার মুখ তাকাতাকি। আবার নিস্তব্ধতা।

যারা ফরফর করে সব সময় ইংরিজি বলে, তাদের অনেকেই যে ইংরিজি সাহিত্যের বিশেষ কিছুই জানে না, এটা প্রমাণ করতে পারলে আমার বেশ আনন্দ হয়।

আমি বেশ একখানা চালিয়াতি ভাব করে বললুম, তোমরা উত্তরটা ভাবো, আমি দরজার কাছে গিয়ে একটা সিগারেট খেয়ে আসি।

একটি মেয়ে বলল, একটা ক্লু দিয়ে যান।

আমি বললুম, ওই যে বলেছি, বিশ্ব সাহিত্যে অতি বিখ্যাত বই!

অন্য একটি বলল, বাইবেল?

আমি কায়দা করে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললুম, ভাবো! ভাবো!

সত্যি কথা বলতে কী, চিলকিগড়ে প্রীতমের মনোনীত পাত্রীর অনুসরণ করার চেয়ে এই এক ডজন প্রাণোচ্ছল কিশোরীর সঙ্গে ঘাটশিলায় কয়েকটি দিন কাটানো আমার পক্ষে অনেক বেশি আকর্ষণীয় মনে হলেও প্রীতম আমার ট্রেন ভাড়া-টাড়া অনেক কিছু দিয়েছে, খুব ব্যাকুল ভাবে অপেক্ষা করে আছে, এই অবস্থায় কোনও বন্ধুর সঙ্গে তঞ্চকতা করা তো ঠিক নয়!

আমি দোনামোনায় ভুগতে লাগলুম অনেকক্ষণ।

মুমু কাছে চলে এসে জিজ্ঞেস করল, তুমি যে লাইনটা বললে, সেটা কোনও

www.amarboi.com

পোয়েট্রি বইয়ের, না ফিকশান?

দুটোর কোনওটাই নয়।

ঠিক আছে, পারব না। এবার উত্তরটা বলে দাও।

আমি বলব না। নিজেরা খুঁজে বার করো, কিংবা তোমাদের টিচারদের জিজ্ঞেস করো। ঝাড়গ্রাম এসে গেছে, আমি এবার নামব।

তুমি ঝাড়গ্রামে নামবে, আর ঘাটশিলায় যেতে পারো না?

এখানে আমার কাজ আছে।

দাখ ব্লু, বেশি কাজ দেখাবি না। তোর আবার কী কাজ?

মুমু, গুরুজনদের তুই বলতে নেই।

ইস্, ভারী আমার গুরুজন। যেই আঠেরো বছর বয়েস হয়ে যাবে, তোকে আর কাকাও বলব না। তখন থেকে তুই আমার এফ এফ জি! মানে জানিস তো, ফ্রেন্ড, ফিলোজফার অ্যান্ড গাইড।

দ্যাটস অল রাইট উইথ মি।

আমাদের ঝাড়গ্রামেও আসার প্রোগ্রাম আছে। এসে দেখব, তোর কী কাজ।

ততক্ষণে আমি পৌঁছে যাবে দিকশূন্যপুর।

॥ ৩ ॥

ঝাড়গ্রাম আমার খুব প্রিয় জায়গা। স্টেশানের একেবারে গায়েই বড় বড় শাল গাছ, ভূ-ভারতে আর কোথাও নেই।

এখানকার একটা হোটেলে একবার এমন চমৎকার বাঁধাকপির ঝোল খেয়েছিলুম যে তার স্বাদ এখনও জিভে লেগে আছে।

মানুষের স্মৃতি কী বিচিত্র। পৃথিবীতে কত ভাল ভাল খাবার রয়েছে, তবু বাঁধাকপির ঝোলের মতন অতি সাধারণ একটা জিনিস মনে থেকে যায় কী করে?

বাঁধাকপির ঝোল বলছি, বলা উচিত ছিল বাঁধাকপির তরকারি। বাঙালি বাড়িতে বাঁধাকপির তরকারি আলু দিয়ে শুকনো শুকনো হয়। এই হোটেলের রান্নায় ছিল লম্বা ঝোল, আর বেশ গরগরে ঝাল, তাই অন্যরকম লেগেছিল।

জানি, সেই হোটেলে আবার খেতে গেলে বাঁধাকপির ঝোলে সেই স্বাদ আর পাওয়া যাবে না। ওসব দ্বিতীয়বার হয় না।

চিলকিগড়ে হোটেল আছে কি না জানি না।

ঝাড়গ্রামে থেকেও যাওয়া আসা করা যায়। তাতে গাড়ি ভাড়া অনেক পড়ে যাবে। কিছু না কিছু একটা চিলকিগড়ে। পি ডবলু ডি'র বাংলো থাকলে সবচেয়ে ভাল হয়।

ঝাড়গ্রামে কয়েকজনকে ভাল চিনি। তাদের সঙ্গে দেখা হলেই সেঁটে যেতে হবে। কাজের কাজ কিছু হবে না।

একটা সাইকেল রিকশার সঙ্গে দরাদরি করে যাত্রা শুরু হল।

এখানে খানিকটা জঙ্গলের মতন পরিবেশে রয়েছে কনকদুর্গার মন্দির। এককালে

www.amarboi.com

এখানে নাকি নরবলি দেওয়া হত। প্রথমবার এই মন্দিরটা দেখার পর আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম, কারা যেন বলি দিচ্ছে আমাকে। ঘ্যাচাং করে কেটে ফেলল মুণ্ডুটাকে।

তাই কিছুদূর এসে রিকশাওয়ালা যখন জিজ্ঞেস করল, মন্দির দেখতে যাবেন তো? আমি আঁতকে উঠে বললুম, না, না, মন্দির না, তুমি চিলকিগড় রাজবাড়ির দিকে চলো।

এই রিকশা অতদূর যাবে না, মাঝখানে বদল করে আমাকে দ্বিতীয় রিকশা নিতে হবে।

এই সব অঞ্চলে শীতকালটা বড় মনোরম।

এখানে এমন একটা আকাশ আছে, যা কলকাতায় নেই। কলকাতার আকাশ ধোঁয়াটে ধোঁয়াটে, এখানকার আকাশ সত্যিকারের নীল। রাস্তার পাশের গাছপালা আর ছোট ছোট বাড়ি যেন পেন্সিল স্কেচে আঁকা।

হাওয়া বেশ ফিনফিনে। পাজামা-পাঞ্জাবির বদলে আমার প্যান্ট-শার্ট পরে আসা উচিত ছিল। পাঞ্জাবির ওপরে সোয়েটার, তার ওপর চাদর জড়ালেও গা গরম হচ্ছে না। চটির জন্য পায়ে ঠাণ্ডা লাগছে বেশি। আমি চটির সঙ্গে মোজা পরতে পারি না। এক রকম বুড়ো-আঙুলটা আলাদা করা মোজা পাওয়া যায় চটির জন্য, সেটা বদখত লাগে দেখতে।

বিকেল প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

একটা মারুতি গাড়ি হর্ন দিচ্ছে পেছন দিক থেকে। সরু রাস্তা, পাশাপাশি দুটো গাড়ি যেতে পারে না। সাইকেল রিকশাটা একবার সাইড দিতেই মারুতি গাড়িটা ওভারটেক করে এগিয়ে গেল। একটু দূরে গিয়ে থেমে পড়ল হঠাৎ।

সে গাড়ির জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে একজন লোক জিজ্ঞেস করল, চেনা চেনা লাগছে। তুমি কি নীলু?

আমার তো মনে হল, এ লোকটিকে আগে কখনও দেখিনি। মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, চোখে সানগ্লাস।

কিন্তু আমি যে নীলু, তা ঠিক। সেটা অস্বীকার করা যায় না।

রিকশাটা থামিয়ে বললুম, হ্যাঁ, মানে, আপনাকে ঠিক!

চিনতে পারছ না? আমাদের বাড়িতে তোমাকে বেশ কয়েকবার দেখেছি। তুমি মানসের বন্ধু তো?

মানস মানে, মানস রায়বর্মন? হ্যাঁ, সে আমার বন্ধু।

বেলগাছিয়ায় তুমি মানসের বাড়িতে যাওনি?

হ্যাঁ গেছি।

ওটাই আমাদের বাড়ি। আমি মানসের দাদা। এদিকে কোথায় যাচ্ছ?

চিলকিগড়ের রাজবাড়ি দেখতে যাচ্ছি।

নেমে এসো। আমিও তো ওইদিকে যাচ্ছি। সামনে খানিকটা রাস্তা খুব খারাপ। রিকশায় অসুবিধে হবে।

এ আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যানের কোনও যুক্তি নেই।

www.amarboi.com

মানসের দু'জন দাদা আছেন শুনেছি, কখনও কথা বলা হয়নি। তবে দেখেছি দু-একবার। গাড়িতে ওঠার পর জিজ্ঞেস করলুম। আপনার কি আগে এরকম দাড়ি ছিল?

সানগ্লাসটা খুলে ফেলে তিনি বললেন, না। কেন, এতে খারাপ দেখাচ্ছে?

না, তা নয়।

একবার দাড়ি কামাতে গিয়ে থুতনির কাছে অনেকটা কেটে গেল। ওখানে একটা ব্রনো ছিল, খেয়াল করিনি। তারপর কয়েকদিন থুতনির কাছটা আর কমানো যায়নি, ব্যথা ছিল। এক সপ্তাহ পর সেই খোঁচা খোঁচা দাড়ি দেখে মনে হল, তা হলে তো ফ্রেঞ্চ কাট রাখলে মন্দ হয় না। অফিসের লোকরাও বলল, রেখে দিন দাড়ি। রেখে দিন।

আপনি কোন অফিসে আছেন?

গ্র্যান্ড হোটেলে। ম্যানেজমেন্ট পোস্টে।

রাস্তাটা সত্যি খারাপ। প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে গাড়িটা লাফাচ্ছে। গাড়ি চালাচ্ছেন মানসের দাদা নিজে, গাড়িতে আর কেউ নেই। আমি বসেছি সামনে। পেছনের সিটে প্রচুর জিনিসপত্র।

উনি বললেন, ঝাড়গ্রাম গিয়েছিলাম বাজার করতে। কলকাতা থেকেই গাড়ি নিয়ে এসেছি। একটা গাড়ি থাকলে অনেক সুবিধে। তুমি কি ঝাড়গ্রামে উঠেছ? সঙ্গে ব্যাগ দেখছি।

কোথাও ঠিক উঠিনি। আজই এসেছি।

একটু বাদেই তো সন্ধে হয়ে যাবে। ভাল করে রাজবাড়ি দেখাও হবে না। সন্ধের পর ফিরবে কী করে?

ভাবছি আজকের রাতটা এখানেই কোথাও থেকে যাব!

তুমি কি ঝাড়গ্রামে কোনও কাজে এসেছে? ওঃ হো, তুমি তো কোনও কাজেই বিশ্বাস করো না, টো-টো কোম্পানির ম্যানেজার। আচ্ছা, সত্যি করে বলো তো, মানসের মুখে শুনেছি, তোমাকে কেউ ভাল কাজ দিতে চাইলেও তুমি নাকি নাও না?

সে রকম ভাল কাজ কেউ তো দিতে চায়নি!

তোমার স্ট্যান্ডার্ডে ভাল কাজটা কী?

আর যাই হোক, কোনও অফিসে বসে ঘাড় গুঁজে কাজ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

তুমি তো বেড়াতে ভালবাস। তোমাকে সে রকম কোনও কাজ দিলে নেবে? আমাদের হোটেলে অনেক বিদেশি আসে, তারা দার্জিলিং কিংবা সুন্দরবন বেড়াতে গেলে সঙ্গে একজন গাইড নিতে চায়। তুমি সেই গাইড হয়ে যেতে পারো। ভাল পয়সা দেয়। যদি রাজি থাক, কলকাতায় আমার সঙ্গে দেখা কোরো। গ্র্যান্ড হোটেলের কাউন্টারে গিয়ে শোভন রায়কে চাইবে, ওরা ডেকে দেবে।

শোভন রায়? আপনার নাম শোভন রায়? মানসের পদবি তো বর্মন। আপনি ওর আপন দাদা?

www.amarboi.com

হ্যাঁ, আসলে রায়বর্মন, বর্মনটা আমি ছেঁটে ফেলেছি। ফরেনাররা অত বড় নাম উচ্চারণ করতে পারে না। আমরা অরিজিনালি ত্রিপুরার লোক।

অর্থাৎ প্রথম থেকেই আমি শত্রু শিবিরে। হ্যাঁ, শত্রু ছাড়া আর কী! শোভন রায় আমার বন্ধুর দাদা হতে পারে, কিন্তু সে তো প্রীতমের প্রতিদ্বন্দ্বী। আমি প্রীতমের পক্ষের লোক।

এক্ষুনি আমার এ গাড়ি থেকে নেমে পড়া উচিত।

শোভনদা, আমাকে মোড়ের মাথায় নামিয়ে দিন। একটা রিকশা ধরে নেব। রাত্তিরে থাকার জায়গাটা আগে ঠিক করে নেওয়া দরকার।

কোথায় থাকবে?

পি ডব্লু ডি'র বাংলো থাকবে নিশ্চয়ই।

আছে, সেটা দু'জন সরকারি অফিসার দখল করে রেখেছে, আমি জানি।

তা হলে কোনও ছোটখাটো হোটেল।

ভাতের হোটেল আছে একখানা, কিন্তু তাতে রাত্তিরে থাকার জায়গা নেই।

এই রে, তবে তো আমায় ঝাড়গ্রামেই ফিরে যেতে হয়।

কী করে যাবে?

হঠাৎ শোভন রায় হা-হা করে হেসে উঠলেন। বাঁ হাত দিয়ে আমার পিঠ চাপড়ে বললেন, তোমার মুখখানা হঠাৎ আমসি বর্ণ হয়ে গেল কেন?

না তো, আমার মুখটাই এমনি!

তুমি কি জলে পড়েছ নাকি? তুমি আমার ছোট ভাই বিলু, মানে মানসের বন্ধু নীলু। তোমার থাকার জায়গা না থাকলে আমি দেখব না? তুমি রাজবাড়িতে থাকবে!

রাজবাড়িতে?

হ্যাঁ, আমি তো সেখানেই উঠেছি।

রাজবাড়িটা হোটেল হয়ে গেছে বুঝি? ঝাড়গ্রামে—

না, এটা হোটেল হয়নি। আমাকে এমনি থাকতে দিয়েছে। অনেক ঘর খালি পড়ে আছে। তবে, রাজবাড়িতে রাজভোগ খেতে পাবে না। রাজবাড়ির তরফে কেউ এখন নেই এখানে। আমি নিজে রান্নার ব্যবস্থা করিয়ে নিয়েছি।

আচ্ছা শোভনদা, আপনি হঠাৎ এখানে বেড়াতে এলেন কেন? এটা তো তেমন কিছু নাম করা জায়গা নয়!

নামকরা জায়গাগুলোই আমি এড়িয়ে চলি। সব সময় ভিড়। তা ছাড়া আমি ঠিক বেড়াতে আসিনি। বাবাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি। আমার বাবার এমনিতে শরীর স্বাস্থ্য বেশ ভালই আছে, শুধু সুগারটা খুব হাই। ওষুধেও কমে না। একবার ঝাড়গ্রামে এসে বাবা খুব ভাল ছিলেন, সেই থেকে ওঁর ঝাড়গ্রাম জায়গাটা খুব পছন্দ। ঝাড়গ্রাম আর চিলকিগড় তো প্রায় একই। একই রকমের জল হাওয়া। রাজাদের বাড়ির একজনের সঙ্গে আমার অনেকদিনের চেনা, তিনিই বারবার বলেছেন, যখন ইচ্ছে চলে যাবেন—

শুধু আপনি আর মেসোমশাই? মানস কেন এল না?

তোমার ছোঁয়া লেগেছে তো, কাজকর্মে মন নেই। পাড়ার ক্লাব নিয়ে মেতে ছিল।

www.amarboi.com

ওকে জোর করে গত মাসে চাকরিতে ঢুকিয়ে দিয়েছি।

মানস চাকরি পেয়েছে? কোথায়?

ওই গ্র্যান্ড হোটেলেই।

বাবা, আপনারা দু' ভাই-ই গ্র্যান্ড হোটেলে।

হ্যাঁ, তা বলে যেন যখন তখন ওর সঙ্গে হোটেলে দেখা করতে যেয়ো না। অনেকে ভাবে, গ্র্যান্ড হোটেলে চাকরি করি, ওখানে গেলেই বুঝি বিনা পয়সায় খাওয়াব। ওসব চলে না।

আপনি তবু আমাকে চিনতে পারলেন, মানস বোধহয় আমাকে আর চিনবেই না। সুট-টাই পরে?

তা তো পরতেই হবে।

গাড়ি এসে পৌঁছে গেল রাজবাড়ির দেউড়ির সামনে।

হঠাৎই যেন সন্ধে নেমে এসেছে। দেউড়িটা বেশ বড়, আর ভেতরের রাজবাড়িটা সিনেমার রাজবাড়ির মতন। আবছা অন্ধকারে এই সব পুরনো প্রাসাদ রহস্যময় দেখায়। একটা পাশে শুধু মৃদু আলো জ্বলছে।

ঘণ্টা বাজার শব্দ শুনে মনে পড়ল এর মধ্যে একটা শিবমন্দির আছে। এখনো পুজো হয় তা হলে।

একটা কথা মনে করব— না, মনে করব না ভেবেও মনে আসছে বারবার। প্রীতম আমাকে হোটেল ভাড়া দিয়েছিল, সেটা বেঁচে গেল। একেবারে রাজবাড়ির অতিথি!

বেলগাছিয়ায় মানসদের বাড়িতে আমি মোট তিনবার গেছি। তার এই দাদাটির সঙ্গে কখনও কথা হয়নি বটে, কিন্তু মেসোমশাইকে ভালই চিনি। রেলের বড় অফিসার ছিলেন, রিটায়ার করেছেন বছর পাঁচেক আগে। কিন্তু চেহারা দেখলে তাঁর বয়েস বোঝাই যায় না। রীতিমতন সুপুরুষ। সেই তুলনায় শোভনদা কিংবা মানসের চেহারা সাধারণ। বিশেষত শোভনদাকে দেখতে ভালই বলা যায়, কিন্তু অসাধারণত্ব কিংবা বৈশিষ্ট্য কিছু নেই।

একদিন একটা ব্যাপার দেখে বেশ মজা লেগেছিল। একদিন মানস আর আমি গল্প করছি, মেসোমশাই হঠাৎ ঘরে ঢুকে পরে বললেন, এই ভুলু, তোর একটা সিগারেট দে তো! আমার প্যাকেটা খালি দেখছি।

ছেলের কাছ থেকে এই ভাবে সিগারেট চাইতে আমি আর কোনও বাবাকে দেখিনি।

শুধু তাই নয়, আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, তোমার হাতে ওটা কী বই দেখি! তুমি আগাথা ক্রিস্টি পড়ো? জর্জ সিমোঁনের কোন লেখা পড়েছ? আগাথা ক্রিস্টির চেয়েও ক্রাইম স্টোরি ভাল। এ বইটা আমি নিলাম, কাল ফেরত পাবে।

মানসের মা অনেক দিনই নেই।

গাড়ি থেকে সব জিনিসপত্র নামিয়ে আমাকে কিছু বইতে হল। অনেক রকম বিস্কুট, টিনের খাবার, কয়েক প্যাকেট লজেন্স, মাংস, চাল-ডাল, তরকারি। এত লজেন্স কার জন্য?

www.amarboi.com

দোতলায় এসে দেখলাম, বারান্দায় রেলিং-এর ধারে একটা চেয়ারে বসে আছেন মেসোমশাই। এক হাতে জ্বলন্ত সিগারেট, এক হাতে বই, একটা হ্যাজাক বাতি জ্বলছে পাশে।

বন্ধুর বাবা, প্রণাম করতেই হবে, উপায় নেই।

মেসোমশাই কেমন আছেন, বলে তাঁর পায়ে হাত দিতেই তিনি চমকে গিয়ে বললেন, কে? তুমি কে?

শোভনদা বললেন, বাবা, এ বিলুর বন্ধু। এর নাম নীলু। হঠাৎ রাস্তায় দেখা হয়ে গেল।

পাশের ছোট টেবিলে রাখা চমশাটা নিয়ে চোখে লাগিয়ে বললেন, ও নীললোহিত চন্দর। তুমি এখানে হঠাৎ এসে পড়লে?

হ্যাঁ, মেসোমশাই।

কোনও বই এনেছ?

আছে দু-এক খানা।

আমায় দিয়ো। আর্ল স্ট্যানলি গার্ডনার পড়ো না তো? ওর লেখা আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না।

এবারে লক্ষ করলাম, মাটিতে রাখা হয়েছে একটা মদের বোতল। টেবিলের ওপরের গেলাসে অনেকখানি ঢালা।

শোভনদা বলল, বাবা, তুমি আবার সিগারেট খাচ্ছ?

মেসোমশাই ধমকে উঠে বললেন, যা যা। বেশি গার্জেনগিরি করিস না। সারা বিকেল একটাও খাইনি। এই তো সবে মাত্র এ়কটা ধরিয়েছি।

তোমার জন্য লজেন্স এসেছি।

কাল সকালে খাব। ড্রিংক্সের সঙ্গে সিগারেট ছাড়া জমে? নীলু চন্দর, তুমি আমার সামনে সিগারেট ফিগারেট খেতে পারো। তুমি কি মদ টদ খাও?

আজ্ঞে, না। মানে, অভ্যেস নেই।

অভ্যেসের কথা কি জিজ্ঞেস করছি? এই বয়েসে আবার অভ্যেস হবে কী করে? মাঝে মাঝে খাও? চেখে দেখেছ কখনও। তা হলে একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ো। এসব কি একা একা জমে। আমার গুণধর ছেলে আবার এসব ছোঁয় না।

শোভনদা বললেন, বাবা, তুমি আবার নীলুকেও বসাতে চাইছ কেন?

মেসোমশাই, অর্থাৎ জীবনকৃষ্ণ রায়বর্মন বজ্র কণ্ঠে বললেন, তুই থাম তো! দেখো নীলু, কী ছেলেই তৈরি করেছি। আমার ছেলে হয়ে মদ খায় না, সিগারেট খায় না, একেবারে বংশের মান ডোবাবে। সিগারেট মদ না খেয়েও তুই কি আমার থেকে বেশিদিন বাঁচবি, গ্যারান্টি দিতে পারবি? এর মধ্যে তো বুড়োটে চেহারা হয়ে গেলে।

আমার একটা গল্প মনে পড়ে গেল।

মধ্য এশিয়ার কোনও দেশে এক ব্যক্তির বয়েস হয়েছিল একশো সাতাশ বছর। তাঁর জন্মদিনে সাংবাদিকরা তাঁকে ঘিরে ধরে প্রশ্ন করেছিল, আপনার এই দীর্ঘজীবনের রহস্য কী বলুন। তিনি বললেন, রহস্য কিছু নেই। শুধু নিয়ম মেনে চলা।

www.amarboi.com

আমি আজীবন ভোরবেলা হাঁটতে বেরোই। ঠিক সময়ে খাই। ঠিক সময়ে ঘুমোই। মদ, সিগারেট বা কোনও নেশার দ্রব্য কখনও ছুঁইনি। নিজের স্ত্রী ছাড়া অন্য কোনও রমণীর প্রতি দৃষ্টি দিইনি...

এই সব কথার সময় ওপর তলায় মাঝে মাঝে একটা চ্যাঁচামেচি শোনা যাচ্ছে। কেউ যেন বজ্রকণ্ঠে হুংকার দিয়ে কিছু বলছে।

কৌতূহল চাপতে না পেরে একজন সাংবাদিক জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা, ওপরে কীসের গোলমাল হচ্ছে?

দীর্ঘজীবী ব্যক্তিটি বললেন, আর বলবেন না। ওপরে থাকেন আমার বাবা। উনি আজ আবার জোর করে বেরুতে চাইছেন। যেদিনই বেশি মদ খেয়ে ফেলেন, সেদিনই উনি ওঁর পুরনো বান্ধবীর কাছে যেতে চান!

॥ ৪ ॥

বুড়ো মানুষদের নাকি এমনিতেই ঘুম কমে যায়, জীবনকৃষ্ণ রায়বর্মনের আবার প্রাতর্ভ্রমণের রোগ আছে। রোগ বলা ঠিক হল না, অনেকে চটে যাবে। অন্তত বাতিক বলা যেতে পারে। হাঁক ডাক করে আমাকেও বিছানা ছাড়তে বাধ্য করলেন।

তিনি বললেন, চলো, নীলু, আজ ডুলুং নদীর ধার দিয়ে হাঁটব।

শোভনদা যাবেন না। রোজ সকালে অন্তত এক ঘণ্টা পাঁচ মিনিট যোগ ব্যায়াম না করে উনি বাড়ি থেকে বেরোন না।

উনি বললেন, বাবা, তুমি নীলুকে নিয়ে এগিয়ে যাও, আমি খানিকটা বাদে যাচ্ছি।

মেসোমশাই সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে গজগজ করে বলতে লাগলেন, হুঁ যোগব্যায়াম! তার থেকে ফ্রেস এয়ার গায়ে লাগলে কত ভাল। নীলু, তুমি ওসব করো টরো নাকি?

আমি বললুম, শুনেছি খুব উপকার হয়। তবে আমার ঠিক শেখা হয়নি।

কোনও দরকার নেই। হাঁটবে, যত পারো হাঁটবে। হাঁটলে বডি ফিট থাকে। মহাত্মা গাঁধী কত হাঁটতেন। রবীন্দ্রনাথ রোজ সকালে—

রবীন্দ্রনাথও মর্নিং ওয়াক করতেন নাকি?

করতেন না?

কী জানি। জীবনী লেখকরা এটা লিখতে ভুলে গেছে।

চটি পরেছ কেন? শু আনোনি?

না মেসোমশাই।

এই তো চ্যাংড়া ছেলেদের দোষ। আমরা কক্ষনও চটি পরে রাস্তায় বেরুইনি। সব সময় মোজা আর শু, তাতে হাঁটা ভাল হয়।

রিটায়ার করলেও জীবনকৃষ্ণ রায়বর্মনের পোশাক ও চালচলন অফিসার সুলভ। টাই নেই বটে, তবে এক রঙা প্যান্ট ও কোট, চকচকে জুতো। এখানকার শীত কলকাতার চেয়ে অনেক বেশি, অনেক বুড়ো লোক কান ঢাকা মাংকি টুপি পরে। ইনি

www.amarboi.com

মাথায় কিছুই দেননি। গলায় শুধু একটা মাফলার জড়ানো। অবশ্য ইনি তো বুড়ো নন। বয়েসের দিক থেকে হলেও আর পাঁচজন বুড়োর সঙ্গে মিল নেই।

হাঁটবেনও হনহন করে। কোনও দিকে তাকাবেন না। যেন নির্দিষ্ট কোনও গন্তব্য আছে।

এই শীতের মধ্যে বুট জুতো না-আনা সত্যি ভুল হয়েছে। চটি পরে কি তাড়াতাড়ি হাঁটা যায়? প্যান্ট-শার্টের ওপর সোয়েটার। তার ওপরে আলোয়ান চাপিয়েছি বটে, তবু ঠাণ্ডা লাগছে পায়ে।

এ কাহিনীর নায়িকা কোথায়?

কী যে আমার ভাগ্য! এসেছি একটি তরুণীকে অনুসরণ করার জন্য, তার বদলে পাল্লায় পড়ে গেছি ভিলেনের বাবার! তিনি আবার এক খ্যাপাটে প্রৌঢ়!

একটা ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হওয়া গেছে। শোভন রায়কে ঠিক ভিলেন বলা যায় না। সে যে পিছুপিছু এখানে আসেনি, এটা নিশ্চিত বলা যায়। এই চিলকিগড়ে আসার তার একটা অকাট্য কারণ আছে। প্রেম করার জন্য কেউ বাবাকে সঙ্গে নিয়ে আসে না। হয়তো জুন আর শোভনের এই একই সময়ে চিলকিগড়ে বেড়াতে আসা কাকতালীয়।

মাঝে মাঝে মেসোমশাই হাঁক দিচ্ছেন, কই নীলু, পিছিয়ে পড়ছ কেন? ইয়াংম্যান, আমার সঙ্গে পা মেলাতে পারো না?

রাস্তায় যাকেই দেখছেন, তার সঙ্গেই কথা বলছেন মেসোমশাই। ক'দিনের মধ্যেই বেশ ভাব জমিয়ে নিয়েছেন সকলের সঙ্গে।

এক জায়গার দাঁড়িয়ে পড়ে কার উদ্দেশে যেন বললেন, গুড মর্নিং মিসেস চ্যাটার্জি! আজ আমার আগে আগেই বেরিয়ে পড়েছেন!

ডানদিকে একটা বাড়ির সামনে গোলাপ বাগান। প্রচুর গোলাপ ফুটেছে, সেই বাগানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে দুটি রমণী, মনে হয় কাছাকাছি বয়েসি, দু'জনের মুখের এমন মিল যে দেখলেই বোঝা যায় দুই বোন।

একটু বয়েস বেশি যে মহিলার, তিনি হাত জোড় করে বললেন, সুপ্রভাত, আজ তাড়াতাড়ি ঘুম ভেঙে গেল। শেষ রাতে একটুখানি বৃষ্টি হয়েছে, জানেন?

জীবনকৃষ্ণ বললেন, তাই নাকি? টের পাইনি তো। আমি নেশা টেশা করি, এক ঘুমে রাত কাবার হয়ে যায়।

একজন অনাত্মীয়া এবং সদ্য পরিচিতা মহিলার কাছে সক্কালবেলা নেশার কথা বলতে জীবনকৃষ্ণের লজ্জা নেই।

মিসেস চ্যাটার্জি বললেন, এই গোলাপ ফুলের পাপড়িগুলোতে বৃষ্টির ফোঁটা এখন লেগে আছে। কী সুন্দর দেখাচ্ছে।

জীবনকৃষ্ণ এগিয়ে গেলেন বাগানের মধ্যে। ফুলের পাপড়িতে শিশির বিন্দুর বদলে বৃষ্টি বিন্দু দেখতে লাগলেন মন দিয়ে।

তারপর তিনি একটা ফুল ছিঁড়তে যেতেই অন্য মেয়েটি বলল, ও কী করছেন? না, না, ফুল ছিঁড়বেন না।

মিসেস চ্যাটার্জি বললেন, গোলাপ ছেঁড়া সোজা নাকি? কাঁটা ফুটে যায়। ফুটেছে তো? রক্ত বেরিয়েছে?

জীবনকৃষ্ণ ডান হাতের তর্জনী মুখে পুরে দিয়ে নিজের রক্ত চুষতে লাগলেন।

নারী দুটি হাসতে লাগল খুব।

জীবনকৃষ্ণ আঙুলটা রুমালে মুছে পকেট থেকে কয়েকটা লজেন্স বার করে বললেন, এই নিন। টফি খান।

মিসেস চ্যাটার্জি বললেন, না, না। এই সাত সকালে টফি খাব কেন?

জীবনকৃষ্ণ বললেন, খান না। এরপর অনেকখানি হাঁটতে হবে তো! একটু মিষ্টি গেলে এনার্জি বাড়ে।

প্রায় জোর করেই তিনি নারী দুটির হাতে গুঁজে দিলেন লজেন্স। নিজেও একটা মুখে পুরলেন।

আমি দাঁড়িয়ে আছি রাস্তায়। মেসোমশাই যেন আমার কথা ভুলেই গেছেন।

হঠাৎ আবার মনে পড়ায় তিনি পেছন ফিরে বললেন, এই নীলু, তুমি ওখানে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? এসো, তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই!

মহিলা দুটি তাকালেন আমার দিকে।

মেসোমশাই বললেন, এই ছেলেটির নাম নীললোহিত, আমার ছোট ছেলের বন্ধু, বেশ ছেলে, ভাল ছেলে, কিছুই কাজকর্ম করে না, ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। আর নীলু, ইনি হচ্ছেন মিসেস চ্যাটার্জি, আর ওঁর মেয়ে প্রথমা।

নায়িকাকে প্রথম দেখার চমকের চেয়েও আমি বেশি অবাক হলাম, ওরা দুই বোন নয়, মা আর মেয়ে এ কথা জেনে। একেবারে বোঝাই যায় না।

প্রথমা অর্থাৎ জাহানারা অর্থাৎ জুনের বয়েস যদি ছাব্বিশ-সাতাশ হয়, তবে তার মায়ের বয়েস অন্তত পঞ্চাশ-বাহান্ন হওয়া উচিত। কিন্তু দেখলে মনে হয় পঁয়তিরিশের বেশি নয়।

জুন পরে আছে জিন্‌স ও শার্ট, তার মায়ের অঙ্গে ধূপের ধোঁয়া রঙের শাড়ি। জুনের ছিমছাম, স্মার্ট চেহারা, তার মা প্রকৃত রূপসী। ঔজ্জ্বল্যের চেয়ে স্নিগ্ধতাই বেশি।

আমি জুনের সঙ্গে কথা বলার আগে তার মাকে জিজ্ঞেস করলুম, আপনার পুরো নাম কী?

তিনি বললেন, পরমা চ্যাটার্জি। হঠাৎ এটা জানতে চাইলেন কেন?

আমি তো আপনাকে মিসেস চ্যাটার্জি বলে সম্বোধন করতে পারব না। আর পুরো নামটা না শুনলে কোনও মানুষের পুরো পরিচয়টাও জানা হয় না।

মেসোমশাই বললেন, ঠিক বলেছে তো ছেলেটা। আমার এ ক'দিন খেয়ালই হয়নি। জানতে চাইনি।

পরমা বললেন, আমি কিন্তু প্রথম দিন আপনাকে আমার পুরো নামই বলেছিলাম, আপনি ভুলে গেছেন।

মেসোমশাই বললেন, বলেছিলেন বুঝি? এই দ্যাখো, ভুলে গিয়েছি। আমাদের

www.amarboi.com

অফিস টফিসে কেউ তো কারও নাম ধরে ডাকে না। সেটাই অভ্যেস হয়ে গেছে।

পরমা বললেন, অফিস থেকে রিটায়ার করার পরও বুঝি অফিস ভুলতে পারেন না?

আমি বললুম, উনি ছিলেন মস্ত অফিসার। এখন সেটা ভুলে গেলে যে সাধারণ মানুষ হয়ে যাবেন। সেই জন্যই ভুলতে পারেন না।

পরমা বললেন, আমার স্বামীও মোটামুটি বড় অফিসার ছিলেন। তিনি কিন্তু খুব বাঙালি ছিলেন। প্রত্যেক বিয়ে বাড়িতে ধুতি পাঞ্জাবি পরে যেতেন, বাড়িতে ছেলেমেয়েদের একদম ইংরেজি বলতে দিতেন না। খানিকটা বেকায়দায় পড়ে গিয়ে জীবনকৃষ্ণ ফস করে একটা সিগারেট ধরিয়ে ফেললেন।

পরমা মৃদু ধমকের সুরে বললেন, ও কী, এত সকালে সিগারেট খাচ্ছেন?

সবাই মিলে গার্জেনগিরি করবেন না। অনেক দিনের নেশা।

তা বলে লজেন্সও খাবেন, সিগারেটও খাবেন? আপনি বলেছিলেন, ব্লাড সুগার বেশি?

আমার ছেলেই তো সিগারেট ছড়াবার জন্য আসলে লজেন্স ধরাতে চাইছে। ওর ধারণা, ব্লাড সুগারের চেয়েও ধূমপান বেশি ক্ষতিকর।

তা বলে আপনি দুটোই খাবেন?

সিগারেটটা ছাড়বার তো চেষ্টা করছি। কম খাচ্ছি!

কমটমে কাজ হয় না। জুনের বাবাও খুব সিগারেট খেতেন। ছাড়াবার কত চেষ্টা করেছি। ওটা ফেলে দিন!

আমি তো জানি, সিগারেটে যাদের নেশা, মেয়েদের সঙ্গে কথা বলার সময় তাদের হাত নিশপিশ করে। হাতে একটা সিগারেট থাকলে স্মার্টনেস বেড়ে যায়।

জীবনকৃষ্ণ বাধ্য ছেলের মতন পরমা'র কথা শুনে তিন-চতুর্থাংশ জ্বলন্ত সিগারেটটা ছুড়ে ফেলে দিলেন।

তখনই বিদ্যুৎ চমকের মতন আমার মাথায় একটা আইডিয়া এল।

জীবনকৃষ্ণ অনেকদিন বিপত্নীক। জুনের বাবাও বেঁচে নেই। তার মাকে প্রায় যুবতী বলে মনে হয়। জীবনকৃষ্ণ রসেবশে থাকেন, শুকনো সন্ন্যাসী হয়ে থাকবার মতন মানুষ নন। এদের দু'জনের প্রেম হতে পারে না?

এদের যদি বিয়ে হয়, তা হলে তো যত সমস্যাই মিটে যায়। এই দু'জনের বিয়ে হলে পরমাকে মা বলে ডাকতে হবে শোভন রায়কে, জুন হয়ে যাবে তার বোন। বৈমাত্রেয় হলেও বোন তো, তার সঙ্গে প্রেম করা চলে না। তা হলে আমাদের প্রীতমের পক্ষে জুনের জন্য লাইন খোলা থাকবে। তারপর তার এলেম।

বিয়ে যদি নাও হয়, দু'জনের প্রেম তো হতেই পারে। জীবনকৃষ্ণের ভাবভঙ্গিতে সেই রকম ইঙ্গিতও পাওয়া যাচ্ছে।

বাবা প্রেম করছে একজনের মায়ের সঙ্গে, আর ছেলে প্রেম করছে তার মেয়ের সঙ্গে, এরকম ইতিহাসে কখনও দেখা যায়নি। বাবার যেমন ব্যক্তিত্ব, তিনিই তাঁর ছেলেকে হঠিয়ে দেবেন।

www.amarboi.com

জীবনকৃষ্ণ বেশ গদগদ হয়েই আছেন, এতখানি সিগারেট কোনও ধূমপায়ী ফেলে দেয়। এখন আমার একমাত্র কাজ। মায়ের কাজ থেকে জুনকে সরিয়ে নেওয়া, জীবনকৃষ্ণ পরমাকে নিরি-বিলি কথা বলার সুযোগ দেওয়া।

আমার কাছেই একটা গোলাপ ফুলে বসে ছিল একটা রঙিন কাচ পোকা। এগুলোকে টিপ পোকাও বলে। সেটা উড়ে গিয়ে বসল খানিকটা দূরে আর একটা ফুলে।

আমি সেদিকে গিয়ে দেখতে লাগলুম কাচ পোকাটাকে। তারপর হাতছানি দিয়ে জুনকে ডেকে বললুম, এদিকে একটা জিনিস দেখবেন আসুন।

জুন কাছে আসতেই বললুম, দেখুন কী সুন্দর একটা পোকা! কী আশ্চর্য রং! পোকাটা আমাকে সাহায্য করার জন্য তক্ষুনি উড়ে গেল না। চুপ করে বসে রইল।

জুন বলল। হ্যাঁ, ভারী সুন্দর। অনেকদিন দেখিনি।

ছবি তুলবেন না? ক্যামেরা আনেননি!

ক্যামেরা? না তো।

প্রফেশানাল ক্যামেরাম্যানরা তো সব সময় ক্যামেরা সঙ্গে রাখে।

প্রফেশানাল ক্যামেরাম্যান তো আমি নই।

আপনি ছবি তোলেন না? কাগজে জুন চ্যাটার্জির নামে যে-সব ছবি ছাপা হয়, সেগুলো আপনার নয়।

আমি ছবি তুলি, ছাপাও হয়। কিন্তু ক্যামেরাম্যান নই।

তার মানে?

ক্যামেরাম্যান মানে তো পুরুষ।

ওঃ হো। পুরুষশাসিত সমাজের কাণ্ড। আগে মেয়েদের হাতে ক্যামেরা বিশেষ দেখাও যেত না। তা হলে কী বলব, ক্যামেরা উয়োম্যান। শুনতে ভাল নয়। ক্যামেরা পার্সন বলাই বোধ হয় ঠিক।

আমি নিজেকে তা-ই বলি।

আপনি ভাল ছবি তোলেন জানি। এই সব পোকা-টোকার ছবি তোলেন না? আজকাল অনেকে শুধু পশু-পাখি, পোকা টোকার ছবিতে স্পেশালাইজ করে।

ডিসকভারি চ্যানেল চালু করার পর অনেকের ওই শখ হয়েছে। আমি তুলি না।

আপনি শুধু মানুষের ছবি তোলেন? আপনার গুরু কে। কার্তিয়ের ব্রেসোঁ?

আপনি ওঁর নাম জানেন দেখছি।

আপনাকে ইমপ্রেস করার জন্য বললুম। আমি অনেক ফটোগ্রাফির প্রদর্শনী দেখতে যাই। আমার এক বন্ধুও ছবি তোলায় বেশ নাম করেছে। প্রীতম সেনগুপ্ত, আপনি তাকে চেনেন?

প্রীতমের নাম শুনে জুনের মুখের রেখায় কোনও ভাবান্তর হল না। নির্লিপ্ত গলায় বলল, হ্যাঁ, দেখেছি দু-একবার।

কাচ পোকাটা এবার উড়ে গেল।

জুনের কাঁধের ব্যাগটা খসে পড়ে গেল মাটিতে। আমি হাত বাড়াবার আগে সে

www.amarboi.com

নিজেই তুলে নিল ব্যাগটা।

আমি বললুম, ইস্, আমাকে তুলতে দিলেন না!

ওসব খুব পুরনো হয়ে গেছে। এখন বোকাবোকা লাগে। নিজের ব্যাগ নিজে তুলব না কেন? আপনি কি মেয়েদের দেখলে গাড়ির দরজা খুলে দাঁড়িয়ে থাকেন?

হ্যাঁ থাকি। তারপর সেলাম করে বলি, বকশিশ ম্যাডাম!

জুন মুচকি হাসল। তারপর বলল, আপনার কথা বলুন। আপনি সত্যিই কোনও কাজকর্ম করেন না?

না, একেবারে বিশুদ্ধ নিষ্কর্মা যাকে বলে।

হয়তো আপনার টাকা পয়সার চিন্তা নেই। কিন্তু একেবারে কিছুই না করে সময় কাটান কী করে?

লোকে যাকে কাজ বলে, তা করি না বটে, কিন্তু আমি খুব ব্যস্ত থাকি। সময়ই পাই না।

তা হলে কী করেন?

স্বপ্ন দেখি। শুয়ে শুয়ে আকাশ-পাতাল চিন্তা করি। বিনা উদ্দেশ্যে ঘুরে বেড়াই। কোনও লোক চেনে না, এমন জায়গায় গিয়ে কাটিয়ে আসি কয়েকটা দিন।

কোনও লোক চেনে না, এমন একটা জায়গার নাম করুন তো।

দিকশূন্যপুর।

দিকশূন্যপুর? সে জায়গাটা কোথায়?

আমি নিজের মাথায় একটা টোকা মেরে বললুম, এইখানে।

জুন বলল, ও কাল্পনিক।

না, মোটেই কাল্পনিক নয়। বাস্তব। সেখানে ছোট ছোট পাহাড় আছে, জঙ্গল আছে। একটা চমৎকার নদীও আছে। লাল মাটির রাস্তা, অনেক দূরে দূরে একটা বাড়ি, সেখানে থাকে পলাতক মানুষেরা।

পলাতক মানে? কোনও ক্রাইম করে পালিয়েছে?

বরং উল্টো। তারা কোনও অপরাধ সহ্য করতে পারে না। অপরাধী মানুষদের থেকে দূরে পালাতে চায়। নিজের কাছ থেকেও পালাতে চায়। আমি মাঝে মাঝে আমার মাথার মধ্যে দিকশূন্যপুরের ডাক শুনতে পাই। সেখানকার ছবিটা ভেসে ওঠে। তখনই ছুটে যেতে ইচ্ছে করে।

কী করে সেখানে যেতে হয়? ডিরেকশানটা বলুন তো।

হাজার ডিরেকশান দিলেও আপনি সেখানে পৌঁছতে পারবেন না। সেখানে সরাসরি ট্রেন যায় না। বাস যায় না। পাহাড় আর নদী ঘেরা জায়গাটা বাইরে থেকে দেখাও যায় না।

আপনি তো চেনেন। আপনি নিয়ে যেতে পারেন না?

তা পারি।

তা হলে আমাকে একদিন নিয়ে চলুন।

আপনি যাবেন? কিন্তু সেখানে তো আপনার মাকে নিয়ে যাওয়া যাবে না। ওঁর কষ্ট

www.amarboi.com

হবে।

আমি একাই যাব। আপনি কি ভেবেছেন, আমি মায়ের আঁচলের তলায় থাকি? একা একা কত জায়গায় গেছি। এখান থেকে কত দূরে?

বেশ দূর আছে। একদিনে ফিরে আসা যাবে না। সেখানে রাত কাটাতে হবে। রাত না কাটালে জায়গাটা ঠিক বোঝাও যায় না।

রাত কাটাব। থাকার জায়গা পাওয়া যাবে তো?

আর কথা এগোল না। একটা গাড়ি এসে থামল বাগানের পাশের রাস্তায়।

শোভনদা গাড়ির জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললেন, তোমরা নদীর ধারে যাবে না?

জীবনকৃষ্ণ রেগে গিয়ে বললেন, দেখেছ, গাড়ি নিয়ে এসেছে। এক পা হাঁটতে চায় না। যা, যা তুই যা, আমরা হেঁটেই যাব।

শোভনদা বলল, তা হলে আমি একটু বাজারে ঘুরে আসছি।

জুন বলল, আপনি বাজারে যাচ্ছেন? তা হলে আমিও যাব আপনার সঙ্গে, এই সময় ভাল মাছ পাওয়া যায়।

জুন দৌড়ে গিয়ে গাড়িতে উঠে পড়ল।

আমি একটু দ্বিধায় মধ্যে পড়ে গেলুম।

জুন একা শোভন রায়ের সঙ্গে গাড়িতে যাচ্ছে। ওদের মধ্যে কতটা ভাব? হাত ধরাধরি হয়ে গেছে?

জীবনকৃষ্ণ আর পরমা'র সঙ্গেই বা আমি থেকে কী করব? আমি না থাকলে ওঁরা নিরিবিলিতে আরও কথা বলার সময় পাবেন। আমার থাকা মানেই তো কাবাব মে হাড্ডি।

গাড়িটা স্টার্ট দিয়েছে। আমি দৌড়োতে দৌড়োতে বললুম, শোভনদা, দাঁড়ান, দাঁড়ান, আমিও বাজারটা দেখতে যাব।

॥ ৫ ॥

বাজারটি খুবই ছোট।

এই সব জায়গার বাজারে এক একদিন হঠাৎ ভাল মাছ আসে, অন্যান্য দিন মাছের অবস্থা খুবই করুণ।

নদীর ধারের শহর হলেও যে অনেক মাছ পাওয়া যাবে, তার কোনও মানে নেই। আমাদের কলকাতা শহরের পাশেও তো একটা মস্ত নদী আছে, কতটুকু মাছ আসে সেখান থেকে? আজকাল ইলিশও আসে না। কাতলা মাছ আসে অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে।

এখানকার বাজারেও চালানি মাছ। সে সব মাছের গায়ের রং দেখলেই বোঝা যায়, তারা জল থেকে উঠেছে বেশ কয়েকদিন আগে।

কোনও মাছই জুনের পছন্দ হল না।

শোভনদা বলল, পাঁঠার মাংস বিক্রি হচ্ছে। বেশ কচি পাঁঠা। কলকাতায় এরকম পাওয়া যায় না। চলো, তাই কিনি।

www.amarboi.com

জুন বলল, আমি মাংস খাই না।

পাঁঠার মাংস খাও না, শুধু মুরগি খাও? মুরগি খেতে খেতে একঘেয়ে লাগে না?

সে কথা তো বলিনি। মুরগিও খাই না। কোনও মাংসই খাই না।

এই রে, তা হলে কী হবে?

বাড়িতে ডিম আছে। আমি আর মা দু'জনেই মাঝে মাঝে ডিমের ঝোল খেয়ে চালিয়ে দিই। নিরামিষেও আমার অসুবিধে হয় না।

তোমার মা-ও মাছ ভালবাসেন?

খুব।

তা হলে চলো প্রথমা, ঝাড়গ্রাম থেকে ঘুরে আসি। ওখানে টাটকা মাছ পাওয়া যাবেই।

মাছ কিনতে ঝাড়গ্রাম?

কতক্ষণই বা লাগবে! চলো, চলো—

শোভনদা আমার দিকে ফিরে বলল, নীলু, তুই কী করবি?

ইঙ্গিতটা স্পষ্ট। শোভনদা আমাকে ঝাড়গ্রামে নিয়ে যেতে চায় না। মাছ কিনতে যাওয়াও হবে। জুনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাও হবে। অর্থাৎ এখানেও আমি কাবাব মে হাড্ডি!

মানুষের মন সবচেয়ে দমে যায়, যখন সব জায়গায় নিজেকে অবাঞ্ছিত মনে হয়।

আমি বললুম, আমি আর ঝাড়গ্রামে যাব না। এখানেই একটু ঘুরে বেড়াই। রঙ্কিনী দেবীর মন্দিরটা দেখার আছে।

জুন জিজ্ঞেস করল, আপনি দেখেননি বুঝি আগে?

না। শুনেছি এই মন্দিরেও নরবলি হত।

আমিও তাই শুনেছি। দেখলে এখনও গা ছমছম করে। কোনও লেখক সেখানে গেলে একটা রোমাঞ্চকর গল্প লিখে ফেলতে পারতেন।

বিভূতিভূষণ আগেই লিখে ফেলেছেন। আপনি পড়েননি?

না। আমার বাংলা গল্প বিশেষ পড়া নেই।

শোভনদা আর জুন চলে গেল গাড়ির দিকে। আমি বাজার থেকে দুটো ডাঁশা পেয়ারা কিনে ফেললুম। অনেকদিন পেয়ারা খাওয়া হয়নি।

বলতে গেলে, আমার কাজ এখানে শেষ।

প্রীতম আমাকে দুটি জিনিস দেখার জন্য পাঠিয়েছিল। শোভন রায়ও চিলকিগড়ে এসেছে কি না। যদি আসে, তা হলে ওদের দু'জনের কতটা ভাব, হাতে ধরা পর্যন্ত এগিয়েছে কি না।

দুটোই দেখা হয়ে গেছে।

হাতে হাত ধরাটা দেখিনি বটে, কিন্তু জুন শোভন রায়ের সঙ্গে একলা গাড়িতে যায়। এইমাত্র চলো চলো বলে শোভন রায় জুনের পিঠে হাত দিল। পিঠে হাত দিলে কি হাত ধরা বাকি থাকে? ইফ উইন্টার কাম্‌স, ক্যান স্প্রিং বি ফার বিহাইন্ড?

শোভন রায় আর জুনের প্রেম, আর ওদের বাবা-মা পরমা আর জীবনকৃষ্ণের প্রেম, কোনটা তাড়াতাড়ি এগোবে?

www.amarboi.com

সে যাই হোক, এখন আমি কী করি? ও সব ভূতুড়ে মন্দির টন্দির দেখার একটুও ইচ্ছে আমার নেই।

এখানকার পেয়ারা ভারী সুস্বাদু। আপাতত পেয়ারা চিবুতে চিবুতে হাঁটতে লাগলুম উদ্দেশ্যহীন ভাবে।

শীতের শিরশিরে হাওয়া দিচ্ছে বটে, তাতে শরীরটা বেশ চনমনে লাগে।

রোদ উঠেছে। কিন্তু তাতে একটুও তাপ নেই। এমন রোদ আমরা বছরে দু'মাসও পাই না। এমন নীল আকাশও কলকাতায় দুর্লভ।

পেয়ারা দুটো শেষ করার পর মনে হল, এত চমৎকার পেয়ারা বহুকাল খাইনি। মুখে একটা অতৃপ্তি লেগে রইল। আরও পেয়ারা খেলে কেমন হয়? সকালে তো কিছু খাওয়া হয়নি।

ফিরে গিয়ে আরও দুটো পেয়ারা কিনে ফেললুম।

আমার দাদা-বউদি যদি এখানে উপস্থিত থাকত, তা হলে নিশ্চিত আমাকে বকুনি দিয়ে বলত, ধুয়ে নিলি না আগে?

অনেকেরই আজকাল স্বাস্থ্যবাতিক বড্ড বেড়েছে!

আমরা ছোটবেলায় গাছ থেকে যখন পেয়ারা পেড়ে খেতুম, তখন ধোয়া-টোয়ার তর সইত না। প্যান্টে একটু ঘষে নিয়ে কামড় লাগাতুম। তখন কিছু তো হয়নি। এই পেয়ারাগুলোও এত টাটকা, যেন আজই ভোরে গাছে থেকে পেড়ে আনা হয়েছে ঝুড়ি ভর্তি। প্রত্যেকটি পেয়ারার সঙ্গে রয়েছে কয়েকটা সবুজ পাতা।

আজ কী হল আমার?

বড় বড় চারখানা পেয়ারা খেয়ে শেষ করার পরেও আমার সাধ মিটছে না। আরও খেতে ইচ্ছে করছে। যাঃও, এর কোনও মানে হয়! এক সঙ্গে এত পেয়ারা খাওয়া কি ভাল? এখানে তো আসলে শাসন করবার কেউ নেই।

আজ পেয়ারা খেয়েই নেশা করব। যতগুলো ইচ্ছে।

আবার ফিরে এসে বললুম, দাও, আরও দুটো।

পেয়ারা বিক্রেতাটি মুখ তুলে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল আমার দিকে। তার সারা মুখে দাড়ি, সেই দাড়ির ফাঁকে ঝিলিক দিল এক ফালি সাদা হাসি।

তারপর নিজেই বেছে সবচেয়ে ডাগর দুটি পেয়ারা তুলে নিয়ে বলল, লিজিয়ে বাবু, এক রুপিয়া দিজিয়ে।

এর আগে সে এক জোড়া পেয়ারা নিচ্ছিল দু'টাকা। এখন সে ফিফ্‌টি পারসেন্ট কমিশন দিতে চাইছে কেন? তার জিনিস আমি উপভোগ করছি বলে? যেন এই পেয়ারাগুলো তার নিজের তৈরি করা। এর মধ্যেই তার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়ে গেছে।

পঞ্চম পেয়ারাটা যখন প্রায় শেষ করে এসেছি, তখন পেছন থেকে একটি নারী কণ্ঠ বলল, এ কী, আপনি এখনও এখানে রয়েছেন। মন্দির দেখতে যাননি।

প্রথমা ওরফে জাহানারা ওরফে জুন। একই মেয়ের বাংলা, আরবি, ইংরেজি নাম। তার তো এতক্ষণে ঝাড়গ্রামে প্রায় পৌঁছে যাওয়ার কথা। সে এখানে এল কী করে,

www.amarboi.com

ম্যাজিক নাকি?

পেয়ারা খাওয়ার উপকারিতা বিষয়ে যদি কোনও রচনা লিখতে হয়, তা হলে তার প্রথম লাইনই হবে, মোট পাঁচটা পেয়ারা খেলে অপ্রত্যাশিত ভাবে একটি যুবতী মেয়ের দেখা পাওয়া যায়।

জুন বলল, আপনি পেয়ারা খাচ্ছেন?

ষষ্ঠ পেয়ারাটি তার দিকে এগিয়ে দিলুম।

এটা ধুয়ে নিয়েছেন?

না, ধুইনি। একটা পেয়ারা না ধুয়ে খেলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায় না।

মহাভারত অশুদ্ধ না হতে পারে, পেট খারাপ তো হতে পারে।

তা হলে খাবেন না। আমি মোট পাঁচটা পেয়ারা না ধুয়ে খেয়েছি, তবু আমার পেট খারাপ হবে না। সে ব্যাপারে বাজি ধরবেন?

পাঁচ পাঁচটা পেয়ারা খেয়েছেন? যাঃ!

আমি এত ছোটখাটো ব্যাপারে মিথ্যে বলি না। আপনি ঝাড়গ্রামে গেলেন না কেন?

গাড়িটা দেখতে পাচ্ছেন না? ওই যে রাস্তার মাঝখানে থেমে আছে।

থেমে আছে, কেন, খারাপ হয়ে গেছে?

একেবারে যাচ্ছেতাই রকম খারাপ। কোনও শব্দই নেই। শোভনবাবু মিস্তিরি ডাকতে গেলেন। আমি আর ওখানে বসে গেলে কী করব!

বেশ হয়েছে!

এ কী, শোভনবাবুর গাড়ি, আপনি বলছেন বেশ হয়েছে!

বলবই তো। আবার বলছি, বেশ হয়েছে!

এ কী, আপনি এত রেগে আছেন কেন?

আপনারা আমাকে ঝাড়গ্রামে নিতে চাইলেন না কেন? স্বার্থপরের মতন নিজেরা দু'জনে চলে গেলেন।

আপনি তো যাবার কথা বলেননি। তা ছাড়া, এটা কি আমার গাড়ি নাকি?

আপনি তো বললে পারতেন, নীললোহিতও আমাদের সঙ্গে চলুন!

আমি কী করে বুঝব, আপনি যেতে চান।

বোঝার চেষ্টাও করেননি। ঠিক আছে, আমি চলি।

কোথায় যাচ্ছেন?

কোথায়ও না।

মানুষ যদি কোত্থাও না যায়, তা হলে সে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে।

এই বলে জুন ফুরফুর করে হাসতে লাগল।

আমি ঠিক করে ফেলেছিলুম। প্রীতমের দায়িত্বটা যখন চুকেই গেছে, তখন আর জুনকে নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। এবার এখান থেকে মানে মানে কেটে পড়াই ভাল।

তার কথার উত্তরে আমাকে বলতেই হল। মানুষ যদি কোনও গাছতলায় চুপটি

www.amarboi.com

করে বসে থাকে, তা হলেও সেটা কোথাও না যাওয়া হয়।

জুন কৌতুকের সুরটা বজায় রেখে বলল, না, স্যার, মোটেও তা নয়। তার মানে, এখান থেকে কোনও গাছের কাছে যাওয়া। আপনি এখন সত্যিই কোনও গাছতলায় বসে থাকতে চান? তা হলে আপনার হাতে একটা বাঁশি থাকা উচিত ছিল। তার চেয়ে চলুন বরং। আপনাকে মন্দিরটা দেখিয়ে আনি।

আপনার মায়ের খোঁজ করতে যাবেন না?

মা কি ছেলেমানুষ যে হারিয়ে যাবে? তা ছাড়া শোভনবাবুর বাবা তো সঙ্গে রয়েছেন। আমার সঙ্গে যেতে আপনার আপত্তি আছে?

চলুন তা হলে।

জুনের সঙ্গে কিছুক্ষণ বেড়াতে আসার আপত্তি হবে কেন? বরং, কিছুক্ষণ তার সঙ্গে নিরিবিলিতে কথা বললে জানা যেতে পারে, শোভনদার সঙ্গে তার সম্পর্কটা কতখানি মাখোমাখো হয়েছে।

প্রীতমের বড্ড শুচিবাই। হাত ধরাধরি হলেই বা কী আসে যায়! এমনকী, পিঠে চাপড় মারাও দোষের কিছু নয়। চুমু পর্যন্ত না এগোলেই হল।

শোভন রায়কে যে-টুকু দেখেছি। সে যেন ঠিক চুমু-খাওয়া টাইপ নয়। বড্ড বেশি প্র্যাক্টিকাল। এই ধরনের প্র্যাক্টিকাল লোকেরা বিয়ের আগে চুমু খায় না।

একটুখানি যাবার পর জুন বলল, নীললোহিত, আপনি একটু এখানে দাঁড়াবেন? বাড়ি থেকে বরং ক্যামেরাটা নিয়ে আসি। বেশিক্ষণ লাগবে না।

॥ ৬ ॥

গাড়ি খারাপ হলে এক একজন লোকের মাথা খারাপ হয়ে যায়।

এখানকার মিস্ত্রিরা এখনও মারুতি গাড়ি সম্পর্কে রপ্ত হয়নি। একের পর এক মিস্ত্রি এসে গাড়ির সঙ্গে কুস্তি করতে চাইল, তবু সে গাড়ি নট নড়ন চড়ন। গাড়িটা এখানকার মিস্ত্রিদের কথা বলারই যোগ্য মনে করল না। তাই কোনও শব্দই নেই।

শোভনদা দিশেহারার মতন বারবার মিস্ত্রি বদলাতে বদলাতে নিজের নাওয়া খাওয়া তো ভুলে গেলই, নিজের বাবার কথা, প্রেমিকার কথা (যদি হাত ধরাধরি হয়ে থাকে) মনেও পড়ল না।

সকাল গড়িয়ে দুপুর এসে গেল, তবু শোভনদার দেখা নেই।

ঝাড়গ্রাম থেকে মাছ এনে সবাইকে খাওয়াবেন বলেছিলেন, সেখানে তো যাওয়াই হল না, এদিকে মাংসও কেনা হল না, কিছুই না।

পরমা ও জীবনকৃষ্ণ নদীর ধার থেকে ফিরে এসে একটা চায়ের দোকানে বসে আড্ডা দিচ্ছিলেন, আমরাও মন্দির দেখে এসে জুটলাম সেখানে।

টালির চাল দেওয়া একটা নড়বড়ে ঘর, বাইরে দুটো বেঞ্চি পাতা, এই হচ্ছে চায়ের দোকান। একটা উনুনের ওপর কেটলিতে অনবরত চা ফুটছে। তবু ধোঁয়া-ধোঁয়া গন্ধ লাগা এই চায়ে একটা অন্যরকম স্বাদ থাকে। আর বেড়ালের লেজের মতন এস

www.amarboi.com

বিস্কুট শহরে আর পাওয়া যায় না, এইসব দোকানে থাকে।

জীবনকৃষ্ণ এই পরিণত বয়েসেও জীবন শক্তিতে ভরপুর। এবং এখনও বেশ কেষ্ট কেষ্ট ভাব আছে।

আমরা যখন পৌঁছলুম, তখন তিনি পরমাকে দ্বিতীয় গেলাস চা খাওয়াবার জন্য পীড়াপীড়ি করছেন। পরমা অত চা খান না, জীবনকৃষ্ণ প্রায় জোর করেই তার হাতে ধরিয়ে দিলেন একটা চা ভর্তি গেলাস।

আমাকে দেখে বললেন, এসো নীলু, এসো। আমার ছেলেটা গেল কোথায়? প্রথমা, ঝাড়গ্রামে কী মাছ পেলে?

জুন হেসে বলল, ঝাড়গ্রামে যাওয়াই হয়নি। গাড়ি খারাপ হয়ে গেছে!

জীবনকৃষ্ণ খানিকটা হতাশ ভাবে বললেন, যাঃ, আজ আর মাছ খাওয়াই হবে না।

একটা তারের জালের ঝোলার মধ্যে রয়েছে কয়েকটা ডিম। খানিকটা সান্ত্বনা পাবার জন্য তিনি চা-ওয়ালাকে অর্ডার দিলেন সব্বাইকে দোঠো করকে আন্ডা সেদ্ধ দেও।

পরমা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, না, না, আমি ডিম খাব না।

তাঁর মেয়েও বলল একই কথা।

জীবনকৃষ্ণ জিজ্ঞেস করলেন, কেন, তোমরা বুঝি ডিম খাও না?

পরমা বললেন, খাব না কেন, আজ দুপুরেই তো ডিমের ঝোল খেতে হবে। এখন আর খাব না।

জীবনকৃষ্ণ বললেন, দুপুরে খাওয়ার তো অনেক দেরি। এখন খেলে কী হয়েছে?

পরমা বললেন, আমি দিনে একটার বেশি ডিম খেতে পারি না।

জীবনকৃষ্ণ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, নীলু, তুমি খাবে তো?

আমি আপত্তি করতে যাব কেন? একদিকে ঘাড় হেলালুম।

জীবনকৃষ্ণ দোকানদারকে বললেন, দাও, দো দো চারঠো।

পরমা বললেন, নীলু, দুটো খেতে পারে। বলে আপনিও দুটো ডিম খাবেন?

কেন খাব না? একটা ডিম চোখের নিমেষে শেষ হয়ে যায়। দুটো না খেলে ঠিক জমে না।

তা হলে বয়েসটার কথা চিন্তা করতে হবে না?

বয়েস? তোমরা রুসি মোদির নাম শুনেছো তো? এক সময় দিনে চব্বিশটা করে ডিম খেতেন। সত্তর বছর বয়েসের পরেও আটটা-দশটা ডিম খান। দিব্যি আছেন! আমি দুটোর কম ডিম ছুঁই না।

আপনি বেশ ভোজনরসিক বোঝা যাচ্ছে! আপনার দুই ছেলেই গ্র্যান্ড হোটেলে কাজ করে। আপনি নিশ্চয়ই ভাল ভাল খাবার খান।

আরে না, না! সবাই ওরকম ভাবে। আমার বড় ছেলেটা তো আমাকে গ্র্যান্ড হোটেলে যেতেই বারণ করেছে। পাছে আমি বিনা পয়সায় খেতে চাই! আমি বলেছি, ঠিক আছে, যাব না। তোদের তো রোজ কত খাবার বেঁচে যায়, কিছু ভাল ভাল খাবার বাড়িতে আনলেই পারিস। অন্তত দু-এক বোতল স্কচ। সেসব কিচ্ছু করে না।

www.amarboi.com

একেবারে ওয়ার্থলেস।

তারপর গোপন কথা বলার ভঙ্গিতে মুখটা কাছে এনে জীবনকৃষ্ণ পরমাকে বললেন, আমার বড় ছেলেটা বেশ কৃপণ হয়েছে। ওর বয়েসে আমি দু'হাতে পয়সা উড়িয়েছি। আর ওর খালি পয়সা বাঁচাবার ধান্ধা!

জুন ক্যামেরা নিয়ে খুটখুট করছিল, মুখ তুলে বলল, কৃপণ?

আমার হাসি পেয়ে গেল। মেসোমশাই তাঁর ছেলের কেস কিচাইন করে দিচ্ছেন। প্রেমিক যদি কৃপণ হয়, তাকে কোনও মেয়ে পছন্দ করে না। কিংবা মেসোমশাই এটা ইচ্ছে করেই করলেন।

এই সুযোগে আমি বললুম, প্রীতম নামে আমার এক বন্ধু আছে, ফটোগ্রাফার, যেমন রোজগার করে তেমনই খরচও করে খুব।

মেসোমশাই আমার দিকে এমনভাবে তাকালেন, যেন হঠাৎ এখানে আমার এক বন্ধুর কথা বলা খুবই অবান্তর।

তারপর বললেন, ছেলেটা কতক্ষণ গাড়ির পেছনে লেগে থাকবে? নীলু গিয়ে একটু দেখে এসো না!

জানতুম, আমাকেই যেতে হবে। এই দুটি পরিবারের মাঝখানে আমি তো একটা ফালতু।

একবার চকিতে তাকালুম জুনের দিকে। যদি তার আগ্রহ থাকে গাড়িটা কিংবা তার মালিকের সম্পর্কে। তার সঙ্গে চোখাচোখিই হল না।

হঠাৎ রোদ বেশ চড়া হয়ে গেছে।

সকালবেলার সেই সিল্কের রোদের বদলে এখন অনেকটা ভাঙা কাচের মতন। আকাশের এক কোণে খানিকটা মেঘও রয়েছে।

শোভনদার গাড়িটা বেশি দূরে নয়।

দু'জন মিস্ত্রি গাড়িটার সামনে ও পেছনে খুব ব্যস্ত। স্বয়ং শোভনদা গাড়ির নীচে শুয়ে পড়েছে।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, কতক্ষণ লাগবে শোভনদা?

এই সময় মেজাজ খারাপ থাকা স্বাভাবিক। ধমকের সুরে বললেন, বোকার মতন কথা বলিস না। আমি কী করে জানব কতক্ষণ লাগবে। কোথায় যে গণ্ডগোল হয়েছে, বুঝতেই পারছি না।

এরকম একটা কথা শুনেই চলে যাওয়া যায় না।

আমি গাড়ির যন্ত্রপাতির কিছুই বুঝি না বটে, তবু মনে মনে ভাবতে ইচ্ছে করে, চুপি চুপি গাড়িটায় উঠে স্টিয়ারিং-এর সামনে বসব, অবহেলার সঙ্গে ইগনিশানের চাবিটা ঘুরিয়ে বলব, চল, বাচ্চা চল, সঙ্গে সঙ্গে সেটা ধক ধক করে উঠবে, মিস্ত্রিরা সমেত শোভনদা বিস্ময়ে হাঁ হয়ে যাবে!

তবে, এই ধরনের ইচ্ছে মনে মনে রেখে দেওয়াই ভাল।

একটু পরে শোভনদা গাড়ির তলা থেকে বেরিয়ে এসে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে

www.amarboi.com

বলল, নাঃ, এখানে কিছু করা যাবে না। গাড়িটা ঠেলে ঠেলে ঝাড়গ্রাম নিয়ে যেতে হবে। কিংবা গালুডিতে।

আমি বললুম, শোভনদা, তোমার এই গাড়িটা তো নতুন?

না, নতুন অবস্থায় কিনিনি। তবে একেবারে নতুন গাড়িও যখন তখন খারাপ হতে পারে। যন্ত্রের ব্যাপার।

তা হলে বুঝি সেকেন্ড হ্যান্ড?

হ্যাঁ, সেকেন্ড হ্যান্ডই বলা যায়। তারও আগে যে কিনেছিল সে সাড়ে চার মাসের মধ্যে বিক্রি করে দিয়েছে। একেবারে নতুনের মতন কন্ডিশান। কখনও অ্যাকসিডেন্ট করেনি।

তক্ষুনি আমি মনে মনে বললুম, প্রেম বিষয়ে যদি কোনও রচনা লিখতে হয়, তবে তার প্রথম লাইনটিই হওয়া উচিত, যদি কলকাতার বাইরে কোথাও বেড়াতে যাও, সেখানে যদি তোমার নায়িকা থাকে, তা হলে খর্বদার থার্ড হ্যান্ড গাড়ি নিয়ে যেয়ো না। তার চেয়ে সাইকেল রিকশ অনেক ভাল।

শোভনদা, মেসোমশাইরা একটা চায়ের দোকানে বসে আছেন।

বসে আছেন তো আমি কী করব? আমি এখন গাড়ি ফেলে রেখে যাব কী করে? পার্টস চুরি করে নেবে। বাবাকে বাড়ি চলে যেতে বল।

ঠিক আছে।

শোন, কী বলবি?

বলব, মেসোমশাই আপনাকে শোভনদা বাড়ি চলে যেতে বলেছেন!

বোকার মতন কথা বলিস না। এটা কি হুকুম নাকি? আমি বাবার সঙ্গে এভাবে কথা বলতে পারি? বাবার যখন ইচ্ছে হবে, তখন বাড়ি ফিরে যেতে পারেন। আমার ফিরতে দেরি হবে।

দেরি, মানে, বিকেল হয়ে যেতে পারে?

সেটা ঝাড়গ্রামে গিয়ে বুঝব। যদি তাড়াতাড়ি হয়,... কিংবা সন্ধেও হয়ে যেতে পারে।

এরপর শোভনদা মিস্ত্রি দু'জনের সঙ্গে গাড়ি ঠেলতে শুরু করলেন, আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলুম একটুক্ষণ।

শোভনদা যে আমাকেও গাড়ি ঠেলতে বলেননি, সেটাই আমার সাত পুরুষের ভাগ্য। হয়তো আমাকে গাড়ি ঠেলারও অযোগ্য মনে করেছেন।

মনে হল, গাড়িটার একটা হেস্তনেস্ত না করে শোভনদা ফিরবেন না। তাতে রাত কাবার হলেও আশ্চর্যের কিছু নেই।

মেসোমশাইয়ের কাছে বার্তাটি জানাবার পর তিনি মুখ বিকৃতি করে বললেন, ওটা গাড়ি না ঠেলা গাড়ি! আমি পারতপক্ষে ও গাড়ি চাপি না, একদিন চৌরঙ্গিতে স্টার্ট বন্ধ হয়ে গেল, আমাকেও ঠেলতে হয়েছিল।

তারপর হেসে উঠে বললেন, ও গাড়ি না ঠেলতে ঠেলতেই কলকাতা পর্যন্ত নিয়ে যেতে হয়!

www.amarboi.com

পরমা বললেন, আপনাদের তো দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার কোনও ব্যবস্থাই হল না। বাজারই হল না।

মেসোমশাই বললেন, সেদিকে তো ছেলের খেয়ালই নেই। ও বিয়ে করলে বউয়ের বদলে গাড়ি নিয়েই বেশিক্ষণ মেতে থাকবে। যাই হোক, বাড়ি ফিরে দেখি, একটা কিছু ব্যবস্থা হয়ে যাবেই। তরকারি টরকারি অনেক আছে। আমি আবার নিরামিষ একেবারেই খেতে পারি না।

আমি বললুম, মুরগি এখনও পাওয়া যেতে পারে।

আমার কথা গ্রাহ্য না করে মেসোমশাই পরমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কী খাবে? তোমাদের জন্যও তো ও মাছ এনে দেবে বলেছিল।

জুন বলল, আমরা ডিমের ঝোল খেয়ে নেব?

তার দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে মেসোমশাই বললেন, বাঃ, তুমি তো বেশ মেয়ে! তোমরা ডিমের ঝোল খাবে, আর আমরা নিরামিষ! তুমি তো বলতে পারতে, আপনারাও আমাদের সঙ্গে খেয়ে নেবেন আসুন!

পরমা বললেন, আমি সে কথা ভেবেছিলাম। কিন্তু ডিম, আপনি তো একটু আগেই দুটো ডিম খেলেন। আবার দুপুরে ডিম খাবেন?

মেসোমশাই বললেন, তাতে কী হয়েছে? আমার কোলেস্টেরল ফোলেস্টেরল কিছু নেই। তা ছাড়া মাঝখানে কয়েক ঘণ্টা গ্যাপ থাকছে!

পরমা আমার দিকে তাকাতেই তাঁকে কিছু বলতে না দিয়ে মেসোমশাই বললেন, কীরে নীলু, তুই আর দুটো ডিম খেতে পারবি না? ঠিক আছে, তুই দুটোর বদলে একটা খাবি।

আমি বাধ্য ছেলের মতন সম্মতি জানালুম।

পরমা বললেন, ঠিক আছে চলুন তা হলে। খিচুড়ি রান্না করা যাবে। খিচুড়ি আর ডিম ভাজা!

মেসোমশাই দারুণ উল্লসিত ভাবে বলে উঠলেন, খিচুড়ি? আমার সবচেয়ে ফেভারিট। আমি রাঁধব খিচুড়ি। আমি দারুণ খিচুড়ি রাঁধতে পারি। তোমাদের আমার রান্না খাওয়াব।

জীবনকৃষ্ণ ক্রমশই এ কাহিনীর প্রধান চরিত্র হয়ে উঠছেন। শুধু প্রধান চরিত্র নয়, জবরদস্ত নায়ক। নিজের ছেলেকে ঠেলে দিচ্ছেন পেছনে।

তাতে আমার খুশি হবারই কথা। তবু শোভনদার প্রতি আমার খানিকটা মায়াই হচ্ছে। সে বেচারি জুনের জন্য একটুও সময় দিতেই পারছে না।

জুনরা যে-বাড়িতে উঠেছে, সেটিও একটি ছোটখাটো প্রাসাদ। অনেক ঘর খালি পড়ে আছে। জুনরা যে-অংশটাতে আছে, তার রান্না ঘরটাই অনেক শোবার ঘরের চেয়েও বড়।

খানিক বাদে খিচুড়ি রাঁধার উদ্যোগের শুরুতেই জীবনকৃষ্ণ ফস করে একটা সিগারেট ধরিয়ে ফেললেন।

পরমা বললেন, এ কী, এই তো একটু আগে একটা খেলেন!

www.amarboi.com

জীবনকৃষ্ণ বললেন, ভাল রান্না হচ্ছে একটা আর্ট। আর আর্ট ফাট করতে গেলে বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁওয়া দিতে হয়।

ওসব বাজে কথা বলবেন না। মেয়েরা বুঝি ভাল রান্না করতে পারে না? তাদের সিগারেট খেতে হয়?

বড় বড় হোটেলে যাও, একটা মেয়ে কুক পাবে? পৃথিবী বিখ্যাত কুকেরা সবাই পুরুষ।

সব পুরুষরাই এই কথা বলে। মেয়েরা হোটেলে রান্না করতে যাবে কোন দুঃখে! পুরুষেরা হোটেলের কুক হয়, অনেক টাকা পাবে বলে। আর সারা পৃথিবীতে মেয়েরা সব সংসারে বিনে মাইনের রাঁধুনির কাজ করে। আপনার মা কেমন রান্না করতেন?

আমার মা? তাঁর রান্নার তুলনাই হয় না। মা কতদিন নেই, তবু তাঁর হাতের রান্নার স্বাদ এখনও যেন জিভে লেগে আছে।

এও দেখেছি। পুরুষ মানুষরা নিজের মায়ের রান্না কথায় একেবারে বিগলিত হয়ে যায়। অথচ সবার সামনে প্রশংসা করবে হোটেলের কুকদের!

তুমি খুব প্যাঁচে ফেলে দিয়েছ। আচ্ছা, মেয়েরা কী বলে? প্রথমা, তুমি তোমার মায়ের রান্না সম্পর্কে কী বলবে?

জুন বলল, আমার মা? একেবারে রান্নাই জানে না। কোনও রকমে নুনটা ঠিক হয়।

জীবনকৃষ্ণ অট্টহাস্য করে উঠলেন।

শুধু সিগারেট নয়, খানিকবাদে জীবনকৃষ্ণ আবার বললেন, খিচুড়ি খাওয়া হবে, আর বিয়ার থাকবে না? কোনও মানে হয়? নীলু, আমাদের ওখান থেকে দু' বোতল নিয়ে আয় তো চট করে।

রাজবাড়িটা কাছেই। দৌড়ে চলে গেলুম, আর দুটোর বদলে নিয়ে এলুম তিন বোতল বিয়ার। দুটো ফুরিয়ে গেলে মেসোমশাই যদি আবার একটা আনতে বলেন। আর যদি আমি একটু প্রসাদ পাই।

বিয়ারের গেলাসে প্রথম চুমুক দিয়েই আবার সিগারেট ধরালেন জীবনকৃষ্ণ।

পরমা সঙ্গে সঙ্গে বসে উঠলেন, আবার? আপনি কী শুরু করেছেন?

জীবনকৃষ্ণ বললেন, পরমা, তুমি বিয়ারে এক চুমুক দিয়ে দেখো, তোমারও সিগারেট টানতে ইচ্ছে করবে। বিয়ারে গলা ভেজাবার পর সিগারেটে যা আরাম হয়!

পরমা এবারে রেগে উঠে বললেন, বাজে কথা ছাড়ুন তো! আমি কক্ষনও ওসব খাই না। সিগারেটটা ফেলে দিন!

জীবনকৃষ্ণ যেন এক অবাধ্য বালক। নানারকম দুষ্টুমি করে বকুনি খেতে ভালবাসেন।

সিগারেট তিনি ফেললেন না।

জুন এক সময় উঠে গিয়েছিল। রান্নার আয়োজনের সময় তাকে দেখা গেল না। তার সাড়া শব্দও নেই।

একটু পরে জীবনকৃষ্ণ আমাকে বললেন, নীলু, দ্যাখো তো মেয়েটা কোথায় গেল?

পাশের পর পর দুটি ঘরে উঁকি মারলুম। ফাঁকা। ঘরগুলির পাশ দিয়ে টানা

বারান্দা, মাঝখানে ঘরের বদলে একটা ছোট মতন ছাদ। সেই ছাদের পাঁচিলে বুক চেপে দাঁড়িয়ে আছে জুন।

আমি সরাসরি তার কাছে না গিয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলুম, আপনি ব্যস্ত আছেন?

একটি মেয়ে একা দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ, হাতে কোন বইও নেই, তাকে এই প্রশ্ন করা হাস্যকর মনে হতে পারে। কিন্তু মানুষ কি এক এক সময় নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকতে পারে না? একাকিত্ব ভোগ করাও কি একটা কাজ নয়?

উত্তর না দিয়ে জুন আমাকে কাছে ডাকল।

আঙুল নির্দেশ করে বলল, দেখুন, দেখুন।

সেখানে দ্রষ্টব্য তেমন বিশেষ কিছু নেই।

বাড়ির সদর থেকে গেট পর্যন্ত যে মোরাম বিছানো রাস্তা, তার এক পাশে অনেকখানি বালি স্তূপাকৃত হয়ে আছে। সেখানে খেলা করছে দুটি ছেলেমেয়ে, দু'জনেরই বয়েস সাত-আটের মধ্যে, তাদের পোশাক দেখে মনে হয় মালি কিংবা দারোয়ানদের সন্তান।

ছেলে-মেয়ে দুটি বালি দিয়ে মন্দিরের মতন কিছু একটা বানাচ্ছে। তারা এমন মগ্ন হয়ে আছে সে খেলায়, যেন ভুলে গেছে আর সব কিছু। বাচ্চাদের এরকম মগ্নতা দেখতে ভাল লাগে।

জুন জিজ্ঞেস করল, ওই মেয়েটার মুখখানা কি আমার মতন?

আপনার মতন? কই, তা তো মনে হচ্ছে না।

আপনি মিল দেখতে পাচ্ছেন না? আমার তো মনে হচ্ছে, হুবহু আমারই মতন মুখ। ঠিক যেন ছোট্ট হয়ে গিয়ে ওখানে খেলছি।

তাই মনে হচ্ছে?

হ্যাঁ, আমি যেন এই বয়েস থেকে দাঁড়িয়ে দেখতে পাচ্ছি আমার ছেলেবেলাটাকে।

ছেলেবেলা নয়, মেয়েবেলা। আপনি বাচ্চা বয়েসে ওরকম বালি দিয়ে মন্দির, দুর্গ টুর্গ বানাতেন?

তা কিন্তু না। সে কথা মনে পড়ে না। কলকাতায় বালি নিয়ে আর কোথায় খেলব?

ওই ছেলেটার মুখ আমার মতন নয় নিশ্চয়ই। তবে, ওদের খেলা দেখে আমার একজনের কথা মনে পড়ে গেল। সাত-আট বছর বয়েসে আমি বাবা-মায়ের সঙ্গে পুরীতে বেশ কিছুদিন ছিলাম। বাবা অসুস্থ ছিলেন, আমরা সারা দুপুর কাটাতাম বিচে। বাবা শুয়ে থাকতেন মাদুর পেতে, মা কাঁটা দিয়ে উল বুনতেন, আমি খানিকটা দূরে খেলতাম। দু-একদিন পরেই পাশের হোটেলের একটি ওই বয়েসি মেয়ের সঙ্গে আমার ভাব হয়ে গেল। দু'জনে মিলে বালি দিয়ে কত কী যে বানিয়েছি। একদিন বেশ সুন্দর একটা মন্দির বানিয়েছিলাম, সেদিন খুব ঢেউ ছিল। হঠাৎ একটা বড় ঢেউ এসে আমাদের তো ভিজিয়ে দিলই, মন্দিরটাকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিল। তখন মেয়েটার কী কান্না। বলতে গেলে সে-ই আমার জীবনের প্রথম প্রেমিকা। তার নাম আমার আজও মনে আছে।

www.amarboi.com

পরে আর তার সঙ্গে দেখা হয়নি?

কী করে, দেখা হবে? ওরা থাকত জামশেদপুরে। কিন্তু মজার ব্যাপার, মেয়েটি আমাকে একটা চিঠি লিখেছিল। বেশ গোটা গোটা হাতের লেখা। তলায় লিখেছিল, ইতি সেই পুরীর দীপশিখা।

আট বছরের মেয়ে লিখেছে? আপনি উত্তর দিয়েছিলেন?

না, মানে একটা কাণ্ড হল। চিঠিটা আমাদের বাড়ির সবাই পড়ল আর খুব মজা করল। তারপর আমার বউদি সেটা কোথায় যে রাখলেন, আর খুঁজেই পেলেন না। ঠিকানা জানি না বলে কী করে উত্তর লিখব?

খুব বাজে কাজ করেছেন উত্তর না দিয়ে।

সেই চিঠি হঠাৎ আবার খুঁজে পেয়েছিলাম এগারো বছর বাদে। এক খণ্ড মহাভারতের ভাঁজে ছিল। কিন্তু তখন কি আর উত্তর দেবার কোনও মানে হয়? অতদিনে সে হয়তো আর জামশেদপুরে নেই। থাকলেও আমাকে মনে করতেও পারত কি না সন্দেহ। এত বছর বাদে তার সেই চিঠিটা দেখেই আমার নতুন করে মনে পড়েছিল তার কথা।

ধরুন, সেই দীপশিখার সঙ্গে হঠাৎ কোথাও দেখা হয়ে গেল আপনার। এখন তাকে চিনতে পারবেন?

বলাই বাহুল্য, আমার এই কাহিনীটি তাৎক্ষণিক ভাবে বানানো।

আমি বাবা-মায়ের সঙ্গে কস্মিন কালেও পুরী যাইনি। পুরীতে গেছি দু-তিনবার, বন্ধুদের সঙ্গে কিংবা একা। এ রকম বাল্য প্রেমের কাহিনী বানানো অতি সহজ। একে ঠিক মিথ্যে কথা বলা যায় না, বাস্তবের প্রলেপ দেওয়া গল্প।

গল্পের টানে অন্য গল্প আসে। কথাবার্তা অনেক সহজ হয়ে যায়।

জুন একটু পরে বলল, আমি কখনও বালি নিয়ে এরকম খেলেনি বটে, তবে এগারো-বারো বয়েসে আমারও একটি ছেলের সঙ্গে খুব ভাব হয়েছিল। তখন আমরা পার্ক সার্কাসে থাকতাম। আমাদের পাশের বাড়িতে এক মহিলা শাড়ির ওপর চমৎকার কাঁথা স্টিচ করতেন, কিছুদিন আমি তা শিখতে যেতাম। ভদ্রমহিলা আমাকে খুব ভালবাসতেন। আদর করে আমার নাম দিয়েছিলেন জাহানারা।

আমি বলে ফেললুম, ও।

জুন একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, ও মানে?

ও মানে ও। আপনার তো তিনটে নাম, প্রথমা, জাহানারা আর জুন। এখন দ্বিতীয় নামটার কারণ জানা গেল।

আপনাকে কে বলল যে আমার তিনটে নাম?

কোথায় যেন শুনেছিলাম।

কী করে শুনলেন? আমি এমন কিছু ইমপর্টান্ট নই যে আমাকে নিয়ে লোকে আলোচনা করবে।

মেয়েদের নিয়ে ছেলেরা এমনিই আলোচনা করে। মেয়ে-ফটোগ্রাফার হলে তাকে নিয়ে বেশি আলোচনা করে। আর সেই মেয়ে-ফটোগ্রাফার যদি স্মার্ট ও বুদ্ধিমতী হয়,

www.amarboi.com

তা হলে আরও বেশি। আমার অনেক ফটোগ্রাফার বন্ধু আছে তো। তারা আপনাকে চেনে। যাক গে, এটা এমন কিছু ব্যাপার নয়, তারপর কী হল বলুন।

সেই ভদ্রমহিলার ছোট ছেলেটির নাম সেলিম। আমারই বয়েসি, বড় জোর এক বছরের বড়। এই সেলিমের কাছেই বলতে পারেন আমার ফটোগ্রাফির দীক্ষা। ওর নিজের একটা হট শট ক্যামেরা ছিল, আর ছিল অনেক ছবির বই। হট শট ক্যামেরায় সবাই ছবি তুলতে পারে, এখনকার অনেক ক্যামেরাতেই ছবি তোলা সহজ হয়ে গেছে। কিন্তু বেশিরভাগ ছবি তুলিয়েরাই সামনে লোকজন দাঁড় করিয়ে ছবি তোলে। কিন্তু ওইটুকু বয়েসেই সেলিম মুভিং অবজেক্টের ছবি তোলার চেষ্টা করত। যেমন ধরুন, চলন্ত গাড়ি, কিংবা একটা পাখি উড়ে যাচ্ছে, কোনও লোক দৌড়ে গিয়ে লাফিয়ে ট্রামে উঠছে। আমাকে ওর ক্যামেরাটা ব্যবহার করতে দিত, তাই খুব বন্ধুত্ব হয়ে গেল।

এখনও সেই বন্ধুত্ব আছে?

সেলিমের মা মারা যাবার পর ও চলে গেল আমেরিকায়, ওর মামার কাছে। সেলিমের মা বাঙালি, ওর বাবা ছিলেন পাকিস্তানি। তিনি অনেকদিন আগেই বউকে ডিভোর্স করে চলে গিয়েছিলেন পাকিস্তানে।

চিঠি পত্রেও যোগাযোগ নেই?

ওদেশে গিয়ে, কলেজে পড়তে পড়তেই ও একটি মেয়েকে বিয়ে করে ফেলে। তারপর আর আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে যাবে কেন?

মনে হচ্ছে, সেলিম সম্পর্কে এখনও আপনার কিছুটা দুর্বলতা আছে, জাহানারা দেবী?

আছেই তো। তবে তা ওই এগারো-বারো বছরের সেলিম নামের ছেলেটির সম্পর্কে। বড়-হওয়া সেলিম সম্পর্কে আমার কোনও আগ্রহ নেই। আমার চেনাশুনো ফটোগ্রাফারদের মধ্যে এখনও কেউ কেউ আমাকে জাহানারা নামে ডাকে, এইটুকুই যা যোগসূত্র রয়ে গেছে।

বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন না, বাল্য প্রণয়ে দুঃখ আছে? কোনও বাল্য প্রেমের কাহিনীই মিলনান্তক হয় না।

জুন কটাক্ষ করে বলল, প্রেম? আমি অতসব প্রেম-ট্রেম বুঝি না। সেই বয়েসে তো কিছুই বুঝিনি, এখনও বুঝি না।

খিচুড়ির সুগন্ধ ছাদ পর্যন্ত ভেসে এসেছে। জীবনকৃষ্ণের ডাকাডাকিতে আমাদের এবার খাবার ঘরে যেতেই হল।

জীবনকৃষ্ণ মিথ্যে গর্ব প্রকাশ করেননি, সত্যিই তিনি ভাল রাঁধেন। অপূর্ব স্বাদ হয়েছে খিচুড়ির। খুব বেশি ঘন নয়, পাতলাও নয়। সঙ্গে ডিম ভাজা, বেগুন ভাজা। খেতে খেতে কতখানি যে খেয়ে ফেলা হল, তার খেয়ালই নেই।

বিয়ারের এপিটাইজারের পর জীবনকৃষ্ণই নিজের রান্নার নিজেই প্রশংসা করতে করতে খেলেন সবচেয়ে বেশি।

খাওয়ার পরই হাই তুলে বললেন, আমি এখন একটু ঘুমিয়ে নেব।

www.amarboi.com

শোভনদার কোনও পাত্তা নেই। এর মধ্যে দু-একবার গাড়ির আওয়াজ হতেই আমরা উৎসুক হয়ে জানলা দিয়ে দেখতে গিয়ে নিরাশ হয়েছি। খানিকটা খিচুড়ি রেখে দেওয়া হল শোভনদার জন্য।

অচিরেই শোনা গেল জীবনকৃষ্ণের নাসিকা গর্জন।

পরমাও একটু গড়িয়ে নিতে চলে গেলেন পাশের ঘরে।

জুন আমাকে জিজ্ঞেস করল, আপনার দুপুরে ঘুমোনোর অভ্যেস আছে?

আমি প্রবল বেগে মাথা নাড়লুম দু'দিকে।

তা হলে চলুন আমরা বেরিয়ে পড়ি, একটু ঘুরে আসি।

কোথায়?

দেখাই যাক না।

॥ ৭ ॥

শীতকালের আকাশে মেঘ ঠিক মানায় না।

তবু সব শীতের আকাশ তো মেঘমুক্ত থাকে না। ভোর রাতে বৃষ্টি হয়েছিল, আবার বেশ জমিয়ে মেঘ করেছে, বৃষ্টি এল বলে।

জুন তা গ্রাহ্য করল না। বাড়ি থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সে জিজ্ঞেস করল, এখন আপনার সেই দিকশূন্যপুরে যাওয়া যায় না?

সে যে অনেক দূর।

হোক না দূর, জায়গাটা আমার খুব দেখতে ইচ্ছে করছে।

একদিনে যাওয়া যাবে না।

আমি তো বলেইছি, না ফিরলেও ক্ষতি নেই।

একটু অবাক হয়ে জুনের দিকে তাকালুম। এ যেন অন্যরকম সুর। একটি মেয়ে আসার সঙ্গে অনেক দূরে যেতে চাইছে, সেখানে রাত কাটাতেও তার আপত্তি নেই?

হঠাৎ বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল।

কাছাকাছি কোনও আশ্রয় নেই, বড় গাছও নেই।

আমি বললুম, চলুন তা হলে বাড়ি ফিরে যাওয়া যাক।

কিন্তু ঠিক এই সময়ে পাশ দিয়ে একটি খালি সাইকেল রিকশা যেতে দেখে জুন সেটা থামাল। আমাকে বলল, উঠে পড়ুন।

রিকশাওয়ালা বৃষ্টি আটকাবার জন্য ঝাঁপ ফেলে, সামনে পর্দা আটকে দিল। একটা পলিথিনের ওয়াটার প্রুফ সেও লাগিয়ে নিল নিজের পিঠে।

জুন তাকে বলল, চলিয়ে ডুলুং নদী কা পাস।

আমি আগেই বলেছিলুম প্রেম করতে গেলে গাড়ির চেয়ে সাইকেল রিকশা অনেক ভাল। আর বৃষ্টি নামলে তো সোনায় সোহাগা।

সাইকেল রিকশায় গায়ে গায়ে ছোওয়াছুঁয়ি করে বসতে হবেই। পিঠে হাত রাখাও যুক্তিসম্মত। খারাপ রাস্তা হলে আরও ভাল। রিকশাটা মাঝে মাঝে লাফিয়ে ওঠে,

www.amarboi.com

গালে গাল ঠেকে যায়, এমনকী বুকে একটু হাত লেগে গেলেও তা অসভ্যতা বলে গণ্য হবে না।

কিন্তু আমি কি প্রেম করছি?

জুনের মতন একটি যুবতীর সঙ্গে পর্দা ফেলা সাইকেল রিকশায় বৃষ্টির দুপুরে ভ্রমণ করতে করতে আমার রোমাঞ্চিত হবারই কথা। আর রোমাঞ্চ থেকে প্রেমের পরিণতিতে পৌঁছতে আর কতক্ষণ!

কিন্তু আমি যে প্রীতমের বন্ধু।

প্রীতমের পয়সায়, তার দূত হয়ে এসে তারই মনোনীতা তরুণীকে আমি যদি নিজের প্রেমিকা করে ফেলি, তার চেয়ে চরম বিশ্বাসঘাতকতা আর কী হতে পারে?

এতে শুধু ক্ষোভ বা অভিমান নয়, প্রীতম হয়তো আমাকে খুনই করে ফেলবে। তাতে তাকে দোষও দেওয়া যাবে না। আমি যদি প্রীতম হতাম। তা হলে এই বিশ্বাসঘাতকতার জন্য নীললোহিতকে খুন করতে না পারলেও চিরতরে তার ঠ্যাং খোঁড়া করে দিতুম নিশ্চিত।

সেই কথা ভেবেই, জুনের কাঁধে হাত দেওয়া তো দূরের কথা, আমি সিঁটিয়ে বসে রইলুম। ওর ঊরুর সঙ্গে আমার ঊরুর এক চুল অন্তত ফাঁক রিল।

তার সঙ্গে কী কথা বলব, তাও খুঁজে পাচ্ছি না। বাক্যবাগীশ নীললোহিত একেবারে চোরের মতন চুপ।

সব দোষ এই বৃষ্টির, না হলে তো সাইকেল রিকশায় চাপতে হত না।

জুন বলল, কী হল, কথা বলছেন না যে!

হুঁ।

ভাল লাগছে না আপনার? আমার তো ইচ্ছে করছে অনেক দূরে যাই।

ইয়ে, মানে, পর্দাটা খুলে দিলে হত না?

বৃষ্টির ছাঁট লাগবে যে!

লাগুক না। আমার এখন সাফোকেশানের মতন লাগছে।

ঠিক আছে। ভাইয়া, পর্দা উতার দে না।

এবার সাইকেল রিকশাচালকের অবাক হবার পালা। সে ধরেই নিয়েছে, আমরা প্রেমিক-প্রেমিকা এবং চার-পাঁচ গুণ ভাড়া হাঁকবে। এরকম পর্দার আড়ালের সুযোগ কেউ ছাড়ে?

যেমন বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি এসেছিল, তা হঠাৎই আবার গুঁড়ি গুঁড়ি হয়ে এল।

আমি জুনকে বললুম, আপনি রিকশাতেই যান, আমি হেঁটে যাচ্ছি। বৃষ্টি তো প্রায় কমে এসেছে।

কেন, আপনি হাঁটবেন কেন?

দু'জনে বড্ড ঠেসাঠেসি হচ্ছে।

আমার তো কোনও অসুবিধে হচ্ছে না।

নাঃ, আমি নেমেই পড়ি।

একা একা রিকশায় যাবে, জুন এত বোকা নয়। সেও নেমে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে। এবং

www.amarboi.com

সে ব্যাগ খোলার আগেই আমি রিকশাওয়ালার হাতে গুঁজে দিলুম কুড়ি টাকা। তাকে দরাদরির কোনও সুযোগই দেওয়া হল না।

এর পরেও আমার মুখে কোনও কথা নেই। আমি কল্পনায় দেখতে পাচ্ছি প্রীতমের রক্তচক্ষু।

জুন বেশ অবাক হয়েছে, নিঃশব্দে আমরা হাঁটলুম কিছুক্ষণ।

শীতকালের খামখেয়ালি বৃষ্টি, হঠাৎ সব দিক একেবারে ফর্সা হয়ে গেছে। গাছের পাতাগুলি ঝিলমিল করছে খুশিতে। নদীর ধারটা নির্জন।

একটা উঁচু মতন পাথর দেখে জুন বলল, এখানে বসলে হয় না?

বাধ্য ছেলের মতন বসে পড়লুম। কিন্তু শরীরটা যেন ক্রমশ অসাড় হয়ে আসছে। সেই ভাবটা কাটাবার জন্য আমি একটা সিগারেট ধরালুম।

জুন হাত বাড়িয়ে বলল, দিন তো একটা টান দিই।

আমার এঁটো সিগারেট ঠোঁটে দিতে চাইছে, এ তো লক্ষণ ভাল নয়। কিংবা এরকম ভাবেই তো এগোয়।

জুন যখন সিগারেটটা ফেরত দিল, আমি কিন্তু আর সেটা মুখে না দিয়ে ফেলেই দিলুম। প্রীতমের সঙ্গে তো নিমকহারামি করতে পারি না।

জুন বলল, আপনি ওই দিকশূন্যপুরের কথা আর একটু বলুন না!

আমি নিস্পৃহভাবে জানালুম, সে রকম কিছু বলার নেই। অনেকের হয়তো ভালই লাগবে না।

জুন খপ করে আমার একটা হাত ধরে বলল, আপনার কী হল বলুন তো? হঠাৎ মুড অফ হয়ে গেল?

এ কী, জুন নিজে থেকে আমার হাত ধরেছে?

শীতের স্বল্পস্থায়ী বিকেলে আকাশ এখন কালোয়-আলোয় মেশানো, পশ্চিমে লাল আভা। নিরালা নদীতীর, পাশাপাশি দু'জনে বসা, নারীটি পুরুষটির হাত ধরেছে, তার মুখে ব্যাকুলতা, এ যে ক্লাসিক প্রেমের দৃশ্য!

যে কেউ দেখলে একটাই কথা ভাববে।

এই সময় কোনও ঝোপের আড়াল থেকে প্রীতম যদি বেরিয়ে আসত, তা হলে সে নিশ্চিত আমাকে গুলি করত!

খানিক আগে জুন বলছিল, সে প্রেম-ফ্রেম গ্রাহ্য করে না, হঠাৎ এ কী মতিভ্রম হল তার। আমার সঙ্গে তার মাত্র একদিনের পরিচয়!

ও হরি, এবার বুঝেছি।

সারা পৃথিবীতেই একটা নিয়ম আছে। ছেলেরা আগে এগুবে, মেয়েরা লজ্জা লজ্জা ভাব দেখাবে, কিংবা ভুরু কুঁচকোবে, কিংবা সরে গিয়ে বলবে, কী হচ্ছে কী? প্রথম প্রত্যাখ্যানের অধিকার শুধু মেয়েদের।

কিন্তু কোনও পুরুষ যদি একেবারেই আগ্রহ না দেখায়, যদি চোখে মুখে গদ গদ ভাব না ফোটায়, কাছাকাছি যাবার চেষ্টা না করে, তা হলে মেয়েদের ওই প্রত্যাখানের অধিকারে আঘাত লাগে। তাদের গোপন অহমিকা আহত হয়।

www.amarboi.com

আমি একবারও জুনের স্তুতি করিনি। তার ব্যক্তিত্ব বা চেহারার প্রশংসা করিনি। তার সঙ্গে কোনও মন-রাখা কথা বলিনি। তাতে তো সে অবাক হবেই। যে সব মেয়েরা প্রেম করতে চায় না, তারাও চায় অন্যরা তার সঙ্গে প্রেম করার চেষ্টা করুক, সে তাদের প্রতিহত করার আনন্দ পাবে। উপেক্ষা বা অবহেলা কেউ সহ্য করে না।

জুনের হাতের মধ্যে আমার হাত ঘেমে উঠছে। নিজেই বুঝতে পারছি, আমার মুখখানা এখন সন্ধেবেলায় আকাশের মতন।

আমি যে এতটা ক্যাবলাকান্ত নই, তা কী করে জুনকে বোঝাব? আমার গলা শুকিয়ে গেছে, কথা ফুটছে না, একটি যুবতী মেয়ের পাশে বসে থাকতেও ভয় পাচ্ছি। তার কারণ, আমার যে বারবার মনে পড়ছে প্রীতমের মুখ।

এই অবস্থায় জুনের কাছে প্রীতমের প্রস্তাবটা জানানো হবে আরও বেশি মূর্খতা!

হঠাৎ একটা গাড়ির আওয়াজ আর তার সঙ্গে প্রচুর কণ্ঠের গোলমাল শোনা গেল।

দু'জনেই মুখ ফিরিয়ে দেখি, একটা বাস এসে থামল কাছাকাছি। আর প্রথমে যা গোলমাল মনে হয়েছিল, তা আসলে কোরাস গান। এক দঙ্গল মেয়ে গাইছে।

তারপর হুড়মুড়িয়ে মেয়েরা নামতে লাগল, তাদের মধ্যে প্রথমেই, আর কে, মুমু!

আমি সঙ্গে সঙ্গে সরে গেলাম জুনের পাশ থেকে।

মুমুই আগে দেখতে গেল আমাকে।

ছুটে এসে হঠাৎ কিছু আবিষ্কার করার আনন্দে উদ্ভাসিত মুখে বলল, নীলকাকা, তুমি এখানে? তুমি এখানে? তুমি দিকশূন্যপুরে যাবে বলেছিলে! এটাই বুঝি দিকশূন্যপুর?

না, না, এটা দিকশূন্যপুর নয়। এমনি এখানে দু-একদিনের জন্য এসেছি।

তবে কেন আমাদের সঙ্গে ঘাটশিলায় গেলে না?

তোমরা যে ধাঁধার উত্তর দিতে পারোনি।

আরও তিন চারটে মেয়ে চলে এসেছে এদিকে। তাদের মধ্যে দেয়া। সে চেঁচিয়ে বলে উঠল, এখন জানি! এখন জানি! প্রথমটা শেক্সপিয়ারের হ্যামলেট, আর দ্বিতীয়টা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা।

আমি হেসে বললুম, ও ভাবে ধাঁধার উত্তর হয় নাকি? সঙ্গে সঙ্গে বলতে হয়। আর এই উত্তর নিশ্চয়ই তোমাদের কোনও টিচার বলে দিয়েছেন।

মুমু বলল, আমাদের একজন টিচার তোমাকে চেনে।

দেয়া বলল, আমাদের সঙ্গে এসেছেন এই বাসে।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, তোমরা এখানে হঠাৎ থামলে কেন?

মুমু বলল, কী যেন একটা মন্দির দেখাবে, ড্রাইভার সেটা খুঁজে পাচ্ছে না। তুমি এখানে কোনও মন্দির দেখেছ?

হ্যাঁ, দেখেছি।

www.amarboi.com

তা হলে তুমি চলো, আমাদের রাস্তা দেখিয়ে দেবে।

দেয়া বলল, আমাদের টিচারের সঙ্গে দেখা করবেন না? চলুন, চলুন!

আমাকে আপত্তি জানাবার কোনও সুযোগই দিল না, ওরা দু'জনে আমার হাত ধরে টানতে লাগল।

আমার পাশে যে অন্য একটি মেয়ে বসে আছে, তা ওরা গ্রাহ্যই করল না।

ওদের টানাটানি থেকে মুক্তি পাবার কোনও উপায় নেই বুঝতে পেরে আমি মুখ ফিরিয়ে জুনকে কিছু বলতে গেলুম।

সে এর মধ্যে নেমে গেছে নদীর জলের কাছে।

আমি চেঁচিয়ে বললুম, জুন, আমি একটু পরে আসছি।

সে শুনতে পেল কি না কে জানে। মুখ ফেরাল না।

মুমু আর দেয়া প্রায় ছুটিয়ে নিয়ে চলল আমাদের। আমার এ রকম ভাবে চলে যাওয়াটা জুন নিশ্চয়ই পছন্দ করবে না, সে অপমানিত বোধ করতে পারে। কিন্তু কী আর করা!

মোগলের হাতে পড়ার চেয়েও মুমুর বয়েসি এক ঝাঁক মেয়ের হাতে পড়লে মুক্তি পাবার সম্ভাবনা আরও কম।

বাসের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে মুমুদের যে টিচারটি স্মিত হাস্যে আমাকে নমস্কার করলেন, সে মহিলা আমার চেনা ঠিকই। উনি একসময় আমার ছোট মাসির দুই মেয়েকে বাড়িতে এসে পড়াতেন। নাম ভুলে গেছি।

তিনি বললেন, আপনি আমার মেয়েদের শক্ত শক্ত সাহিত্যের ধাঁধা বলে খুব ঠকিয়েছেন। এবারে আপনাকে আমি একটা ধাঁধা জিজ্ঞেস করব। বাংলা না ইংরিজি?

এ যেন দুর্যোধনকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, কুস্তি না গদা যুদ্ধ? এ রকম পরিস্থিতিতে প্রথমেই হেরে যাবার ভয় হয়।

বললুম, বাংলা।

অন্য মেয়েরা চ্যাঁচাতে লাগল, না, ইংলিশ, ইংলিশ?

শিক্ষয়িত্রীটি বললেন, আগে বাংলাতেই জিজ্ঞেস করি। বলুন তো, সুন্দরবাবু কি আসলে সুন্দর? তিনি কী কাজ করেন?

এটা কি একটা ধাঁধা হল? ছেলেবেলায় যারা বাংলা রহস্যকাহিনী পড়েছ, তারা সবাই জানে।

উত্তর দিতে গিয়েও থেমে গেলুম।

এতগুলি মেয়ের সামনে তাদের দিদিমণিকে হারিয়ে দেওয়া কি ঠিক হবে? বরং ছাত্রীদের কাছে তাদের শিক্ষয়িত্রীর মর্যাদা বাড়িয়ে দেওয়াই তো উচিত। আমার হারা-জেতায় কী আসে যায়?

বোকা বোকা মুখ করে বললুম, সুন্দরবাবু? সুন্দরবাবু কে? কখনও নাম শুনিনি।

সব মেয়ে তাদের টিচারের হয়ে হাততালি দিয়ে উঠল। শুধু মুমু কটমট করে তাকাল আমার দিকে।

www.amarboi.com

শোভনদা ফিরলেন অনেক রাত্তিরে।

গাড়িটা ফিরিয়ে এনেছেন বটে, কিন্তু মুখে তেমন খুশির ভাব নেই। গিয়ারে নাকি এখনও কট কট শব্দ হচ্ছে। অর্থাৎ ঝাড়গ্রামের মিস্তিরিরা কোনও রকমে জোড়াতালি দিয়ে দিয়েছে, এখনও রয়ে গেছে গণ্ডগোলের আশঙ্কা।

খাবার টেবিলে শোভনদার সঙ্গে তার বাবার বেশ খানিকটা ঝগড়াই হয়ে গেল।

শোভনদা গাড়ি অন্তপ্রাণ। তার গাড়িটা অসুস্থ, সুতরাং সেটা তার বাবার অসুস্থতার চেয়েও বেশি গুরুত্ব পেয়ে গেল। সে কালকেই কলকাতায় ফিরে যেতে চায়, সেখানে গাড়িটাকে আবার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনবে, তারপর অন্য কথা।

জীবনকৃষ্ণ কাল ফিরে যেতে রাজি নন।

শোভনদা বলল, বাবা, এখানে তো সাত-আটদিন থাকা হল। আবার পরে আসা যাবে। এ বাড়ি তো যখন তখন পেতে পারি।

জীবনকৃষ্ণ বললেন, সাত-আটদিন? ডাক্তার অন্তত পনেরো দিন থাকতে বলেছিল না? এখানকার জলে খাবারদাবার চট করে হজম হয়ে যায়। ব্লাডপ্রেসারও অনেকটা কমেছে মনে হয়। দেখছিস না, এর মধ্যে একদিনও রাগারাগি করিনি।

শোভনদা বলল, তা হলে তো ভালই। এর মধ্যে প্রেসারও মাপা হয়নি অবশ্য। কলকাতায় ফিরে সাবধানে থাকলে—

আমি কখনও অসাবধানে থাকি না। তবে কলকাতায় ধুলো-বালি-ধোঁওয়া, এখানে ফ্রেশ এয়ার, তরি-তরকারি টাটকা, আর ক'টা দিন থাকলে আরও ভাল লাগবে।

আমার যে কলকাতায় কাজ আছে।

বাজে কথা বলিস না। হোটেল থেকে তোকে ষোলোদিন ছুটি দিয়েছে, সারা বছর তো ছুটি নিতেই চাস না। যখন তখন ছুটি দেয়ও না। হঠাৎ কলকাতায় তোর কী কাজ পড়ল?

গাড়িটা সারানোও কি একটা জরুরি কাজ নয়?

গাড়িটা তোকে কে আনতে বলেছিল? ট্রেনই আমি পছন্দ করি। তখন কত আদিখ্যেতা করে বলেছিলি, গাড়ি সঙ্গে রাখার অনেক সুবিধে, তুই আমাকে শামুকখোল না কাঁকড়ামারি জঙ্গল দেখাতে নিয়ে যাবি, তার কী হল?

এবারে হল না, পরের বার হবে।

মোটকথা, কাল আমি ফিরছি না। তুই যেতে চাস, চলে যা তোর পেয়ারের গাড়ি নিয়ে।

তুমি একা থাকবে?

তাতে কী হয়েছে, একা থাকতে পারি না?

বাবা, তুমি শুধু শুধু জেদ করছ।

বেশ করছি জেদ করছি। আমি কি তোর কথায় চলব নাকি? আমার ইচ্ছে হলে কলকাতায় যাব। ইচ্ছে হলে এখানে থাকব।

www.amarboi.com

তা বলে কি আমি তোমাকে একা এখানে ফেলে চলে যেতে পারি? প্লিজ এবার চলো। বলছি তো, তোমাকে আবার এখানে নিয়ে আসব।

যাব না, যাব না, যাব না। জীবনকৃষ্ণ রায়বর্মন কারও পরোয়া করে না। বয়েস হয়েছে বলে কি অথর্ব হয়ে গেছি? বেতো রুগীও নই, হার্টও ঠিক আছে। তোদের পয়সাতেও খাই না। আমি নিজেরটা নিজেই চালাতে পারি।

বাবা—

আবার ওই এক কথা? দূর ছাই!

জীবনকৃষ্ণ ভাতের প্লেটটা ঠেলা মেরে ফেলে দিলেন মাটিতে। সেটা ঝনঝন শব্দে ভাঙল। তিনি গট গট করে চলে গেলেন নিজের ঘরে।

এই রে, নিশ্চয়ই ব্লাডপ্রেসার অনেক চড়ে গেছে।

আমি নীরব শ্রোতা।

শোভনদা একটুক্ষণ গোঁজ হয়ে বসে রইল। তারপর মুখ তুলে বলল, নীলু, তুই একটু বুঝিয়ে বলবি বাবাকে। চেষ্টা করে দেখ না। কাল ফিরতে পারলে খুব ভাল হয়।

আমি? উনি নিজের ছেলের কথাই শুনলেন না, আমায় কেন পাত্তা দিতে যাবেন?

আসল কারণটা শোভনদা ধরতে পারছে না।

জুন আর পরমা এখানে রয়ে গেলে জীবনকৃষ্ণ কোন দুঃখে কলকাতায় ফিরতে যাবেন? এখানে পরমার মতন এক সুন্দরী মহিলার সঙ্গে রঙ্গরস করে ওঁর দিব্যি সময় কেটে যাচ্ছে। কলকাতায় ওঁর সে রকম আকর্ষণ আছে কিছু?

শোভনদা গাড়ির চিন্তায় এমনই ভারাক্রান্ত যে পরমা ও জুনের কথা ওর বোধহয় মনেই নেই।

আমি একটা পরামর্শ দিতে পারি। পরমা আর জুনকেও গাড়িতে নেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হোক না। কাল কিংবা পরশু ওরা রাজি হলে মেসোমশাইও যে ফেরার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়বেন, তা আমি বাজি ফেলে বলতে পারি।

কিন্তু এই পরামর্শ কি আমি দিতে পারি? আমি যে অন্য পক্ষের লোক।

এখান থেকে কলকাতায় গাড়িতে যেতে পাঁচ-ছ ঘণ্টা তো লাগবেই। মাঝখানে কোথাও থামতেও হবে। এই অনেকটা সময় শোভনদা জুনের সঙ্গে থাকবে, এর মধ্যে যদি ঘনিষ্ঠতা হয়ে যায়?

শোভনদা বলল, নীলু, একটু দিয়ে দেখ না, বাবা কী করছে? আমাকে দেখলেই আবার মেজাজ চড়ে যাবে।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললুম, শোভনদা, তুমি কাল একাই চলে যেতে পারো। আমি মেসোমশাইয়ের সঙ্গে থেকে যাব কয়েকটা দিন, আমি দেখাশুনো করব।

অর্থাৎ উল্টো পরামর্শ। শোভনদাকে এখন থেকে সরিয়ে দেওয়াই সুবিধেজনক।

শোভনদা বলল, তুই আমার বাবাকে চিনিস না। এখন তো দেমাক করে বলছেন, একা থাকতে পারবেন। আমি যদি সত্যিই চলে যাই, তা হলে এরপর সবসময় আমাকে খোঁটা দেবেন, তুই আমাকে একা ফেলে চলে এলি। এখনকার ছেলেমেয়েরা তো এরকমই হয়। হ্যানো তেনো।

www.amarboi.com

জীবনকৃষ্ণ ভাতের থালা ফেলে দিয়ে অর্ধভুক্ত অবস্থায় নিজের ঘরে গিয়ে গেলাসে হুইস্কি ঢেলেছেন আর সিগারেট ধরিয়েছেন।

আমাকে দেখেই কড়া গলায় বললেন, নীলু, এখানে কী একটা জঙ্গল আছে, কাঁকড়ামারি, না শামুকখোল কী যেন নাম, সেটা কোথায় তুমি জানো?

হ্যাঁ, মেসোমশাই। জঙ্গলটার নাম কাঁকড়াঝোড়। খুব বেশি দূর নয়।

আমি পরমাদের সেই জঙ্গলটা দেখাব বলে কথা দিয়েছি। এখানে গাড়ি ভাড়া পাওয়া যায়?

যায় নিশ্চয়ই। এখানে না হলেও ঝাড়গ্রামে—

তুমি একটা গাড়ি ভাড়া করো আমার জন্য। আমার ছেলের গাড়ির তো ওই অবস্থা। দূর, দূর! ও ফিরে যাক কলকাতায়। তুমি হবে আমাদের গাইড। আগে গিয়েছ তো?

দু-তিনবার গেছি।

বাঃ, তা হলে ওই ঠিক রইল। তুমি কাল সকালে বেরিয়ে গাড়ি জোগাড় করে আনবে। বেশ মজবুত গাড়ি, পয়সা বেশি লাগে তো লাগুক, রাস্তায় খারাপ টারাপ যেন না হয়!

ভোরবেলাই জীবনকৃষ্ণ আমাকে ডেকে তুললেন। তাড়া দিয়ে বললেন, চলো, চলো, বেরিয়ে পড়ি। মর্নিংওয়াকটা সেরে নেওয়া যাক, তারপর অনেক কাজ আছে।

শোভনদা এখনও ঘুমোচ্ছে। ছেলের ওপর তিনি এমনই রেগে আছেন যে তার সঙ্গে কথা বলারও দরকার বোধ করলেন না।

কাল যেখানে পরমা ও জুনের সঙ্গে যেখানে দেখা হয়েছিল, আজ তারা সেখানে নেই।

যাওয়া হল নদীর ধার পর্যন্ত, দেখা হল সেই চায়ের দোকানে, কোথাও নেই ওরা।

জীবনকৃষ্ণ বেশ বিস্মিত।

এ ক'দিন প্রত্যেক সকালেই ওদের সঙ্গে বেড়িয়েছেন তিনি, আজ কী হল? আজ বৃষ্টি-বাদলাও কিছু নেই।

আর প্রাতর্ভ্রমণে মন নেই জীবনকৃষ্ণের। তিনি বলল, চলো তো ওদের বাড়িতে গিয়ে দেখি।

দরজা খুলল জুন। তার মুখখানা কেমন যেন শুকনো। দু'জন অতিথিকে দেখে উজ্জ্বল হল না।

জীবনকৃষ্ণ জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার, তোমরা আজ বেরোওনি?

জুন বলল, নাঃ! আজ আর ইচ্ছে করল না।

এখন যাবে নাকি? তেমন বেলা তো হয়নি।

জুন বলল, আপনারা ঘুরে আসুন।

জীবনকৃষ্ণ সতৃষ্ণভাবে তাকালেন অন্য দরজাটার দিকে। বলাই বাহুল্য তিনি পরমাকে খুঁজছেন।

জুন সম্ভবত তা বুঝতে পেরেই বলল, মা বাথরুমে।

www.amarboi.com

জীবনকৃষ্ণ বললেন, আমরা একটু বসছি। চা-টা খাওয়াবে নাকি?

জুন মুখ ফিরিয়ে কাজের মেয়েটির উদ্দেশে বলল চায়ের কথা।

জীবনকৃষ্ণ বললেন, চলো, আজ আমরা শামুকঝোড় জঙ্গলটা দেখে আসি। বেলাবেলি বেরিয়ে পড়ব।

আমি সংশোধন করে দিলাম, কাঁকড়াঝোড়।

জুন এতক্ষণ আমার দিকে তাকায়নি। এবার এক ঝলক দৃষ্টিপাত করল।

জীবনকৃষ্ণ বললেন, সেখানে তুমি ছবি তোলার অনেক সাবজেক্ট পাবে।

জুন বলল, না, আমাদের যাওয়া হবে না।

কেন?

আমরা আজ কলকাতায় ফিরে যাচ্ছি।

আজ ফিরে যাবে, সে কী? কালও তো কিছু বলনি। আগে শুনেছিলাম, আরও তিন-চারদিন থাকবে!

না, আজই ফিরে যাব ঠিক করেছি।

এই সময় পরমা এসে ঢুকলেন। এরই মধ্যে স্নান সেরে নিয়েছেন। তাঁর মুখখানা দেখাচ্ছে বৃষ্টিতে ভেজা ফুলের মতন।

একটা চেয়ারে বসে তিনি বললেন, কাল রাত্তিরে একটা কাণ্ড হয়েছে। একটা লোক ঢুকে পড়েছিল বাড়ির মধ্যে।

জীবনকৃষ্ণ বললেন, চোর?

পরমা বললেন, তা জানি না। কিছু চুরি তো যায়নি। আমি আর জুন এক ঘরে থাকি। একটা শব্দ পেয়ে জুনেরও আগে ঘুম ভেঙেছিল। মেয়ের খুব সাহস, আমাকেও ডাকেনি। দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে গিয়েছিল জুন।

তারপর?

দরজা খোলার শব্দে অবশ্য আমারও ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। জুন বাইরে বেরুতেই দেখল, একটা লোক ছুটে পালাচ্ছে। সে শব্দটা আমিও শুনেছি। লোকটা অন্ধকারে মধ্যে দৌড়তে গিয়ে দেয়ালে একটা ধাক্কা খেয়েছিল, বেশ জোরে শব্দ হয়েছিল।

তার মুখটা দেখতে পেয়েছ, জুন?

না।

জুন এমনভাবে আমার দিকে একবার কটাক্ষ করল যে ছ্যাঁৎ করে উঠল আমার বুক।

ও কি আমাকে সন্দেহ করছে নাকি?

যে লোক কাল বৃষ্টির মধ্যে পর্দা ফেলা রিকশায় ওর পাশে বসেও কাঁধে হাত রাখেনি। সে রাত্তিরে চোরের মতন আসবে কেন? চোরের ভূমিকা নেবার অভ্যেস আমার নেই।

জীবনকৃষ্ণ বললেন, তা হলে তো পুলিশে খবর দিতে হয়।

পরমা বললেন, তার দরকার নেই। আমরা আজ চলেই যাব।

জঙ্গল দেখবে না?

www.amarboi.com

এবারে আর হবে না।

ভাল করে পাহারা দেবার ব্যবস্থা করলে চোর টোর ঢুকবে কী করে?

জুন এবার জোর দিয়ে বলল, আমরা চলে যাব ঠিক করে ফেলেছি।

জীবনকৃষ্ণ কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন।

আমি জুনকে বললুম, আপনার মেজাজটা বেশ খারাপ হয়ে গেছে।

জুন সংক্ষিপ্ত ভাবে বলল, হ্যাঁ।

জীবনকৃষ্ণ জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কীসে যাবে?

ট্রেনে।

কেন, ট্রেনে যাবে কেন? আমাদেরও তো আজই ফেরার কথা। চলো, গাড়িতেই এক সঙ্গে যাই।

না। ট্রেনে যাওয়াই সুবিধে। আপনারা গাড়িতে যান।

কেন? গাড়িতে বেশ একসঙ্গে গল্প করতে করতে যাওয়া হবে। চলো, চলো তাই চলো।

পরমা বললেন, আপনাদের গাড়িতে কি জায়গা হবে?

কেন হবে না? যদি হয় সুজন তো তেঁতুল পাতায় ন'জন। কখন বেরুতে চাও বলো?

ওদের আর আপত্তি করায় সুযোগ না দিয়ে জীবনকৃষ্ণ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, তা হলে তোমরা তৈরি হয়ে নাও। আমরা গাড়ি নিয়ে আসছি। খাওয়া দাওয়ার ঝামেলা কোরো না, রাস্তায় খেয়ে নেব।

ব্যস্তভাবে বাইরে বেরিয়ে এসে জীবনকৃষ্ণ বললেন, আমার ছেলেটা এর মধ্যেই বেরিয়ে গেল নাকি? নীলু, তুমি দৌড়ে গিয়ে দেখো তো!

শোভনদা গাড়িতে বসে স্টার্ট দিয়েছে।

আমি হাঁফাতে হাঁফাতে গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে বললুম, শোভনদা, দাঁড়াও, দাঁড়াও, এখন তোমরা যাওয়া হবে না।

শোভনদা রুক্ষ স্বরে বলল, সরে যা সামনে থেকে।

একটু অপেক্ষা করো। কথা আছে।

বলছি না, সরে যা। চাপা পড়তে চাস?

এত রাগ করলে চলে? মেসোমশাই আসছেন এক্ষুনি।

নীলু, দালালি করতে হবে না তোকে। থাক তোরা এখানে।

মেসোমশাই দেরি করেননি, লম্বা লম্বা পা ফেলে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত।

গাড়ির মধ্যে শোভনদাকে বসে থাকতে দেখে তিনি আবার রেগে উঠলেন। ভুরু তুলে বলল, অ্যাঁ, তুই আমাকে কিছু না বলে চলে যাচ্ছিলি? এত বেয়াদপ হয়েছিস। নেমে আয় গাড়ি থেকে। না হলে কান ধরে টেনে নামাব।

শোভনদা কাঁচুমাচু হয়ে বলল, যাচ্ছি না তো। কে বলল, যাচ্ছি! তোমাকে না জানিয়ে যেতে পারি?

গাড়িতে বসে, ইঞ্জিনে স্টার্ট দিয়েছিস।

www.amarboi.com

দেখছিলাম গাড়িটা ঠিক আছে কি না।

আবার বাজে কথা বলছিস! নেমে আয়।

বাবা, তুমি দেখো, ইঞ্জিনে স্টার্ট দিয়েছি। কিন্তু গিয়ার নিউট্রাল। এখন কী হয়েছে বলো।

শোভনদা নেমে আসার পর জীবনকৃষ্ণ সিগারেট ধরিয়ে বললেন, ভেবে দেখলাম, তুই একলা একলা অতটা পথ যাবি, আমিও তা হলে চলেই যাই তোর সঙ্গে। কলকাতায় আমারও একটা কাজের কথা মনে পড়েছে। কালকের মধ্যে একটা চেক জমা দিতে হবে।

এবারে শোভনদার মুখের খুচিমুচি ভাব কেটে গেল। বলল, তুমি যাবে? ওফ্, প্রত্যেকবার আগে এমন একটা ঝঞ্ঝাট করো! ঠিকই জানতাম, তুমি যাবে।

তোর গাড়িতে আর দু'জনের জায়গা হবে?

দু'জন মানে কে কে?

পরমা আর প্রথমা?

হ্যাঁ, কেন জায়গা হবে না। এ গাড়িতে মালপত্র বেশি আঁটে না। তবু হয়ে যাবে।

আমার দিকে ফিরে শোভনদা জিজ্ঞেস করলেন, নীলু, তুই কী করবি?

জীবনকৃষ্ণ বললেন, ছোট গাড়ি, পাঁচজন হলে বেশি ঠাসাঠাসি হয়ে যাবে।

অর্থাৎ আমাকে নিতে চান না।

বাবা আর ছেলে, মা আর মেয়ের সঙ্গে গল্প করতে করতে যাবে, মৃদু প্রেমও হতে পারে, তার মধ্যে আমার স্থান কোথায়?

মান বাঁচাবার জন্য বললুম, আমি তো এখন কলকাতায় ফিরব না। আমার অন্য জায়গায় যাবার কথা আছে।

ওরা দু'জনেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন।

এর পরে জীবনকৃষ্ণ দয়াপরবশ হয়ে বললেন, তুমি খানিকটা যেতে পারো। তোমাকে ঝাড়গ্রাম নামিয়ে দিতে পারি। এটুকু রাস্তা একটু কষ্ট করে যাওয়া যায়।

ঘণ্টা খানেকের মধ্যে সব ব্যবস্থা হয়ে গেল।

ঝাড়গ্রাম পর্যন্ত রাস্তায় জুন একটাও কথা বলল না আমার সঙ্গে। খুব রেগে আছে। কিংবা হঠাৎ আমার হাত ধরে ফেলেছিল বলে এখন লজ্জা পাচ্ছে।

ঝাড়গ্রাম স্টেশনের কাছে আমাকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল ওদের গাড়ি।

সকালের ট্রেন চলে গেছে, আমাকে অপেক্ষা করতে হবে বিকেল পর্যন্ত। স্টেশনে বসেই কাটিয়ে দিতে হবে সময়টা। তার আগে এক ঠোঙা চিনে বাদাম কেনা দরকার। কিংবা, আবার যদি পরপর পাঁচটা পেয়ারা খাই, তা হলে কি কোনও তরুণী মেয়ের দেখা পাব?

এ ধরনের পরীক্ষা দু'বার করতে নেই।

স্টেশন এখন সুনসান, তাই বাদাম কিনতে যেতে হল বাজারের দিকে।

বেশ বড় একা ঠোঙা বাদাম কিনে একটা একটা করে ভেঙে ভেঙে খাচ্ছি আর হাঁটছি। হঠাৎ একটা দোকান থেকে কে যেন নীল, নীলু বলে ডাকল।

www.amarboi.com

মুখ ফিরিয়ে দেখি, প্রীতম!

অবাক হবার বদলে মনে মনে বললাম, হায় রে অভাগা, যদি এলিই এখানে, আর দু'তিন আগে আসতে পারলি না? এখন যে আর কিছুই করার উপায় নেই। পাখি উড়ে গেছে!

প্রীতম দোকানটা থেকে বেরিয়ে এসেছে। কাছে গিয়ে বললুম, এটা কী হল? তুই যে চলে আসবি, আমাকে আগে বলিসনি কেন?

প্রীতম বলল, না, না, না। আমি সেজন্য আসিনি। এখানেও আসিনি। মানে, খড়্গপুরে ট্রেন অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে জানিস তো?

না জানি না তো। ট্রেন অ্যাকসিডেন্ট? কবে?

পরশু রাত্তিরে। দারুণ অ্যাকসিডেন্ট, একশো জনের বেশি মারা গেছে। ইনজিওরড অনেক। খবর পেয়েই তো আমি চলে এসেছি ছবি তোলার জন্য।

কাগজ পড়িনি, রেডিয়ো শুনিনি, তাই কিছু জানি না।

সে যা অবস্থা, তিনটে বগি উল্টে গেছে। ছবি টবি সব পাঠিয়ে দিয়ে ভাবলুম, তোর খবর নিয়ে যাই একবার। বেশি তো দূর নয়। সঙ্গে গাড়ি ছিল, তাই সুবিধে।

গাড়ি?

হ্যাঁ, গাড়ি এনেছি।

কার গাড়ি? তুই কিনলি?

এখনও ঠিক কিনিনি। এটা একটা কম্পানির ম্যানেজারের গাড়ি, বিক্রি করে দেবে। তাই ট্রায়াল হিসেবে আমি চালিয়ে দেখবার জন্য নিয়েছি।

কোথায় গাড়িটা?

ওই যে রাখা আছে। মারুতি। সেকেন্ড হ্যান্ড হলেও অ্যাজ গুড অ্যাজ নিউ।

আমি গোপনে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললুম। জুন-পর্ব তো ঘুচে গেছে। প্রীতম যদি অন্য কোনও মেয়ের সঙ্গে প্রেম করতে চায়, গাড়ি নিয়ে যেন না যায়!

গাড়িটার কাছে গিয়ে সেটার ওপর হাত বুলিয়ে আদর করতে করতে প্রীতম বলল, তুই কোন হোটেলে উঠেছিস, নীলু।

কোনও হোটেলেই উঠিনি। চিলকিগড়ের রাজবাড়িতে অতিথি ছিলাম।

অ্যাঁ? কী করে ম্যানেজ করলি রে?

সে গল্প পরে বলল। এখন বাদাম খা।

আমার ঠোঙা থেকে বাদাম নিয়ে প্রীতম বলল, এখানকার দু'তিনটে হোটেলে খোঁজ নিয়েছিলাম। তোর সঙ্গে যে এরকমভাবে দেখাই হবে ভাবিনি। তোর খোঁজ না পেয়ে তো চলেই যাচ্ছিলাম!

চিনেবাদাম খাওয়ার উপকারিতা বিষয়ে যদি কোনও রচনা লিখতে হয়, বড় এক ঠোঙা বাদাম কিনলে হঠাৎ পুরনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়।

বাদাম কিনতে না বেরিয়ে স্টেশনে বসে থাকলে প্রীতমের সঙ্গে আমার দেখাই হত না।

www.amarboi.com

প্রীতম রেস্তোরাঁর দাম মিটিয়ে দিয়ে এল। তারপর বাদাম ভাগাভাগি করে খেতে খেতে আমি ওকে সংক্ষেপে পুরো ঘটনাটা শোনালাম।

প্রীতম বলল, তা হলে আর চান্স নেই। আর জুনের দিকে এগোব না বলছিস?

আমি বললুম, কাল বিকেলে পর্যন্ত চান্স ছিল, এই একটু আগে ফস্কে গেল। তবে তোকে আমি একটা কথা বলতে পারি, জুনের সঙ্গে শোভনদা'র হাত ধরাধরির স্টেজ ছিল না। এর পর কী হবে, তা জানি না।

এবং সত্যের খাতিরে আমাকে জানাতেই হল। জুন অন্য কারও হাত ধরতে পারে, কিন্তু শোভনদার হাত ধরেনি, এটা আমি শিওর। আজ গাড়িতে যেতে যেতে শোভনদা বেশি এগোবে না তার বাবা বেশি এগোবে, তা বলা যায় না।

প্রীতম উদাসীন ভাবে বলল, থাক, ও নিয়ে আর মাথা ঘামাব না।

এক ঠোঙা বাদাম শেষ হলে প্রীতম বলল, বেশ লাগছিল। আর একটু বাদাম কিনলে হয় না?

চল, কিনে আনি।

বাদাম খাওয়ার আর একটা উপকারিতা, ব্যর্থ প্রেমের দুঃখ ভুলিয়ে দেয়।

দ্বিতীয় ঠোঙা বাদামও যখন অর্ধেক শেষ হয়েছে, তখন যেন আমি হঠাৎ ভূত দেখলুম। শোভনদা! যে লোকটি একটু আগে কলকাতায় চলে গেল, সে-ই আবার ঝাড়গ্রামের একটা গলি থেকে বেরিয়ে আসে কী করে?

শোভনদার মুখ জলে-পড়া মানুষের মতন।

এ কী শোভনদা, আপনি এখানে।

চরমতম হতাশার সুরে শোভনদা বললেন, সে মিস্তিরিটার আবার অসুখ করেছে, সে আজ কারখানায় আসেনি।

কোন মিস্তিরি? আপনার গাড়ি আবার খারাপ হয়েছে নাকি?

আর বলিস কেন! এক মাইলও যাইনি, আবার গিয়ারে এমন শব্দ হতে লাগল, তারপর একেবারে নিউট্রাল, ফার্স্ট গিয়ার পর্যন্ত লাগছে না।

গাড়িটা কোথায়?

রাস্তায় পড়ে আছে!

আর মেসোমশাইরা?

বসে আছে গাড়িতেই। ওখানটা আবার জঙ্গল মতন। আমি যে মিস্তিরি নিয়ে যাব, মারুতির কাজ জানা কোনও মিস্তিরিই পাচ্ছি না।

প্রীতম জিজ্ঞেস করল, শুনে তো মনে হচ্ছে গিয়ার ডাউন করতে হবে।

শোভনদা বলল, আমারও তাই সন্দেহ।

প্রীতম বলল, তা হলে তো গাড়ি গ্যারেজে আনতে হবে, রাস্তায় সারানো যাবে না।

শোভনদা বলল, দেখি, যদি মিস্তিরি এক্ষুনি না পাই, গাড়িটা টেনে আনার লোক জোগাড় করতে হবে।

আমি শোভনদার সঙ্গে প্রীতমের আলাপ করিয়ে দিলুম।

www.amarboi.com

শোভনদা বলল, তোমরা একটু গিয়ে দেখো না ততক্ষণ। আমি লোক নিয়ে আসছি। সোজা হাইওয়ের দিকে গেলেই গাড়িটা দেখতে পাবে।

প্রীতমের কাকার একটা গাড়ি ছিল। ও অনেকদিন আগেই গাড়ি চালানোতে হাত পাকিয়েছে। তবু ওর গাড়িতে ওঠার পরই কী রকম যেন একটা শব্দ পেলাম।

আমি প্রশ্নসূচক ভাবে তাকাতেই প্রীতম বলল, আমার গাড়ির ক্লাচ, গিয়ার, ব্রেক সব ঠিক আছে। আমি চেক করিয়ে নিয়েছি। ডিকিতে আমার একটা টুল বক্স আছে, সেটাই ঢকঢক করছে।

কৃতিত্ব দেখাবার জন্য প্রীতম গাড়িটার গতি খুব জোর করে দিল।

দূর থেকেই দেখা গেল, দীর্ঘকায় জীবনকৃষ্ণ একটা গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছেন।

আমাকে দেখে ভুরু কুঁচকে বললেন, কী ব্যাপার, নীলু, তুমি কি মজা দেখতে এলে নাকি?

অর্থাৎ ওঁর মেজাজ টং হয়ে আছে।

এবার আমার ওপরেই ঝাল ঝাড়বেন নিশ্চয়ই। পরমাকে তিনি কাঁকড়াঝোড় দেখাবেন বলেছিলেন, তা হল না। তারপর প্রায় জোর করেই ওদের নিয়ে এসেছেন ছেলের গাড়িতে। সেই গাড়ির এরকম খারাপ ব্যবহার! মান-সম্মান নিয়ে টানাটানি।

আমি কিছু বলার আগেই তিনি আবার বললেন, এটা কার গাড়ি?

আমি বললুম, এ আমার বন্ধু প্রীতম। শোভনদার সঙ্গে দেখা হল, ওর কাছেই শুনলাম, আপনারা বেশিদূর যেতে পারেননি।

প্রীতম বলল, আপনারা কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন? কোথাও গিয়ে বসবেন? আমি পৌঁছে দিতে পারি।

জীবনকৃষ্ণ ধমকের সুরে বললেন, কোথায় যাব?

প্রীতম বলল, তা তো জানি না। আমি এ অঞ্চলটা ভাল চিনি না।

আমি বললুম, প্রীতম এসেছিল খড়্গপুরে। ওখানে একটা সাংঘাতিক ট্রেন অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। প্রীতম ছবি তুলতে এসেছে। খুব নাম করা ফটোগ্রাফার।

জীবনকৃষ্ণ বললেন, অ্যাকসিডেন্ট। তার মানে কি ট্রেনও চলছে না?

প্রীতম বলল, ট্রেন মুভমেন্ট এখনও নর্মাল হয়নি। কোনও কোনও ট্রেন দশ-বারো ঘণ্টা লেট।

জীবনকৃষ্ণ বললেন, সর্বনাশ। তা হলে তো ট্রেনেও যাওয়া যাবে না।

গাড়ির ভেতরে উঁকি দিয়ে বললেন, শুনেছ পরমা। ট্রেন বন্ধ। তোমরা আজ ট্রেনেও যেতে পারতে না। গাড়ির ওপর ভরসা করা যায়? এ গাড়িটা তো একটা টিনের বাক্স হয়ে গেছে, আর কোনদিনও নড়বে চড়বে না।

তিনি ছেলের গাড়ির গায়ে লাথি মারলেন একটা।

পরমা আর জুন নেমে আসতেই আমি বললুম। আমার বন্ধু ...

নামটা বলার আগেই জুন বলল, নমস্কার, কেমন আছেন? অকারণে লজ্জা পেয়ে প্রীতম বলল, হ্যাঁ, আপনি ভাল তো? জুন বলল, আপনি অ্যাকসিডেন্টের ছবি তুলতে

www.amarboi.com

এসেছিলেন? প্রীতম বলল, হ্যাঁ, পাঠিয়েও দিয়েছিলাম, আজকের কাগজে ছাপা হয়ে গেছে।

কোথায়? কাগজ এসেছে এখানে?

হ্যাঁ। এসেছে।

আপনার কাছে আছে? একটু দেখাবেন?

প্রীতম গাড়ি থেকে একটা ইংরিজি কাগজ নিয়ে এল।

প্রথম পাতাতেই পরপর তিনটি ছবি এক সঙ্গে জোড়া। ক্যাপশানের সঙ্গে গাঢ় অক্ষরে প্রীতমের নাম।

জুন বলল, ইস্, কী সাংঘাতিক অ্যাকসিডেন্ট! এত লোক... আপনার ছবিগুলো ভাল হয়েছে।

প্রীতম বলল, না থার্ড ছবিটা ঠিক পছন্দ হয়নি আমার নিজেরই। স্লাইটলি আউট অফ ফোকাস। কেন এরকম হল।

জুন বলল, আপনি কী লেন্স ব্যবহার করেছেন?

ওরা দু'জনে মেতে গেল ফটোগ্রাফির টেকনিক্যাল আলোচনায়।

মেসোমশাই ঢক ঢক করে পুরো এক বোতল জল খেয়ে নিলেন। মনে হচ্ছে, তাঁর অন্য রকম তেষ্টাও পেয়েছে যথেষ্ট।

একটা লরি শোভনদাকে নামিয়ে দিয়ে গেল, সঙ্গে দু'জন লোক।

তাদের একজন স্টিয়ারিং-এ বসে খানিকটা নাড়াচাড়া করেই বলল, নাঃ এখানে হবে না। গ্যারেজে নিয়ে যেতে হবে।

শোভনদা পরমাকে বললেন, আপনাদের জিনিসগুলো নামাতে হবে।

পরমা বললেন, আমরা তা হলে এখন কোথায় যাব?

শোভনদা পরমাকে বললেন, চিলকিগড়ে ফিরে যেতে চান। কিংবা ঝাড়গ্রামে কোনও গেস্ট হাউসে যদি রেস্ট নেন। বিকেলের মধ্যে গাড়িটা নিশ্চয়ই ঠিক হয়ে যাবে।

মিস্তিরিটা বলল, হোল ডে-তেও হবে না স্যার।

মেসোমশাই নিজের ছেলের সঙ্গে একটাও কথা না বলে গটগট করে প্রীতমের গাড়ির কাছে গিয়ে বললেন, তুমি আমাদের কোনও একটা জায়গায় পৌঁছে দিতে চাইছিলে। তুমি আসলে যাচ্ছিলে কোথায়?

একটু হকচকিয়ে গিয়ে প্রীতম বলল, আমি, মানে আমি তো কলকাতাতেই ফিরব।
জীবনকৃষ্ণ বললেন, তা হলে কলকাতাতে পৌঁছে দিতে পারবে?

কাকে?

আমাকে। আর এই দু'জনকে।

হ্যাঁ। মানে নিশ্চয়ই। কেন পারব না, আমি তো যাচ্ছিই।

গুড। জুন, এ গাড়িতে জিনিসপত্র ট্রান্সফার করে দাও। নীলু, একটু হাত লাগাও তো।

শোভনদা এসে বলল, এটাই ভাল হল। বাবা, তোমরা কলকাতায় চলে যাও।

www.amarboi.com

আমাকে তো গাড়িটা নিয়ে যেতেই হবে।

জীবনকৃষ্ণ অবজ্ঞার সঙ্গে বললেন, দেখ, এখন তোর কতদিন লাগে।

তিনি গিয়ে বসলেন সামনের সিটে। পরমা আর জুন পেছনে।

প্রীতম আমাকে জিজ্ঞেস করল, নীলু, তুই কী করবি?

জীবনকৃষ্ণ বলল, পাঁচজনে বড্ড ঠাসাঠাসি হয়ে যাবে।

শুধু যে ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি হয় তাই নয়। মানুষের জীবনেরও হয়। এই রকম কথা কয়েক ঘণ্টা আগেই শুনেছি না?

তবে, ব্যতিক্রমের মধ্যে এই, এবার জুন বলল, না, না, উনি একা একা থেকে যাবেন কেন? পেছনে তিনজন হয়ে যাবে। আমি সুটকেসটা কোলে নিয়ে বসছি।

আমি জুনের চোখে চোখ রেখে মিষ্টি করে বললুম, আমি তো যাব না। আমাকে যে দিকশূন্যপুরে যেতে হবে!

দুটো গাড়ি চলে গেল দু'দিকে। একটা কলকাতায় দিকে দ্রুত গতিতে, আর অন্যটা শোভনদা ঠেলে টেনে ঝাড়গ্রামের দিকে, আস্তে আস্তে।

আমি দাঁড়িয়ে রইলুম রাস্তায়।

জুন যে আমাকে গাড়িতে নিতে চেয়েছিল, সেটুকুই যথেষ্ট।

জুনের চিঠি লেখার অভ্যেস আছে কি না জানি না। যদি এই যাত্রায় তার সঙ্গে প্রীতমের ভাব হয়ে যায়, যদি সে প্রীতমকে চিঠি লেখে, তা হলে সে চিঠির উত্তর আমাকেই লিখে দিতে হবে।

অবশ্য মাঝপথে যদি প্রীতমের গাড়ি খারাপ না হয়!

www.amarboi.com

গভীর রাতে দিঘির ধারে

www.amarboi.com

www.amarboi.com

তুই কী খেতে ভালবাসিস রে নিলু? মাছ না মাংস?

এরকম প্রশ্নের কি এক কথায় উত্তর হয়? কোথায় বসে খাব, কখন, এসব বিবেচনা করতে হবে না? খুব শীত কিংবা দারুণ গরম, কিংবা একটানা বৃষ্টির দিন, তার জন্য আলাদা আলাদা খাবার পছন্দ করতে হয়। অবশ্য যদি পাওয়া যায়। যদি খিচুড়ি রান্না হয়, তার সঙ্গে পাগল ছাড়া অন্য কেউ মাংস খেতে চায়?

খিচুড়ির সঙ্গে চাই ইলিশ কিংবা চিংড়ি মাছ ভাজা, যদি পাওয়া যায়। আবার রুমালি রুটির সঙ্গে মাছ খাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। তার সঙ্গে চাই কষা মাংস, যদি পাওয়া যায়।

ঝর্নামাসি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন।

খুব সহজ উত্তর হতে পারে, দুটোই।

কিন্তু এরকম উত্তর তো যে কেউ দিতে পারে, তাই আমি কায়দা করে বললুম, ডিম।

জানলার পটভূমিকায় দাঁড়ালে মানুষের মুখ অস্পষ্ট দেখায়। আজকের দিনটা আবার মেঘলা।

গলার আওয়াজে খানিকটা অবাক ভাব ফুটিয়ে ঝর্নামাসি বললেন, ডিম?

আমি বললুম, হ্যাঁ, তবে মুরগি কিংবা হাঁসের নয়।

—তবে? ঘোড়ার ডিম নাকি? আর কীসের ডিম লোকে খায়?

—কেন, মাছের ডিম হয় না?

—মাছের ডিম? কোন মাছের?

—কাস্পিয়ন হ্রদে এক রকম মাছ হয়, তার নাম বোধহয় স্টার্জন, সেই মাছের ডিম!

ঝর্নামাসি এবারে জানলার কাছ থেকে সরে এলেন। তাঁর গোলাপি রঙের মুখখানিতে তাচ্ছিল্যের ভাব ফুটিয়ে বললেন, ওঃ, ক্যাভিয়ের! খুব স্মার্ট হয়েছিস দেখছি। তা ক্যাভিয়ের আর এদেশে পাব কোথায়? ঠিক আছে, কারুর হাত দিয়ে তোর জন্য পাঠিয়ে দেব এক কৌটো। আগে কখনও খেয়েছিস?

—জীবনে একবার মাত্র।

—এমন কিছু আহা মরি খেতে নয়। আমার তো কই মাছের ডিম আরও বেশি ভাল লাগে।

—তোমার জন্য ডিমভরা কই মাছ এনে দেব, ঝর্নামাসি?

ঝর্নামাসি আমেরিকা যাবার আগেই সুন্দর ছিলেন, না আমেরিকায় বারো বছর থেকে এত সুন্দর হয়েছেন, তা জানি না। তবে, সুন্দরী মেয়েদেরই তো এদেশ থেকে

www.amarboi.com

পুরুষরা এসে হরণ করে নিয়ে যায়। ওসব দেশে ভাল ভাল খাবার খেয়ে আর স্নো-পমেটম মেখে তারা আরও বেশি রূপসী হয়।

আর এরকম মধ্যযৌবনেই মেয়েদের রূপ বেশি খোলে।

আমার মহাবিপদ হয়েছে, আমি ঝর্নামাসির দারুণ প্রেমে পড়ে গেছি।

জানি, মাসিদের প্রেমে পড়তে নেই। কিংবা প্রেমে পড়লেও তা উচ্চারণ করতে নেই। মাসির প্রেমে পড়ার ব্যাপারে আমি পৃথিবীতে প্রথম নই, আরও অনেক ছেলেই পড়ে, তারপর তারা কী করে কে জানে!

প্রেম অনেক রকম। সাধারণত একজন আরেকজনকে কাছে পেতে চায়। খুব কাছে, মাঝখানে একটুও ফাঁক থাকবে না, বাতাস আকুপাকু করবে।

আর এক রকম হচ্ছে, প্রেমিকার জন্য আত্মদান। প্রেমিকাকে খুশি করার জন্য মৃত্যুবরণেও আপত্তি নেই। শ্যামা নৃত্যনাট্যের উত্তীয়ের মতন। আমার পক্ষে ঝর্নামাসিকে খুব কাছে চাইবার প্রশ্নই ওঠে না। ওর একখানা জবরদস্ত স্বামী আছে, এবং দুটি অতি বিচ্ছু ছেলে মেয়ে। এবং নীললোহিত একটা প্যাংলা বেকার। সুতরাং আমি উত্তীয়। ঝর্নামাসি যদি কখনও বলে, আমার অনেকক্ষণ হাসি পাচ্ছে না, তুই একবার আগুনে ঝাঁপ দে তো নীলু, দেখি কেমন মজা হয়, সঙ্গে সঙ্গে আমি আগুনে লাফিয়ে পড়ব।

মুশকিল হচ্ছে, আমার এই প্রেম, ঝর্নামাসির কাছে তো বটেই, অন্য সকলের কাছেও গোপন রাখতে হবে খুব সাবধানে। কিন্তু প্রেম যে ফোঁড়ার মতন হঠাৎ হঠাৎ গায়ে ফুটে বেরোয়। গত মাসেই আমার এরকম একটা ফোঁড়া হয়েছিল।

আপাতত ঝর্নামাসির মনোরঞ্জনের জন্য ডিমভরা কই মাছ জোগাড় করাই আমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য।

কিন্তু কই মাছগুলো এমনই পাজি, শীতকালে তারা কিছুতেই ডিম পাড়ে না। শীতকালে তাদের রোগা হয়ে থাকতে কে বলেছে?

ঝর্নামাসিরাও শীতকাল ছাড়া আসে না, তাও দু'বছর অন্তর। গরম ওদের সহ্য হয় না। শীতকালে আমেরিকা-ট্যামেরিকায় বরফ পড়ে, তখন নিজেদেরই গ্যারেজের সামনের বরফ পরিষ্কার করতে হয় রোজ, অনেক ঝামেলা, সেইজন্যই পশ্চিমবাংলার মৃদু শীত ওঁদের পছন্দ।

অনেকদিন গ্রামের শীত দেখেননি, তাই এবারে সবাই মিলে এসেছেন গ্রামের বাড়িতে। রবীনমেসো ভোরবেলা খেজুরের রস খেয়ে আহ্লাদে ডগোমগো, কিন্তু ছেলে-মেয়ে দুটি একটুখানি চেখেই মুখবিকৃতি করে বলেছে, অ্যাঃ!

দশ বছরের মেয়েটির নাম টিনা আর আট বছরের ছেলের নাম রণ। এসব নাম অনেক ভেবেচিন্তে রাখতে হয়। কোন পত্রিকায় যেন পড়েছি, একটা সমীক্ষায় দেখা গেছে, ইওরোপ-আমেরিকায় যে-সব বাঙালি দম্পতির ছেলে জন্মায়, তাদের শতকরা তিরিশ ভাগের নামই রণ। মেয়েদের মধ্যে টিনা নামটাও খুব জনপ্রিয়।

ছেলে-মেয়ে দু' জনেরই চেহারা যেমন সুন্দর, তেমনই বুদ্ধি। কিন্তু তারা বাবা মায়ের দেশের কিছুই পছন্দ করে না। আমাকে সমেত।

www.amarboi.com

আমি ওঠার উপক্রম করতেই ঝর্নামাসি বললেন, কোথায় যাচ্ছিস? বোস!

এককালের শখের দো-মহলা বাড়ি। লম্বা টানা বারান্দা। কাক-শালিকের উপদ্রব থেকে বাঁচার জন্য এক দিকটা জালে ঘেরা। কত ঘর খালি পড়ে আছে। একতলায় বড় বৈঠকখানা, দোতলাতেও একটা বসবার ঘর সোফা-টোফা দিয়ে সাজানো। এঘরের জানলা দিয়ে দেখা যায় অযত্নে মুমূর্ষু বাগান, তারপরে একটা পুকুর। দিঘিই বলা উচিত, বড় পুকুরের নামই তো দীর্ঘিকা।

ঝর্নামাসির মুখের রং গোলাপি। রক্তচন্দন বর্ণ বললে বইয়ের ভাষার মতন শোনায়। হাত-পা খুব ফর্সা। তবে শরীরের রঙের সঙ্গে মুখের রঙের স্পষ্ট তফাত আছে নিশ্চিত, এবং সম্ভবত তা প্রসাধনের নয়।

সর্দি হলে যে রকম ধরা ধরা গলা হয়, ঝর্নামাসির কথা সব সময় সে রকম। বেশ আদুরে আদুরে শোনায়। যদিও ইকোনমিক্সে পিএইচ ডি করে ওদেশে বড় চাকরি করছেন, খুব খাটুনি।

রবীনমেসো এখানেও পার্সোনাল কম্পিউটার নিয়ে এসেছেন, সারা সকাল তাই নিয়ে বসে থাকেন।

ছেলে-মেয়ে দুটি নিজেরাই পড়তে বসে, এ সময় ডাকলে তারা বিরক্ত হয়। খেলনাও এনেছে অনেক, কিন্তু সে সব বিকেলে।

কলকাতা থেকে রান্নার লোক ও কাজের লোক নিয়ে আসা হয়েছে। সুতরাং ঝর্নামাসির এখন কোনও তাড়া নেই।

আমি যতক্ষণ ওঁর সামনে বসে থাকতে পারি, ততই তো ভাল। কিন্তু সংকোচও হয়। বেশি বেশি কথা বলে ফেলছি না তো? কিংবা হঠাৎ যদি গায়ে প্রেমের ফোঁড়া ফুটে বেরোয়।

ঝর্নামাসি আমার একেবারে আপন মাসি নয়। মাসতুতো মাসি, অর্থাৎ মায়ের মাসতুতো বোন। কিন্তু বিবাহিতা মাসতুতো মাসিদের প্রেমে পড়াও নিষিদ্ধ।

—আচ্ছা ঝর্নামাসি, তোমার পাহাড় ভাল লাগে না সমুদ্র?

—দুটোই। কখনও পাহাড়, কখনও সমুদ্র।

আমি হাসতে লাগলুম।

ঝর্নামাসি তাঁর অপরূপ ভুরু দুটি তুলে বললেন, হাসছিস যে?

—এত সহজ উত্তর দিলে? আমি হলে কী বলতুম জানো?

—কী?

—ভাইজাগ?

—তার মানে?

—ভাইজাগ মানে দক্ষিণ ভারতের বিশাখাপত্তনম, সেখানে পাহাড় আর সমুদ্র এক সঙ্গে দেখা যায়। পাহাড়ের ওপর দাঁড়ালেই পায়ের তলায় সমুদ্র।

—ওঃ, তা হলে তো আমরা যেখানে থাকি, সেই সানফ্রান্সিসকোও একই রকম। সেখানেও পাহাড় আছে। আর সমুদ্র তো আছেই। কিংবা ভ্যাংকুভার আরও চমৎকার।

www.amarboi.com

—তাই বুঝি?

—নীলু, তোর ওদেশে যেতে ইচ্ছে করে না?

এর উত্তর নীললোহিত সহসা দিতে পারে না।

একটুক্ষণ চুপ করে সে আপনমনে বলে ওঠে, ইচ্ছা সম্যক জগদরশনে কিন্তু পাথেয় নাস্তি। দু'পায়ে শিকলি, মন উড়ুউড়ু, এ কী দৈবের শাস্তি।

ঝর্নামাসি বললেন, এর মানে কী হল?

নীললোহিত বলল, এটা রবীন্দ্রনাথের বড়দা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা। আমার একটু ভুলভাল হতে পারে। অর্থাৎ ইচ্ছে তো সারা জগৎটাই ঘুরে ঘুরে দেখা, কিন্তু ভাড়ার টাকা জোগাড় হবে কী করে? তাই মন উড়ুউড়ু হলেও দু'পায়ে শিকল বাঁধা।

ঝর্নামাসি বললেন, বাজে কথা! ঠাকুর বাড়ির বড় ছেলে তাঁর ভাড়ার টাকা ছিল না? বললেই বিশ্বাস করতে হবে। আসলে উনি ছিলেন কুঁড়ের যম। বাড়ি থেকে বেরুতেই চাইতেন না। নীলু, তুই একটু চেষ্টা করলেই যেতে পারিস। আমরা তো রয়েছিই।

বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ার মতন নীললোহিতও যে একবার পশ্চিমের দেশগুলি ভ্রমণের সুযোগ পেয়েছিল, পেরিয়ে গিয়েছিল তিন সমুদ্র সাতাশ নদী, তা ঝর্নামাসি জানেন না। নীললোহিত জানাতেও চাইল না। তাতে তো তার যোগ্যতা বাড়বে না।

সে চুপ করে রইল।

ঝর্নামাসি বললেন, ওখানে প্রায়ই একটা কথা ভেবে আমার খুব কষ্ট হয়। তুই সিলিকন ভ্যালি-র নাম শুনেছিস? ক্যালিফোর্নিয়ায় একটা জায়গায় কম্পিউটার নিয়ে হাজার রকম ব্যবসা শুরু হয়েছে, বাইরে থেকে কত ছেলে সেখানে চাকরি পাচ্ছে। এখন দারুণ সুযোগ। ইন্ডিয়া থেকেও যাচ্ছে অনেকে। কিন্তু বাঙালিরা ..... বাঙালি যে নেই তা নয়, আছে, কয়েকজন বেশ উঁচু পোস্টেও আছে। কিন্তু তারা এত কম কেন? হায়দ্রাবাদ, ব্যাঙ্গালোর থেকে দলে দলে ছেলে-মেয়ে যাচ্ছে প্রতিমাসে। কমপক্ষে, পঞ্চাশ-ষাট হাজার ডলার রোজগার করছে বছরে। আর এখানে দেখছি, কত ছেলে মেয়ে বেকার। যদি কম্পিউটারের কিছুটা ট্রেনিং নেয়—

কোথায় কাস্পিয়ন হ্রদের মাছের ডিম, কই মাছের ডিম, পাহাড়-সমুদ্র, আর কোথায় কম্পিউটার। আজকাল যে-কোনও কথার মধ্যেই কম্পিউটার এসে যায়।

ঝর্নামাসি আবার বললেন, নীলু, তুই তো এমনি এমনি বসে আছিস, কলকাতায় দেখছি কত কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার, একটাতে ঢুকে যা। অন্তত ছ'মাস যদি ট্রেনিং নিতে পারিস, তারপর আমরা সব ব্যবস্থা করে দেব।

বেকার থাকার প্রধান গ্লানি এই যে, যে-কেউ যখন তখন উপদেশ দিতে শুরু করে।

কম্পিউটার শিখতে কি সবাই পারে? বিশেষ ধরনের মগজ লাগে না? আমি বরাবর অঙ্কে গাড্ডু পেয়েছি। বাঁশি দিয়ে কি লাঠির কাজ হয়?

আমি নিজেকে বাঁশি ভেবে ফেললুম? কীসের বাঁশি হে তুমি? সুর কোথায়? অঙ্কে

www.amarboi.com

ফেল করলেই কি যে-কেউ সুর লাগাতে পারে?

উপমাটা এভাবে বদলানো যেতে পারে, হাতে একটা ব্লেড নিয়ে কি মোষ বলি দেওয়া যায়? কিংবা, কাগজের নৌকো কি সমুদ্রে ভাসতে পারে? কিংবা, বনতুলসী দিয়ে কি দুর্গাপুজো হয়? কিংবা ... থাক, আর উপমার দরকার নেই।

কথা ঘোরাবার জন্য আমি জিজ্ঞেস করলাম, ঝর্নামাসি, তুমি সাঁতার জানো?

ঝর্নামাসি হেসে ফেলে বললেন, ওই একটা ব্যাপার আমি পারি না। ছোটবেলাতেই সাইকেল চালাতে শিখেছি। এখন তো ওদেশে রোজই গাড়ি চালাতে হয়। কিন্তু সাঁতারটা শেখা হয়নি। জলে আমার বড্ড ভয়। আমাদের ওখানে কত রকম সুইমিং পুল, সাঁতার শেখার অনেক সুবিধে। আমি জলে নামতেই পারি না। রণ আর টিনা এর মধ্যেই শিখে নিয়েছে। তুই হঠাৎ একথা জিজ্ঞেস করলি কেন?

নীললোহিতের তো বিশেষ কোনও গুণ নেই, তবে সে সাঁতারটা ভাল জানে। সাঁতারের প্রসঙ্গ টেনে এনে সে জানাতে পারে, কোনারকের সমুদ্রে সাঁতরিয়ে সে কত দূর গেছে, একবার চিলকায় নৌকো ডুবে যাওয়ায় সে একটা বাচ্চা মেয়েকে বাঁচিয়েছিল।

—তুই আমাদের এই পুকুরটা এপার ওপার করতে পারবি?

—স্বচ্ছন্দে। আজ দুপুরে চান করবার সময় দেখাব।

হঠাৎ খুব জোর একটা হুড়মুড় শব্দে বুক কাঁপিয়ে দিল।

প্রথমেই মনে পড়ে কোনও বিপদের কথা। কেউ পড়ে গেল? মায়ের মন ছুটে যায় ছেলে-মেয়েদের দিকে।

মনে হল, শব্দটা হয়েছে ছাদে। রণ আর টিনা ছাদে খেলতে যায়নি তো?

ঝর্নামাসির সঙ্গে আমি ছুটে গেলাম ছাদে। রবীনমেসোও কম্পিউটার সাধনা ফেলে উঠে এসেছেন।

না, ছেলে-মেয়েরা নেই এখানে।

ছাদে একটা ছোট্ট ঘর আছে। এককালে হয়তো পুজোর ঘর ছিল। এখন পুজো-টুজো কিছু হয় না। সেই ঘরের দেওয়ালের অনেকগুলি চাঙর সমেত ভেঙে পড়েছে একটা জানলা।

হঠাৎ শুধু একটা জানলা কেন ভেঙে পড়ল, তা বোঝা গেল না। অবশ্য বহুদিন এ বাড়ি মেরামত হয়নি।

রবীনমেসো বললেন, নাঃ, এ বাড়ি আর রাখা যাবে না।

॥ ২ ॥

গত কয়েক বছরে এ রকম বাড়ি আমি দেখেছি বেশ কয়েকটি।

দু'তিন পুরুষ আগে কেউ শখ করে গ্রামের মধ্যে বানিয়েছিলেন এত বড় বাড়ি। এখন গ্রামীণ-জীবন বদলে গেছে। শিক্ষিত লোকেরা কেউ গ্রামে থাকে না। থাকবেই বা কেন। গ্রামে ভাল জীবিকার কোনও ব্যবস্থা নেই। জমিদারির আয়ও নেই। এ

www.amarboi.com

কালের বংশধররা অনেকেই পাড়ি দিয়েছে ইওরোপ-আমেরিকায়।

রবীনমেসোর বাবা প্রথম গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন কলকাতায়, এখন বাবা-মা দু'জনেই পৃথিবী পরিত্যাগ করেছেন। এক কাকা রেলে চাকরি করতেন, রিটায়ার করার পর গ্রামের বাড়িতে থাকছিলেন। পাঁচ মাস আগে তিনিও চোখ বুঁজেছেন। বৃদ্ধা কাকিমার পক্ষে একা এই এতবড় বাড়িতে থাকা সম্ভব নয়, তিনি দেরাদুনে তাঁর ছোট ভাইয়ের কাছে কাটাতে চান বাকি জীবন। ওঁরা নিঃসন্তান।

বাড়ির মালিক এখন রবীনমেসো।

তিনি থাকেন চোদ্দ হাজার মাইল দূরে। এ বাড়িতে শেষবার এসেছিলেন আট বছর আগে। এর মধ্যে কয়েকবার কলকাতা ঘুরে গেলেও সময় পাননি গ্রামে আসার।

এবারে বাড়িটার একটা ব্যবস্থা করে যেতে হবে। এ বাড়ি থেকে কোনও উপার্জন নেই, শুধু ব্যয়। মালি ও দারোয়ানের মাইনে গুনতে হবে। পূর্ব-পুরুষদের যে সব জমি-টমি ছিল তা জবর দখল হয়ে গেছে অনেক আগেই, শুধু পড়ে আছে বাড়িটা।

বাগানে দাঁড়িয়ে বাড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার মনে হয়, প্রত্যেক পুরনো বাড়িরই নিজস্ব কিছু গল্প থাকে। অনেক হাসি-কান্না-শোক এবং রহস্য। এ বাড়িটার গল্প শোনাবার মতন এখন শুধু একজনই আছেন, রবীনমেসোর কাকিমা। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমার ভাল করে আলাপই হয়নি।

আরও মনে হয়, এ দেশে এখনও কত মানুষের মাথা গোঁজার আশ্রয় নেই, আবার কারুর কারুর কাছে বাড়িও একটা অবান্তর বোঝা।

বাড়িটাও যেন বুঝতে পারছে, তাকে আর কেউ চায় না। সেই জন্যই কি নিজে থেকে একটা জানলা ভেঙে ফেলে দিল?

রবীনমেসোদের কলকাতার পুরনো বাড়ি ভেঙে ফ্ল্যাট বাড়ি হয়েছে ভবানীপুরে, সেখানে নিজেদের একটা ফ্ল্যাট রেখে দিয়েছেন। সানফ্রানসিসকোতে ওঁদের চমৎকার বাড়ির ছবি আমি দেখেছি। তা ছাড়াও পাওলো আলটো নামে একটা শহরে একটা স্টুডিয়ো ফ্ল্যাট কিনে রেখেছেন, সেখানে রবীনমেসোকে প্রায়ই কাজে যেতে হয়। বারবার হোটেলে ওঠার চেয়ে নিজস্ব ফ্ল্যাটে থাকা অনেক সুবিধেজনক। ছেলে-মেয়েরা কেউ আর এদেশে থাকতে আসবে না, তা জানা কথা।

তা হলে বাড়িটা বিক্রি করে দেওয়াই সবচেয়ে স্বাভাবিক।

কিন্তু কিনবে কে? রেলস্টেশন থেকে পাঁচ মাইল দূরে। এত বড় জগদ্দল বাড়ি কেনার মতন লোক কোথায়? কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েও সাড়া পাওয়া যায়নি। দু'পাঁচ দিনের জন্য গ্রামের পরিবেশে এমন বাড়িতে বেড়াতে এলে ভাল লাগতে পারে। কিন্তু আর কোনও উপযোগিতা নেই।

বাড়িটার জন্য আমার মন কেমন করে।

এ বাড়ি সম্পর্কে আমার কোনও স্মৃতি থাকার প্রশ্নই ওঠে না, পুরনো আমলের কোনও গল্পও জানি না। তবু মনে হয়, আহা রে। এককালে এই বাড়ি কত মানুষকে আশ্রয় দিয়েছে। এখন সে একেবারে পরিত্যক্ত হবার অপেক্ষায়।

বাড়িটার গল্প শুরু হল সন্ধেবেলায়। ভূতের গল্প।

www.amarboi.com

ঝর্নামাসি কিংবা রবীনমেসো, কার কৃতিত্ব জানি না। কিন্তু ছেলে মেয়ে দুটিকে ওঁরা ভাল বাংলা শিখিয়েছেন। অন্যরকম উচ্চারণে যখন ওরা বাংলা বলে, তখন শুনতে ভারী মিষ্টি লাগে।

সিঁড়ি দিয়ে রণকে নামতে দেখে জিজ্ঞেস করলুম, হাই রণ! কেমন লাগছে এখানে?

রণ গম্ভীর ভাবে বলল, ভিচ্ছিড়ি গড়ম!

বিকেল থেকে শিরশিরে হাওয়া দিচ্ছে, আমার গায়ে পাতলা সোয়েটার, রণ পরে আছে হাফ প্যান্ট আর টি-শার্ট। আমার শীত করছে, ওর গরম লাগে!

টিনার উচ্চারণ আর একটু বিশুদ্ধ।

সেও সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে আমায় জিজ্ঞেস করল, নীলু আংক্‌ল, তুমি কি জানো কেন গডেস দুর্গার দশখানা হাত আর গডেস কালীর চারখানা হাত মোটে?

ছোটদের কাছে নিজের অজ্ঞতার পরিচয় দেওয়াটা এক বিড়ম্বনা। সত্যিই তো, দুর্গা আর কালী দু'জনেই লড়াকু দেবী, তবু একজনের দশখানা হাত আর একজনের কেন মাত্র চারখানা, তা ভেবে দেখিনি। ছোটবেলা থেকে এরকমই দেখে আসছি। কিন্তু ওরা সব কিছু যুক্তি দিয়ে বুঝতে চায়।

চট করে যে বানিয়ে কিছু উত্তর দেব, তাও মাথায় এল না।

টিনা আবার জিজ্ঞেস করল, গডেস দুর্গা একটা সিংহর ওপর চাপে, গডেস কালী কেন মানুষের ওপর চাপে?

রণ গম্ভীর ভাবে বলল, গডেস কালী খুব গড়িব। ক্যান্ট অ্যাফোর্ড আ পেট।

ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত করবার জন্য কেউ এদের রামায়ণ-মহাভারত ও ঠাকুর দেবতাদের গল্প শুনিয়েছে। তাতে দেখছি আমারই বিপদ!

ছোট ছেলেটি কালী ঠাকুরকে শুধু গরিব ভেবেছে, নুডিস্ট কলোনির মেম্বার যে বলেনি, এই যথেষ্ট।

একতলার ডাইনিং হলে সন্ধেবেলা সবাই মিলে বসা হয়।

ঝর্নামাসির কাছে শুনেছি, ওদেশে ওঁরা সাড়ে ছ'টা-সাতটার মধ্যে রাত্তিরের আহার সেরে ফেলেন, এখানে এসে রবীনমেসো বাঙালি সেজেছেন। পাজামা, পাঞ্জাবি পরেন, আর রাত এগারোটার আগে খেতে চান না। বাচ্চারা অবশ্য এক নিয়মেই চলে।

এখন চায়ের পর্ব। চায়ের সঙ্গে টা, অর্থাৎ ফুলকপির সিঙারা কিংবা মুড়ি-বেগুনি। ছেলেমেয়েদুটি ওসব একদম পছন্দ করে না, তাদের জন্য প্যাকেট প্যাকেট মিষ্টি বিস্কুট আর কেক আনা হয়েছে।

রবীনমেসো গর্ব করে বলেন, ওদেশে গেলে সব বাঙালিরই নাম বদলে যায়। সৌমিত্র হয় স্যাম, অর্জুন হয় জর্জ। কিন্তু সাহেব-মেমরা ওঁকে রবীন বলেই ডাকে।

এ কৃতিত্ব অবশ্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নয়, তাঁর নাম এখন আর ক'জনই বা মনে রেখেছে, যে ক'জন জানে, তারাও শুধু বলে টেগোর। রবিনহুড নামে দস্যুটির সুবাদেই সাহেব-মেমরা রবিন উচ্চারণ করতে পারে। ওই নামে একটা পাখিও আছে।

www.amarboi.com

চায়ে চুমুক দিয়ে রবীনমেসো বললেন, নীলু, আমার ছেলেমেয়েরা তো আর থাকতে চাইছে না এখানে, দু'একদিনের মধ্যে ফিরতেই হবে। বাড়িটার কী বন্দোবস্ত করা যায় বলো তো?

রণ আর টিনাকে আমি অনেকবারই বলতে শুনেছি, ওদের ইন্ডিয়া আর ভাল লাগছে না, ওরা বাড়ি ফিরে যেতে চায়।

ঝর্নামাসি বলেছিলেন, সে কীরে, এখানেই তো আমাদের বাড়ি। এটা আমাদের দেশ।

তাতে ওদের দু'জনের ঘোর আপত্তি।

ছেলেমেয়ে দুটি জন্মেছে আমেরিকায়, জন্মসূত্রে ওরা আমেরিকার নাগরিক, সুতরাং সানফ্রান্সিস্কোর বাড়িটাকেই ওরা নিজেদের আসল বাড়ি ভাববে, এটাই স্বাভাবিক।

একটু আগে দোতলার বাথরুমে গরম জল পাঠানো হয়েছে। সুতরাং গা-টা ধুয়ে ঝর্নামাসির নীচে নামতে কিছুটা দেরি হবে।

আমি বললুম, কেউ কিনতে চাইছে না, তা হলে বরং বাড়িটা দানই করে দিন।

আমার চোখের দিকে তাকিয়ে ধমকের সুরে তিনি বললেন, এখনও সিগারেট টানা ছাড়তে পারলে না? আমিও চেইন স্মোকার ছিলাম, এককথায় ছেড়ে দিয়েছি এগারো বছর আগে। বাচ্চাদের সামনে ... প্যাসিভ স্মোকিং-এ কত ক্ষতি হয় জানো?

সঙ্গে সঙ্গে অনুতপ্ত ভঙ্গিতে আমি উঠে গিয়ে জানলা দিয়ে ফেলে দিলাম আধখানা জ্বলন্ত সিগারেট।

ফিরে এসে চেয়ারে বসার পর রবীনমেসো জিজ্ঞেস করলেন, কাকে? তুমি চাও? তোমাকেই দান করতে পারি।

আমি আঁতকে উঠলুম। জুতো মেরে গোরুদান বলে একটা কথা আছে না? এক জমিদার একটা গরিবের ছেলেকে একটা হাতি উপহার দিয়ে কী বিপদে ফেলেছিলেন, সেরকমও গল্প আছে।

মুখে হাসি এনে বললুম, কী যে বলেন, আমি এত বড় বাড়ি নিয়ে কী করব? বরং যদি এখানে হাসপাতাল কিংবা কলেজ করা যায়, আপনার মায়ের নামে হতে পারে—

তাচ্ছিল্যের সুরে রবীনমেসো বললেন, ওসব কথা শুনতেই ভাল লাগে। এদেশের মানুষদের আমি চিনি না? যদি গভর্নমেন্টকে হাসপাতাল কিংবা স্কুল-কলেজ বানাবার জন্য দিই, নেবে, কিন্তু কিছু করবে না, ফেলে রাখবে! ও সবের জন্য ইনফ্রাস্ট্রাকচার লাগে না? রাস্তা বানাতে হবে, স্টাফদের মাইনে কে দেবে? আর মেইনটেনান্স, তার কোনও সেন্সই নেই এখানকার লোকদের। যে সব হাসপাতাল আর কলেজ এখনই আছে, সেগুলোই মেইনটেনান্সের অভাবে কী বিশ্রী অবস্থা, দেখলে ঘেন্না লাগে, তার ওপর একটা নতুন ... কিচ্ছু করবে না, আমার ফোরফাদার্সের এমন সুন্দর বাড়িটা ওদের হাতে পড়লে একেবারে ধ্বংস হয়ে যাবে!

কথাগুলো একেবারে মিথ্যে নয়, তাই প্রতিবাদের ভাষা খুঁজে পাই না।

www.amarboi.com

রণ বলল, বাবা, এ বাড়িটা ভেঙে একটা অ্যামিউজমেন্ট পার্ক বানিয়ে দাও!

রবীনমেসো বললেন, এত বড় বাড়ি ডেমোলিশ করতেই অনেক খরচ লাগে। পার্ক বানিয়ে দিলেও সেই একই প্রবলেম, কে নেবে মেইনটেনান্সের দায়িত্ব? বারো ভূতের আড্ডা হবে।

রণ জিজ্ঞেস করল, হোয়াট ইজ বাড়ো ভূট?

রবীনমেসো বললেন, জাঙ্কিস অ্যান্ড হুডলামস।

আমেরিকান ছেলেমেয়েদের মতো তো নয়ই, এমনকী হিন্দি ফিল্মের বাচ্চাদের মতোও রণ আর টিনা বাপ-মাকে ড্যাডি-মামি বলে না, পরিষ্কার বাবা আর মা।

টিনা বলল, বাবা, আই হ্যাভ ওয়ান সাজেশান। এ বাড়িতে দুর্গা ঠাকুর আর কালী ঠাকুরের দুটো ইমেজ বসিয়ে মন্দির করে দাও। অনেক লোক আসবে।

আমি অতটুকু মেয়ের বুদ্ধির প্রাখর্যে চমৎকৃত হয়ে গেলুম। এই ক'দিনেই ঠিক বুঝে ফেলেছে তো! এদেশে মন্দির কখনও খালি পড়ে থাকে না। যত দুর্গম জায়গাতেই হোক, ঠিক জনসমাগম হয়। তত্ত্বাবধান করার লোকও জুটে যায়। মন্দির থেকে আয়ও হতে পারে যথেষ্ট।

রণ বলল, গডেস ডুর্গা আর গডেস কালীর মড্যে যদি ফাইট হয়, কে জিটবে?

আমার দিকে তাকাতেই আমি বললুম, সে যুদ্ধ অনন্তকাল চলবে।

এই সময় সুগন্ধ ছড়িয়ে ঘরে ঢুকলেন ঝর্নামাসি।

সদ্য স্নান করে এসেছেন, চোখদুটো ভেজা ভেজা, পিঠের ওপর একরাশ খোলা চুল। যেন অসহ্য সুন্দর।

সুন্দর কি অসহ্য হতে পারে? কোনও কোনও সুন্দরকে দেখলে বুক ব্যথা করে তো বটেই।

ঝর্নামাসি প্রথমেই বললেন, এ বাড়িতে ভূত আছে।

রণ সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করল, বাড়ো ভূট?

তাকে অগ্রাহ্য করে ঝর্নামাসি বললেন, ওপরের বাথরুমের জানলা দিয়ে পুকুরঘাটটা পরিষ্কার দেখা যায়। একটি ঘোমটা দেওয়া মেয়ে ঘাটের সিঁড়িতে খানিকক্ষণ চুপ করে বসে ছিল। একটু পরে সে জলে নেমে গেল একটু একটু করে, তারপর ডুব দিল, আর উঠল না। আমি তাকিয়ে রইলুম, উঠলই না!

রবীনমেসো বললেন, হোয়াট ননসেন্স! গ্রামের মেয়েরা এই পুকুরে চান করতে আসে।

ঝর্নামাসি বললেন, কালকেও ঠিক এটাই দেখেছিলুম, ঠিক এই সময়ে। তখন আমিও ভেবেছিলুম, কেউ চান করতে এসেছে। যদিও শীতকালের সন্ধেবেলা এখানে কেউ পুকুরে নামে কি না ... পরপর দু'দিন একই ব্যাপার, ডুব দিয়ে আর উঠল না।

রবীনমেসো বললেন, হোয়াট ডু ইউ মিন, আর উঠল না? সাঁতরে দূরে চলে গেছে, তুমি দেখতে পাওনি।

ঝর্নামাসি বললেন, গ্রামের কোনও মেয়ে আমাদের ঘাটে আসবে কী করে? মোটেই আমি চোখে ভুল দেখিনি। কোনও মানুষ ও ভাবে জলে ডুব দেয় না।

www.amarboi.com

—ভূত তো আছেই এ বাড়িতে।

সবাই ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালুম।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন এক বৃদ্ধা। অন্তত পঁচাত্তর বছর বয়েস হবে, ছোটখাট চেহারা, টুকটুকে ফর্সা রং, মাথার চুলও একেবারে সাদা। রবীনমেসোর কাকিমা।

দু'পায়ে আথ্রাইটিস। তাই হাঁটেন একটা লাঠিতে ভর দিয়ে। কথা বলেন আস্তে আস্তে, বেশ মিষ্টি কণ্ঠস্বরটি। ঠুক ঠুক করে এগিয়ে এলেন।

সাধারণত ওঁর খাবার দাবার ওঁর ঘরেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়। নীচে নামেন কদাচিৎ। আজ ওঁকে চা পাঠিয়ে দেবার আগেই উনি নিজে নেমে এসেছেন।

রবীনমেসো উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, কাকিমা আসুন, আসুন।

ঘরের সকলের দিকে চোখ বুলিয়ে বৃদ্ধা দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন আমার মুখের ওপরে।

ঝর্নামাসি বললেন, কাকিমা, এ আমার এক দিদির ছেলে নীলু। ওকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি—

আমি নিচু হয়ে বৃদ্ধার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলুম।

তিনি আমার গালে একটি হাত ছোঁয়ালেন। কী ঠাণ্ডা সেই হাত!

॥ ৩ ॥

চেয়ারে বসার পর, লাঠিটা পাশে রেখে বৃদ্ধা নাতি-নাতনিদের দিকে তাকিয়ে বললেন, টিনা অ্যান্ড রণ, হাউ আর ইউ টুডে? এনজয়িং ইয়োরসেল্ফ!

এরকম বৃদ্ধার মুখে ইংরিজি শুনলে প্রথমে আশ্চর্য লাগেই।

তবে, স্ত্রী-শিক্ষা তো কম দিন শুরু হয়নি! ইনি অনেককাল আগের গ্র্যাজুয়েট, কিছুদিন বেথুন স্কুলেও পড়িয়েছেন। এখন চোখে ভাল দেখতেও পান না।

ঝর্নামাসি উতলা হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কাকিমা, আপনি নিজে কিছু দেখেছেন?

কাকিমা বললেন, এ বাড়ির দুটো ব্যাপার আগেই তোমাদের বলে দেওয়া উচিত ছিল। প্রথমটা হল—

রবীনমেসো বাধা দিয়ে বললেন, রণ আর টিনা, গো টু ইয়োর রুম! ছোটদের সামনে এসব আলোচনা করা ঠিক নয়।

টিনা লক্ষ্মী মেয়ের মতো উঠে দাঁড়ালেও রণ বলল, আমি বাড়ো ভূটের কঠা শুনব!

কাকিমা বললেন, লেট দেম স্টে। দে শুড অলসো নো।

ঝর্নামাসি বললেন, কাকিমা, ওরা দু'জনেই বাংলা বোঝে। আপনি বাংলাতেই বলুন।

কাকিমা বললেন, হ্যাঁ, দুটো জিনিস। একটা হল, বাস্তু সাপ।

রণ বলল, সাঁপ মানে জানি, স্নেক। হোয়াট বাস্টু সাঁপ? র‍্যাট্‌ল স্নেক?

ঝর্নামাসি বললেন, আঃ রণ, মাঝখানে কথা বোলো না। আগে সবটা শুনতে দাও।

www.amarboi.com

কাকিমা বললেন, বাস্তু সাপ মানে বাড়ির সাপ। একতলায় রান্নাঘরের নীচে গর্তের মধ্যে একটা সাপ আছে। খুব লম্বা। সেটা মাঝে মাঝে উঠোনে ঘুরে বেড়ায়। তোমরা দেখলে ভয় পেও না।

রবীনমেসো বললেন, বাড়ির মধ্যে সাপ? সেটা মারা হয় না কেন?

কাকিমা বললেন, বাস্তু সাপ মারতে নেই, সবাই তো বলে। সাপটাকে আমি দেখেছি অনেকবার, কামড়ায় না, তেড়েও আসে না। তবে এত বড় যে দেখলে ভয় লাগবেই নতুন লোকদের। বাড়িতে ওরকম সাপ থাকলে আর অন্য সাপ আসে না। ছুঁচো-ইঁদুর থাকে না।

রণ বলে উঠল, সুঁচো কী?

টিনা বলল, সুঁচো না, ছুঁচো। ইঁদুরের ভাইকে বলে ছুঁচো, তাই না মা?

রণ বলল, আর ইঁডুড়? র‍্যাট না মাউজ?

ঝর্নামাসি বললেন, দুটোই। কাকিমা, আর একটা কী?

কাকিমা বললেন, আর একটি মেয়েকেও মাঝে মাঝে দেখতে পাবে হয়তো, সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসে হঠাৎ হঠাৎ, পুকুরধারে বসে থাকে। আমি ভূত-টুত বিশ্বাস করতাম না কখনও। কিন্তু এ বাড়িতে নিজের চোখে দেখেছি।

ঝর্নামাসি শিউরে উঠে বললেন, বাড়ির মধ্যেও আসে?

—হ্যাঁ, ছাদে দেখেছি। সিঁড়ি দিয়ে নামে, আর পুকুরঘাটে কেউ তো সন্ধের পরে যায়ই না! প্রায়ই বসে থাকে ওখানে।

—আপনি ভয় পাননি?

—প্রথম প্রথম বুকটা কেঁপে উঠত ঠিকই। এখন গা-সহা হয়ে গেছে। কিছু ক্ষতি তো করে না।

—আপনি কখনও কথা বলার চেষ্টা করেছেন তার সঙ্গে?

—না বলিনি। কয়েক পলকের মধ্যেই তো মিলিয়ে যায়। এ বাড়ির বিশু মালি, সে-ই সবচেয়ে পুরনো লোক। বিশু বলে যে, আমার শ্বশুরমশাইয়ের এক শালি, তার নাম ছিল রমলা, সে একবার এখানে বেড়াতে এসে আত্মহত্যা করেছিল। তখন তার বয়েস তেইশ না চব্বিশ, সেই রমলাকেই নাকি দেখা যায়।

রবীনমেসো বললেন, হ্যাঁ, এরকম একটা আমিও শুনেছি ছেলেবেলায়।

ঝর্নামাসি বললেন, কই আমাকে তো আগে বলোনি?

রবীনমেসো বললেন, রমলা নামে একজন এখানে বেড়াতে এসে আত্মহত্যা করেছিল, তা শুনেছি। কিন্তু সে যে ভূত হয়ে ফিরে আসে, তা তো জানতুম না!

কাকিমা বললেন, তোমার কাকা যখন মারা যান, তখন সে শিয়রের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। বেশ মিষ্টি মুখখানা। কিছু যেন বলতে চাইছিল আমাকে। কিন্তু তক্ষুনি মিলিয়ে গেল। লোকে তো বলে, ওরা বেশিক্ষণ শরীর ধারণ করতে পারে না।

রবীনমেসো বললেন, অটো সাজেশান! কেউ আত্মহত্যা করলে লোকে ধরেই নেয় যে সে ভূত হবে! ওই গল্প শুনতে শুনতে তারপর লোকে তার ভূত দেখতে শুরু করে। তার মানে, যে দেখে, সেই-ই ভূতটাকে তৈরি করে। ভূত বলে সত্যি কিছু হয়

www.amarboi.com

নাকি?

ঝর্নামাসি বললেন, আমি স্পষ্ট দেখলুম, একটি মেয়ে পুকুরঘাটে বসেছিল, তারপর জলে নেমে গেল, আর উঠল না!

কাকিমা বললেন, জলে ডুবেই তো সে মরেছিল। বিশুর মুখে শুনেছি, তার শরীরটা ভেসে উঠেছিল একদিন পরে।

ঝর্নামাসি জ্বলন্ত চোখে স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন, দেখলে, দেখলে! আমি বাজে কথা বলিনি। এখানে কোনও মেয়ের জলে ডুবে আত্মহত্যার কথাও আমি শুনিনি আগে।

রবীনমেসো বললেন, হয়তো শুনেছিলে। বিয়ের পর যখন আমরা ব্যাঙ্গালোরে থাকতাম, তখন আমার দিদি প্রায়ই আসত! দিদি অত গল্প করে, আর এ কথাটা বলবে না? তোমার অবচেতনে, মানে সাব-কনসাস লেভেলে কোথাও ছিল!

ঝর্নামাসি বললেন, তুমি ফিজিসিস্ট। সাইকোলজিস্ট নও, তোমার ব্যাখ্যা আমি মানতে রাজি নই। আমি নিজের চোখকে অবিশ্বাস করব কী করে?

রবীনমেসো আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, কীহে নীলুচন্দর, তুমি কিছু বলছ না যে! তুমি ভূত বিশ্বাস কর?

আমি বললুম, আমি একদম বিশ্বাস করি না, তবু আমার ভূত দেখতে খুব ইচ্ছে করে।

—তার মানে? বিশ্বাস করো না, অথচ দেখতে চাও মানে?

—অন্য লোক কী দেখে, তা আমার জানতে ইচ্ছে করে। একটি মেয়ে আত্মহত্যা করেছে শুনলেই জানতে ইচ্ছে করে, কেন সে আত্মহত্যা করল! কেন সে ভূত হয়ে ঘুরে বেড়ায়? সে কি কিছু বলতে চায়? কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই, আমি অনেক ভূতের বাড়িতে একা একা থেকেছি। কিন্তু ভূতেরা কিছুতেই আমাকে দেখা দিতে চায় না। আমাকে তারা গ্রাহ্যই করে না!

টিনা হঠাৎ বলে উঠল, রমলা ওয়াজ মার্ডার্‌ড!

রণ বলল, হোয়াট লাইজ বিনিথ! ওকে গলা টিপে মেড়ে পুকুরে ফেলে ডিয়েছে!

ঝর্নামাসি দারুণ অবাক হয়ে বললেন, অ্যাঁ? ওটা বড়দের ফিল্ম। তোরা দেখলি কী করে?

টিনা খুক খুক করে হাসতে হাসতে বলল, আমার স্কুলের বন্ধু অ্যানিদের বাড়িতে ক্যাসেট আছে। ও দেখতে বলল—

রণ বলল, আমিও ডেখেছি।

রবীনমেসো বললেন, বাচ্চাদের কাছে কিছুই লুকোবার উপায় নেই। আমরা সারাদিন বাড়ি থাকি না, অনেক উইকএন্ডে পার্টি থাকে। বাড়িতে অ্যাডাল্ট ফিল্মের ক্যাসেট রাখলে ওরা তো দেখে নিতেই পারে।

ঝর্নামাসি বকুনি দিয়ে বললেন, টিনা, রণ, আর কক্ষনও এসব দেখবে না।

দেখবে না!

রবীনমেসো বললেন, 'হোয়াট লাইজ বিনিথ' একটা জনপ্রিয় ভূতের সিনেমা। ভূত

www.amarboi.com

আর ভায়োলেন্স দুটোই আছে। একজন লোক, বেশ শিক্ষিত লোক, একটি মেয়েকে গলা টিপে মেরে বাড়ির পাশের লেকের জলে ডুবিয়ে দিয়েছিল। তারপর সে আর একটি মেয়েকে বিয়ে করে আনে। তখন সেই আগেকার মেয়েটির ভূত জল থেকে উঠে এসে—

ঝর্নামাসি বললেন, থাক, আর বলতে হবে না।

রবীনমেসো বললেন, জানো নীলু, এই আমেরিকানরা একটা অদ্ভুত জাত! একদিকে এরা বিজ্ঞানে এত উন্নতি করেছে, চাঁদে মানুষ নামিয়েছে কয়েকবার, মানুষের শরীরের জেনেটিক ম্যাপ তৈরি করছে, আবার এরাই ভূতের গল্পের সিনেমা ভিড় করে দেখতে আসে। ভূত, জন্মান্তর, পরলোক এইসব নিয়ে অনেক ফিল্ম হয়।

ঝর্নামাসি বললেন, ওসব কথা ছাড় তো! সাপ আর ভূত নিয়ে এ বাড়িতে আমরা আর ক'দিন থাকব?

রবীনমেসো বললেন, সাপটার একটা ব্যবস্থা করা যেতে পারে। বেশি ভূত ভূত কোরো না তো! এমনিতেই বাড়িটা বিক্রি করার লোক পাওয়া যাচ্ছে না—

ঝর্নামাসি বললেন, বিক্রি করার লোক নয়, কেনার লোক। বিক্রি করার লোক তো তুমি।

রবীনমেসো বললেন, ওই একই হল। বাংলায় ভুল ধরো না। একবার ভূতের বাড়ি বলে নাম রটে গেলে কেউ আর এর ধারও ঘেঁষবে না।

—আমি ছেলেমেয়ে নিয়ে এখানে আর থাকতে চাই না। কালই এখান থেকে ফেরার ব্যবস্থা করো!

—টুবলুকে সোমবার একটা গাড়ি ভাড়া করে আনতে বলেছি। তার আগে এখান থেকে ফিরব কী করে?

—কেন, এখান থেকে গাড়ি ভাড়া করা যায় না।

কাকিমা বললেন, অত ভয়ের কিছু নেই। আমি তো এতদিন আছি। আমার এখানে থাকতে ভালই লাগে, কিন্তু তোমরা আর কতদিন পরে আসবে, আমি একা একা, কোনদিন মরে পড়ে থাকব, তাই চলেই যাব। বাড়ি বিক্রি করে দেওয়াই ভাল।

ঝর্নামাসি বললেন, নীলু, তুমি একটু খোঁজ নিয়ে দেখো না, যদি এখানে একটা গাড়ি পাওয়া যায়।

আমি বললুম, কাল সকালেই খোঁজ করব, নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। তার আগে আজ আমি একটা কাজ করতে চাই। রবীনমেসো, আপনার ক্যামেরাটা একবার দেবেন?

—হ্যাঁ, নাও না। কী করবে ক্যামেরা দিয়ে?

—ভূতের ছবি তুলব।

ঝর্নামাসি বললেন, যাঃ, তা হয় নাকি? ভূতের ছবি কখনও ওঠে না।

আমি বললুম, মানুষের চোখ যা দেখতে পায়, তা ক্যামেরার লেন্সে ধরা পড়তে

www.amarboi.com

বাধ্য।

রণ বলল, আমি ভূটের ছবি ডেখব।

টিনা বলল, নীলু আঙ্কল, আমিও থাকব তোমার সঙ্গে!

ঝর্নামাসি ধমক দিয়ে বললেন, চুপ কর তো! নীলু, ওসব ছেলেমানুষি করতে যেয়ো না। কীসের থেকে কী বিপদ হয়, বলা যায় না!

আমি বললুম, ঝর্নামাসি, আপনি সত্যিই বিশ্বাস করেন, মানুষ মরলে ভূত হয়? তিরিশ-চল্লিশ বছর আগে আত্মহত্যা করেছে একটি মেয়ে, সে আবার দেহ নিয়ে ফিরে আসতে পারে?

ঝর্নামাসি বললেন, না, কখনও সিরিয়াসলি বিশ্বাস করিনি। কিন্তু একটা কিছু যেন আছে। চোখে তো ভুল দেখিনি। তা ছাড়া অত বড় একটা সাপ ঘুরে বেড়াবে বাড়ির মধ্যে—

আমি বললুম, সাপের ব্যাপারে একটা গ্যারান্টি দিতে পারি। সাপটা এর মধ্যে বেরুবে না।

—কী করে তুমি গ্যারান্টি দেবে?

—বেশ শীত পড়েছে। শীতের মধ্যে কোনও সাপ গর্ত থেকে বেরোয় না। শীতকালে ওদের খিদেও পায় না।

রবীনমেসো বললেন, দ্যাট্স রাইট। আমার আগে মনে পড়েনি। ভূতরাও কি শীতের মধ্যে বেরোয়?

ঝর্নামাসি বললেন, আমি তো আজই দেখেছি!

আমি বললুম, খাওয়া দাওয়ার পর আমি পুকুরপাড়ে বসে থাকব। আমার অনেকদিন ধরে ভূত দেখার শখ। এখানে যখন সুযোগ পাওয়া গেছে...।

ঝর্নামাসি বললেন, খবরদার না! আমি তোমাকে অন্ধকারের মধ্যে পুকুরঘাটে যেতেই দেব না।

রবীনমেসো বললেন, কেন, যাক না। ও একটা এক্সপেরিমেন্ট করতে চাইছে।

ঝর্নামাসি বললেন, ওরকম এক্সপেরিমেন্টের কোনও দরকার নেই। তারপর নীলুর যদি কোনও বিপদ হয়—

রবীনমেসো আর ঝর্নামাসির মধ্যে তর্ক বেধে গেল এর পরে।

ঝর্নামাসি যত বার আমার বিপদের কথা বলছেন, ততই আমার শিহরন হচ্ছে। উদ্বিগ্ন হওয়াও তো ভালবাসার লক্ষণ। ঝর্নামাসি যদি না ঘুমিয়ে সারারাত ছটফট করেন আমার কথা ভেবে, তার চেয়ে আর আনন্দের কী হতে পারে?

আমি বললুম, ঝর্নামাসি, তুমি অত চিন্তা কোরো না। আমার কিচ্ছু হবে না। এখানে লোকে কী বলে জানো তো, বেকার ছেলেরা যমেরও অরুচি!

রবীনমেসো বললেন, নীলু, তুমি যদি সত্যিই ভূতের ছবি তুলতে পারো, তা হলে আমি তোমায় সানফ্রান্সিস্কোর একটা টিকিট দেব!

www.amarboi.com

॥ ৪ ॥

পুকুরঘাটটির দু'পাশে বাঁধানো বসবার জায়গা।

একটা কম্বল পেতে, আর একটা কম্বল গায়ে জড়িয়ে আমি বসলুম রাত সাড়ে দশটায়।

হাতে টর্চ, পাশে ক্যামেরা। আমেরিকান বাঙালিরা সিগারেট দেখলেই আঁতকে ওঠেন, এখানে নির্বিঘ্নে সিগারেট টানা যায়।

গ্রীষ্ম বা বর্ষাকাল হলে আমি এ দুঃসাহস দেখাতুম না, কারণ আমার সাপের ভয় আছে। চোর-ডাকাতদেরও আমি পছন্দ করি না, কারণ আজকালকার চোর-ডাকাতরা কথায় কথায় ছুরি চালায় কিংবা গুলি করে। শুনেছি আগেকার দিনে চোর-ডাকাতদেরও কিছু রীতিনীতি ছিল, চোরের সঙ্গে কোনও অস্ত্র রাখত না, ধরা পড়লে কান্নাকাটি করত। আর ডাকাতরা টাকা-পয়সা পেয়ে গেলে আর শুধু শুধু খুন-খারাপি করত না। রঘু ডাকাত নাকি এক জমিদারের সিন্দুক ভেঙে সর্বস্বান্ত করার পর জমিদারগিন্নিকে মা-জননী ডেকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বিদায় নিয়েছিল।

ডাকাত এলে দূর থেকেই টের পাওয়া যাবে। আর কোনও চুপি চুপি চোর এলে নির্ঘাত আমাকে দেখেই ভূত ভাববে। এমনকী কোনও ভূত এলেও প্রথমে আমাকেও আর একটি ভূত বলেই ধরে নেবে নিশ্চিত।

একেবারে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার যাকে বলে। ঝিঁঝির ডাক ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই। কুকুর থাকলে মুশকিল হত। এই পুকুরে পদ্মফুল ফোটে, দিনের বেলা দেখে গেছি, এখন কিছুই দেখা যায় না।

এত অন্ধকারে ভূত এলেও দেখব কী করে? ভূতদের কি পায়ের শব্দ হয়? ভূতের গল্পের সিনেমায় এমন সব ক্যাঁ কোঁ, ড্রিম ড্রিম, ঘ-র-র ঘর ধরনের ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক হয় যে অন্য কিছু শোনা যায় না।

রবীনমেসোর কাকিমা বলেছেন, রাত্তিরে তার ভাল ঘুম হয় না, যখন তখন জেগে ওঠেন, তিনি বেশ কয়েকবার মাঝরাত্রেও মেয়ে-ভূতটিকে দেখেছেন। সন্ধেবেলা সে যেমন পুকুরে ডুব দেয়, মাঝরাত্তিরে তেমন সে পুকুর থেকেই উঠে আসে।

জলে একবার শব্দ হতেই আমি চমকে উঠে টর্চ জ্বাললুম। কিছু নেই। মাছে ঘাই মেরেছে। পুরনো পুকুর, বেশ কিছু বড় বড় মাছ তো থাকারই কথা।

রমলা নামে একটি তরুণী মেয়ে এই পুকুরে ডুবে মরেছিল, এটা সত্য ঘটনা। আত্মহত্যা না খুন? সেকালের জমিদারবাড়িতে কতরকম কাণ্ডই না হত। অবৈধ প্রণয় থেকে আত্মহত্যা স্বাভাবিক ছিল, খুনও অস্বাভাবিক মোটেই নয়। বেড়াতে এসে কেন মরল মেয়েটি? সে কি বিবাহিতা না কুমারী? পুরোপুরি গল্পটা জানার জন্য সবারই কৌতূহল হয়।

আজ কি চাঁদ উঠবে না?

আকাশও দেখা যাচ্ছে না, তারা নেই, খানিকটা কুয়াশা কুয়াশা ভাব ছিল সন্ধে থেকেই।

www.amarboi.com

অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে খানিকটা খানিকটা অন্ধকার দলা পাকিয়ে যেন এক একটা মূর্তি হয়ে ওঠে। মনে হয়, সত্যিই কিছু দেখতে পাচ্ছি। অন্ধকারে কলাগাছ দেখে কত লোক ভেবেছে যেন কোনও ঘোমটা দেওয়া বউ। এখানে কলাগাছ নেই। দু'তিনটে বড় বড় গাছ, তাদেরও আলাদা করে বোঝা যাচ্ছে না, একটা জোনাকি পর্যন্ত নেই।

কোনও প্রয়োজন নেই, তবু টর্চ জ্বালছি মাঝে মাঝে।

আবার জলে একটা শব্দ।

অস্বীকার করার উপায় নেই যে চমক লাগেই। তিরিশ-চল্লিশ বছর আগে এই পুকুরে ডুবে-মরা একটি মেয়ে আবার জল থেকে উঠে আসবে, এটা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি না। তবু জলে শব্দ হলে প্রথমটা ভয়ের চমক লাগে কেন? বহুকাল সঞ্চিত ভয়। পূর্ব-পুরুষদের জিনবাহিত স্মৃতি!

আমি তো সত্যি সত্যি ভূত দেখব বলে শীতের রাত্রে এখানে এসে বসিনি! আমি জেদ করে এসেছি বলে ঝর্নামাসি কষ্ট পাচ্ছেন, তাতেই তো আমার আনন্দ। জোর করে মনোযোগ আদায় করে নেওয়া।

এটা আরও বড় মাছ ছিল। রাত্তিরবেলা বড় মাছগুলো ঘাটের অনেক কাছে চলে আসে। টর্চ জ্বেলে অবশ্য জলের গোল গোল রেখা ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না।

খুবই আশ্চর্যের কথা যে, মশা নেই। মশা কামড়ালে এতক্ষণ বসে থাকা যেত না। যতই কামান-বন্দুক বানানো হোক, মশা ও পিঁপড়ের মতো অতি ক্ষুদ্র দুটি প্রাণীর কাছে মানুষ এখনও জব্দ।

এমন নিস্তব্ধ রাত্রি বহুদিন অনুভব করিনি।

কোনও জন্তু-জানোয়ার খচর খচর শব্দ করলেও খানিকটা রোমাঞ্চ অনুভব করা যেত। শুধু ঝিঁঝির ডাক চলেছে অবিরাম। ঝিঁঝিরা ডাকে না, ডানার শব্দ করে, তাদের দেখতে পাওয়াও যায় না।

পুকুরের উল্টো পারে খানিকটা জঙ্গল মতো। ওদিকে আরও গ্রাম-ট্রাম নিশ্চয়ই আছে, দেখা হয়নি।

এখন আর গ্রামের দিকে শেয়ালের ডাকও শোনা যায় না।

যত মানুষ বাড়ছে, তত কমে যাচ্ছে জন্তু-জানোয়ার। কোনও এক সময় সব গাছপালাও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে?

এতক্ষণ পুরো বাড়ি অন্ধকার ছিল, হঠাৎ দোতলার ডানদিকের কোণের ঘরের আলো জ্বলে উঠল।

এখন কত রাত কে জানে, আমার ঘড়ি নেই। হয়তো বাচ্চারা হিসি টিসি করতে যাবে।

জানলায় কেউ এসে দাঁড়াল।

আলোটা পেছন দিকে জ্বলছে, তাই মুখ দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু শরীরের রেখা দেখে বোঝা যায় নারী মূর্তি। ঝর্নামাসি!

যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই, ঝর্নামাসি ঘুমোতে পারছেন না। আজ তিনি ওঁর

www.amarboi.com

স্বামীকে ধরে নাই-ই বা ঘুমোলেন।

রমলা নাম্নী তিরিশ-চল্লিশ বছর আগের মৃত মেয়েটিকে আমার ধন্যবাদ জানানো উচিত। তার গল্পের জন্যই তো আজ ঝর্নামাসিকে জাগিয়ে রাখা গেল!

আমি যে ঘুমিয়ে পড়িনি তা জানান দেবার জন্য তিনবার টর্চ জ্বাললুম।

যেন আলোর ভাষায় আমি কথা বলছি ঝর্নামাসির সঙ্গে। তিনি কি একবার জানলার বাইরে হাত বাড়ালেন? হাতছানি দিচ্ছেন আমাকে? ঠিক বোঝা গেল না।

আলো নিভে গেল একটু পরে।

এরপর শুরু হল আমার কল্পনার খেলা।

রবীনমেসো ঘুমিয়ে পড়েছেন নিশ্চিত। কারণ, সন্ধের পর তিনি তিন-চার পেগ হুইস্কি পান করেছেন। হুইস্কি পানের ফলে গাঢ় নিদ্রা হতে বাধ্য। বাচ্চাদেরও ঘুমিয়ে পড়াটা স্বাভাবিক। শুধু ঝর্নামাসি ঘুমোননি, তিনি পা টিপে টিপে বেরিয়ে এলেন বাইরে।

কাকিমার ঘরের দরজা বন্ধ। তার পাশ দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামছেন ঝর্নামাসি। পাতলা রাত-পোশাকের ওপর জড়িয়ে নিয়েছেন একটা শাল। যাতে কোনও শব্দ না হয়, তাই খুব সাবধানে নামছেন।

নীচে এসে একবার সভয়ে তাকালেন উঠোনের দিকে। সাপটার কথা মনে পড়ে গেছে। কিন্তু নীললোহিত তো তাঁকে আশ্বস্ত করেছে, এখন সাপ বেরুবে না।

বাগানের দিকে দরজাটা ভেজানো। সেটা খুলতে গেলে ক্যাঁচ করে একটা শব্দ হয়। শব্দটা হবার পর তিনি একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন নিঃসাড় হয়ে। না, কেউ শুনতে পায়নি, কেউ জেগে ওঠেনি।

এবারে বাগানের মধ্য দিয়ে দৌড়ে চলে এলেন ঝর্নামাসি।

নীললোহিত টর্চটা মাটির দিকে জ্বালল একবার।

ঝর্নামাসি তার পাশে বসে পড়ে ব্যাকুলভাবে বললেন, নীলু, তুমি এই শীতের মধ্যে ঠায় বসে আছ, তোমার এত কষ্ট হচ্ছে, আর আমি কি এই সময় বিছানায় শুয়ে ঘুমোতে পারি!

নীললোহিত বলল, না, না, ঝর্নামাসি, আমার কোনও কষ্ট হচ্ছে না।

ঝর্নামাসি বললেন, যথেষ্ট হয়েছে, আর বসে থাকতে হবে না, এবার ভেতরে চলো—

নীললোহিত বলল, আমার বসে থাকতে ভালই লাগছে বরং, কতরকম কথা মনে পড়ছে। তা ছাড়া সত্যিই যদি মেয়েটিকে দেখা যায়—

ঝর্নামাসি বললেন, তা হলে আমিও তোমার সঙ্গে বসে থাকব। সারারাত গল্প করব। ইস্, তোমার হাতটা দেখছি ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। ...

রমলা নামে মেয়েটি জল থেকে উঠে আসছে, এ কথা নীললোহিত যেমন একেবারেই বিশ্বাস করে না, তেমনই সে জানে, ঝর্নামাসি স্বামীর বিছানার পাশ থেকে উঠে আসবেন চুপি চুপি, সারারাত পুকুরঘাটে বসে গল্প করবেন, এটাও অবিশ্বাস্য।

তবু কল্পনা করতে দোষ কী?

www.amarboi.com

কল্পনাতেও নীললোহিত শালীনতার সীমা লঙ্ঘন করেনি। চুম্বন নেই। এমনকী ঝর্নামাসি তার কাঁধেও হাত রাখেননি, শুধু একটি হাত ছুঁয়েছেন। এরপর বড়জোর ওরা এক কম্বল ভাগাভাগি করে গায়ে দিয়ে কিছুটা উত্তাপ বিনিময় করতে পারে। সেটা এমন কিছু দোষের নয়।

কল্পনাটা যাতে তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে না যায়, তাই ভি সি আর-এ দেখা ফিল্মের মতো আমি বারবার রিওয়াইন্ড করতে লাগলুম।

ঝর্নামাসি আবার বিছানা থেকে উঠে আসছেন, শুধু পাতলা রাত-পোশাক পরা, শালটা নিতে ভুলে গিয়েছিলেন, সেটা গায়ে জড়িয়ে নিলেন, তারপর চুপি চুপি পা টিপে টিপে নামছেন সিঁড়ি দিয়ে ...

এরকম কল্পনার মধ্যে ডুবে থাকতে থাকতে আমার তন্দ্রা এসে গেল।

সেই ঘুমের মধ্যেও চলতে লাগল সুখস্বপ্ন। খানিকটা বদলও হল। ঝর্নামাসি নীললোহিতের কাঁধে মাথা রেখে কাঁদছেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। তাঁর জীবনের একটা গোপন কাহিনী আছে, সেটা তিনি শুধু নীললোহিতকেই জানাতে চান। নীললোহিতের একটা হাত...

হঠাৎ কীসের শব্দে আমার তন্দ্রা ভেঙে গেল।

সত্যিই বাড়ির দিক থেকে বাগানের পথে কারুর পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। আমি কান পেতে শুনলুম, হ্যাঁ, কেউ আসছে ঠিকই।

স্বপ্ন হল সত্যি?

ঝর্নামাসি আসছেন, আমার ইচ্ছের টানে? আমি উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপতে লাগলুম। যেন ভূত দেখার চেয়েও আরও অবিশ্বাস্য কিছু ঘটতে যাচ্ছে এক্ষুনি!

শুধু পায়ের শব্দ নয়, ঝর্নামাসি চাপা গলায় ডাকলেন, নীলু, নীলু!

আমি তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে টর্চ জ্বাললুম।

ঝর্নামাসি ঠিকই। এবং তাঁর পাশে রবীনমেসো!

রবীনমেসো শ্লেষ্মা আর ঘুমজড়ানো গলায় বললেন, যথেষ্ট হয়েছে, এবার চলো!

ঝর্নামাসি বললেন, নীলু, তুই এই শীতের মধ্যে এতক্ষণ বসে আছিস কী করে?

আমি বললুম, একটুও অসুবিধে হচ্ছে না। তোমরা শুধু শুধু এলে কেন?

রবীনমেসো বললেন, তুমি এখানে বসে আছ, আর তোমার মাসি আমাকে ঘুমোতেই দিচ্ছেন না।

আমি বললুম, আপনারা যান, আমি আর একটু থাকি। জলে বেশ শব্দ হচ্ছে। আমি দু'বার সাটার টিপেছি, ছবি উঠলেও উঠতে পারে।

রবীনমেসো বললেন, ধ্যাৎ, যত সব বাজে কথা!

ঝর্নামাসি বললেন, এই ঠাণ্ডার মধ্যে ... তোর জ্বর-টর হলে দিদির কাছে কী কৈফিয়ত দেব! মশার কামড় খেয়ে কেউ শুধু শুধু বসে থাকে!

আমি বললুম, মশা কিন্তু একদম নেই। আমার কেমন যেন ধারণা হয়েছে, কিছু একটা দেখা যাবেই?

রবীনমেসো বললেন, আর দেখে কাজ নেই! তোমার মাসি আমায় দোষ দিচ্ছেন,

www.amarboi.com

আমিই নাকি তোমাকে উস্কেছি। আমি ইয়ার্কি করছিলাম। তুমি যে সত্যি সত্যি এখানে এসে বসতে রাজি হবে—

ঝর্নামাসি আমার হাত ধরে নরম গলায় বললেন, এসো নীলু, লক্ষ্মীটি, আর দেরি কোরো না—

স্বপ্ন একেবারে মিথ্যে হয় না।

ঝর্নামাসি যে আমার হাত ধরলেন, সেটুকু তো সত্যি? তাতেই যেন আমার বাকি সাধগুলো পূরণ হয়ে গেল।

॥ ৫ ॥

সকালবেলা যে দুটি চমকপ্রদ খবর পাওয়া গেল, তার মধ্যে প্রথমটির ব্যাখ্যা পাওয়া শক্ত, আর দ্বিতীয়টা একেবারে পিলে চমকানো।

আমার ঘুম ভাঙতে দেরি হল বেশ।

শীতকালে ভোরের দিকেই ঘুমটা বেশি জমে, আর রোদ উঠে গেলেও কম্বলের তলা থেকে বেরুতেই ইচ্ছে করে না।

পেছন দিকের বাগানে টিনা আর রণের গলার আওয়াজ শুনে একসময় বুঝতে পারলুম, ভালই বেলা হয়েছে। ওরা বাগানে একটা বল নিয়ে খেলছে। রণ শট মারছে খুব উঁচু উঁচু করে।

নীচে নেমে এসে দেখি, রবীনমেসো আর ঝর্নামাসি এর মধ্যেই এসে বসেছেন চায়ের টেবিলে।

আমেরিকায় প্রত্যেকদিনই ওঁদের খুব ভোর ভোর কাজে বেরিয়ে যেতে হয়। এখানে ছুটি কাটাতে এসেও ওঁরা অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমোতে পারেন না, অভ্যেস এমনই ব্যাপার।

পটভর্তি চা রয়েছে, ঝর্নামাসি আমার জন্য একটা কাপে ঢালতে লাগলেন।

আমাকে দেখেও কেউ কোনও কথা বললেন না, বেশ গম্ভীর। অন্য দিন সকালে প্রথম দেখা হলে রবীনমেসো আগেই বলেন গুড মর্নিং, জিজ্ঞেস করেন, রাত্রে ভাল ঘুম হয়েছে কি না, কী কী স্বপ্ন দেখেছি। ঝর্নামাসিও বলেন কিছু না কিছু।

আমিই বললুম, গুড মর্নিং মাসি-মেসো!

রবীনমেসো অস্ফুট ভাবে উত্তর দিয়ে বললেন, কী কাণ্ড হয়েছে জানো তো নীলু? আবার একটা জানলা ভেঙে পড়েছে।

ঝর্নামাসি বললেন, জানলা!

আমিও বললুম, জানলা?

রবীনমেসো বললেন, সকালে এসে দেখি, রান্নাঘরের একটা জানলা ভেঙে পড়ে আছে। কখন ভেঙেছে, আমরা টের পাইনি। তুমি কিছু শব্দ-টব্দ শুনেছিলে?

আমি বললুম, না। আবার জানলা?

ঝর্নামাসি রাগ রাগ মুখ করে বললেন, পর পর শুধু দুটো জানলা ভেঙে পড়া যে

www.amarboi.com

স্বাভাবিক ব্যাপার নয়, তোর মেসো কিছুতেই সেটা স্বীকার করবেন না।

রবীনমেসো বললেন, বাংলায় কাকতালীয় বলে একটা কথা আছে। কয়েনসিডেন্স। বোঝা যাচ্ছে, এ বাড়িটা কনস্ট্রাকশানের সময় যে লোকটি জানলা-দরজা বসাবার কন্ট্রাক্ট নিয়েছিল, সে ফাঁকি মেরেছে।

ঝর্নামাসি বললেন, দরজা তো ভাঙেনি একটাও। শুধু জানলাই ভাঙবে? তাও আমরা আসার পর?

রবীনমেসো সহাস্যে বললেন, তা বলে কি এটা ভূতের কাণ্ড বলে মেনে নিতে হবে? কাকিমার মতে, এ বাড়িটাতে একটাই মাত্র ভূত আছে। সে মেয়েভূতটা শুধু ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, কখনও কোনও ক্ষতি করে না। সে হঠাৎ খামোখা একটার পর একটা জানলা ভাঙতে যাবে কেন?

ঝর্নামাসি বললেন, এর আগে তো বাড়িটা বিক্রি করার কথা কিংবা ভেঙে ফেলার কথা কেউ বলেনি!

রবীনমেসো বললেন, আমি কিছু না করলেও বাড়িটা আপনা-আপনিই ভেঙে পড়বে। বাড়ি তো আর ভূত নয় যে বয়েস বাড়বে না!

ঝর্নামাসি মুখ ফিরিয়ে বললেন, নীলু, তুই কিছু দেখতে পেয়েছিলি কাল রাত্তিরে?

ইয়ার্কির ছলে অনেক কিছু বানিয়ে বলা যেত, কিন্তু সক্কালবেলা দাঁত মাজার আগে মিথ্যে কথা বলার অভ্যেস নেই আমার। দু'দিকে ঘাড় নাড়লুম।

পরক্ষণেই মনে হল, কিছু একটা দেখেছি শুনলেই যেন ঝর্নামাসি খুশি হতেন।

তিনজনেই গেলুম রান্নাঘরের কাছে।

সত্যিই একটা জানলা ফ্রেম-সমেত খসে পড়ে আছে নীচে। আর কিছু ভাঙেনি, দেওয়ালেও চিড় ধরেনি! যেন জানলাটা আবার তুলে বসিয়ে দিলেই ঠিক হয়ে যাবে।

রবীনমেসো রান্নাঘরের অন্য দুটি জানলা ও দরজাটা নাড়াচাড়া করে দেখলেন। সেগুলো এখনও মজবুতই আছে।

রান্নার ঠাকুর কালু ভেতরে বসে এক মনে লুচি বেলে যাচ্ছে।

তাকে জিজ্ঞেস করা হল, সে কোনও আওয়াজ-টাওয়াজ শুনেছে কি না।

সে কিছু শোনেনি। জানলা ভেঙে পড়ার ব্যাপারে তার কোনও তাপ উত্তাপই নেই।

রবীনমেসো বললেন, শুধু দুটো জানলা ভাঙা কয়েনসিডেন্স। এরকম হতেই পারে। কালকেও যদি আবার একটা জানলা ভেঙে পড়ে, তা হলে বুঝতে হবে, সামথিং ফিসি ইজ গোয়িং অন। পর পর তিনটে একইরকম হতে পারে না।

ঝর্নামাসি জ্বলন্ত চোখে বললেন, কাল? আমি মোটেই এ বাড়িতে আর থাকছি না।

আমার দিকে ফিরে বললেন, নীলু, তুই আজই একটা গাড়ি জোগাড় করে আনতে পারবি না?

ঝর্নামাসি আদেশ করলে শুধু গাড়ি কেন, আমি এরোপ্লেনও জোগাড় করে আনতে পারি। বললুম, নিশ্চয়ই পারব!

ফিরে এসে অসমাপ্ত চায়ে আবার চুমুক দিয়েছি, রণ আস্তে আস্তে দরজার কাছে

www.amarboi.com

এসে দাঁড়াল।

মুখখানা গম্ভীর। ভুরু কুঁচকোনো। যেন কিছু একটা বলতে চায়, ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না।

একটু সময় নিয়ে রণ বলল, ভুটটা ওখানে আছে।

ঝর্নামাসি বললেন, ভুট্টা? তোর কর্‌ন খাবার ইচ্ছে হয়েছে? এখানে কর্‌ন কোথায় পাওয়া যাবে।

রণ বলল, আই হেইট কর্‌ন। আমি বলছি ভুটটা।

ঝর্নামাসি বললেন, ভুট্টাই তো কর্‌ন। লুচি খাবি না? এক্ষুনি লুচি ভাজা হয়ে যাবে।

রণ বিরক্ত ভাবে বলল, হোয়াই ডোন্ট য়ু আন্ডারস্ট্যান্ড? নট করন্, বাট ভুট ভুট।

ঝর্নামাসি বললেন, ভুট ভুট?

এরপর টিনা ছুটতে ছুটতে এসে বলল, বাবা, বাবা, আমি রমলাকে দেখেছি।

রবীনমেসো বললেন, রমলা? হু ইজ রমলা?

টিনা বলল, দা লেডি হু কমিটেড সুইসাইড হিয়ার। সে লেকের তলা থেকে উঠে এসেছে। ঠিক মুভিটার মতো।

রবীনমেসো বললেন, দ্যাট রমলা? টিনা ডিয়ার, সকালবেলাতেই এটা কী ধরনের রসিকতা?

রণ জিজ্ঞেস করল, রশিকতা মানে কী?

টিনা বলল, রণ, রসিকতা মিন্‌স জোক। হিউমার, ফান। লাইক বব অ্যান্ড মেরি টিভি শো। কিন্তু এটা রসিকতা নয়, জলে ভাসছে।

ঝর্নামাসি বললেন, জলে ভাসছে?

দূর থেকে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে এল বিশু মালি। ভয়ার্ত মুখ। হাত-পা নেড়ে বলতে লাগল, দাদাবাবু, শিগগির একবার পুকুরধারে আসুন। ওরে বাবা রে বাবা ...

সবাই দৌড়ে গেলুম পুকুরঘাটে।

এবার চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হল। পুকুরের জলে ভাসছে একটি মেয়ের মৃতদেহ। চব্বিশ-পঁচিশ বছরই বয়েস হবে। টাটকা মরা।

ঝর্নামাসি ভয়ে দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেললেন।

রবীনমেসো একটুক্ষণ থ' হয়ে থেকে বললেন, নীলু, তোমার একটা সিগারেট দাও তো!

ধূমপানের ঘোর বিরোধী হয়েও তিনি একটা সিগারেট ধরালেন, তাঁর হাত কাঁপছে।

এরকম পরিস্থিতিতেও নীললোহিত কিন্তু বিশেষ বিচলিত হয় না। সে জীবনের অনেক ঘাত-প্রতিঘাত দেখেছে। সে জানে, মানুষের দুঃখ যে কতরকম হয়, তা আজও গুনে শেষ করা যায়নি।

নীলপাড় শাড়ি পরা মেয়েটির লাশ দুলছে একটু একটু, তার পাশেই রণ-টিনাদের লাল রঙের বলটা ভাসছে।

নীললোহিত দেখেই বুঝেছে, রমলা ফমলা বাজে কথা। তিরিশ-চল্লিশ বছর পর

www.amarboi.com

কোনও মেয়ের লাশ এমন অবিকৃত থাকতে পারে না, ভেসেও ওঠে না।

সে বিশু মালিকে জিজ্ঞেস করল, দেখে চিনতে পারছ? এ গ্রামের কেউ?

বিশু মালি বলল, বোধহয় পাশের গ্রামের।

সে আবার বলল, থানায় খবর দিতে হবে তো। থানা কত দূরে?

পুকুরের অন্য পাড়ে ছোট ছোট মানুষ দেখা যাচ্ছে।

আমি রবীনমেসোর দিকে ফিরে বললুম, এ মেয়েটি খুব সম্ভবত কাল রাত্তিরেই জলে ডুবে আত্মহত্যা করেছে। আমি যদি সারারাত থাকতুম, তা হলে হয়তো ওকে বাঁচানো যেত।

রবীনমেসোর মুখ থেকে এখনও বিস্ময়ের ভাব যায়নি। তিনি বললেন, একেই বলে পারফেক্ট কাকতালীয়। কাল রাত্তিরেই?

মুখ থেকে হাত সরিয়ে ঝর্নামাসি বললেন, এই পুকুরেই আত্মহত্যা করতে এল? দু'জনেই? কিংবা, এর মধ্যে আরও হয়তো কেউ ...

রণ জিজ্ঞেস করল, হোয়াট ইজ আটট্রোহট্টা?

টিনা বলল, শুড বি মার্ডার!

ঝর্নামাসি বললেন, চুপ, চুপ। তোরা ওদিকে তাকাবি না। চল, চল।

তিনি ছেলেমেয়ের কাঁধ ধরে জোর করে নিয়ে গেলেন বাড়ির দিকে।

এসব ঘটনার খবর হাওয়ার চেয়েও জোরে ছোটে। দেখতে দেখতে পুকুরের সবদিক মানুষে ভরে গেল। আরও মানুষ ছুটে ছুটে আসছে।

ডিটেকটিভ গল্পে থাকে যে, পুলিশ আসার আগে কেউ লাশ ছোঁয় না। তারপর পুলিশ এসে আশেপাশের লোকদের নানারকম জেরা করে। কেউ বাড়ি ছেড়ে যেতে পারে না। ট্রেনিং দেওয়া কুকুর এসে গন্ধ শোঁকে।

গ্রামের মানুষদের ভাগ্যে ওসব নেই।

থানা অনেক দূর। সেখানে খবর দিলেও যে পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসবে, তার কোনও মানে নেই। বড় জোতদার বা রাজনৈতিক নেতার বাড়ির কেউ হলে তবু আলাদা কথা, সাধারণ চাষি বা গরিব বাড়ির একটি মেয়ে আত্মহত্যা করল কিংবা খুন হল, তা নিয়ে পুলিশের মাথা ঘামাবার সময় কোথায়?

আমরা বাড়ির মধ্যে বসে রইলুম। লুচি ভাজা হয়ে গেছে, সুতরাং খেতেও হল।

নানারকম পরস্পরবিরোধী খবর আসতে লাগল বিশু মালি মারফত। ঘণ্টাখানেক বাদে বিবরণটা অনেকটা পরিষ্কার।

মেয়েটিকে চেনা গেছে, পাশের গ্রাম কোতলপুরের মালতী, বিয়ের পর স্বামী মারা গেছে চার বছরের মধ্যেই। সে গামছা বোনার কাজ করত বাপের বাড়িতে থেকেই, বেশ কয়েকজন পুরুষের নজর ছিল তার দিকে। কাল রাত্তিরে তাকে খাওয়া দাওয়া করে শুতে যেতেও দেখা গেছে, তারপর কখন সে বাড়ি থেকে বেরুল, তা কেউ জানে না।

সে নাকি গর্ভবতী। এটা সত্যি না কোনও রসের গল্প রটনাকারীর সংযোজন, তা অবশ্য বলা যায় না। তার গ্রামের লোক শবদেহ তুলে নিয়ে গেছে।

www.amarboi.com

কোতলপুরের মালতী রাত্রির অন্ধকারে অনেকটা পথ পেরিয়ে ভোলানাথপুরের মল্লিক বাড়ির পুকুরেই কেন ডুব দিতে এল, তা ঠিক বোঝা গেল না। কোতলপুরে কি পুকুর নেই?

ঝর্নামাসি পাগলের মতো ছটফট করে লাগলেন।

তিনি কিছুতেই আর এ বাড়িতে রাত্রিবাস করতে চান না। ভূতের গল্প, জানলা ভাঙা, চোখের সামনে সত্যিকারের একটি মৃতদেহ ভাসতে দেখা, এসব তার ছেলেমেয়ের মনে খুব খারাপ ছাপ ফেলবে, এটাই এখন তাঁর প্রধান দুশ্চিন্তা।

তিনি আজ দিনের আলো থাকতেই থাকতেই এ বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে চান। আজ রাত্তিরে আবার নতুন কী ঘটবে কে জানে!

রবীনমেসো বললেন, গাড়ি যদি পাওয়া যায়—কিন্তু খুব সন্দেহ আছে, দেখলে তো, একটা পুলিশের গাড়ি পর্যন্ত এল না।

ঝর্নামাসি বললেন, নীলু ঠিক জোগাড় করে আনবে!

রবীনমেসো বললেন, কী নীলু, সত্যিই পারবে?

আমি সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়লুম।

রবীনমেসো বললেন, কলকাতা থেকে এ সি স্টেশন-ওয়াগন আনতে বলে দিয়েছিলাম। এখানে যদি কোনওক্রমে গাড়ি পাওয়াও যায়, তার কী রকম কন্ডিশন যে হবে, তাতে তোমরা যেতে পারবে!

ঝর্নামাসি বললেন, হ্যাঁ পারব। গাড়িটা চললেই হল। নীলু, তুই জোগাড় করে আন। টাকার জন্য ভাবিস না, যত টাকা চায় রাজি হয়ে যাবি। তা হলে আর দেরি করিস না।

বিশু মালির সাইকেলটা ধার নিয়ে আমি বেরিয়ে পড়লুম তক্ষুনি।

॥ ৬ ॥

সাইকেলটা চলতে চলতে হঠাৎ ধড়ধড় করে কেঁপে ওঠে।

সেটা, আমি অনেকদিন চালাইনি, সেই অনভ্যাসের জন্য, না সাইকেলটাতেই প্রচুর টাল আছে? সে যাই হোক, এবড়ো খেবড়ো রাস্তাতেও চালানো যাচ্ছে কোনও ক্রমে।

রেলস্টেশনে যেতে হবে, সেখানেই গাড়ি পাবার আশা আছে।

এ গ্রামটার পাশ দিয়ে বয়ে গেছে একটা ছোট নদী। সেটি অনুল্লেখযোগ্য নদী বলেই কেউ তার ওপরে বড় ব্রিজ তৈরি করার কথা চিন্তা করেনি। ব্রিজ হয়নি বলেই পাকা রাস্তা থেমে আছে নদীর ওপারে। আর পাকা রাস্তা হয়নি বলেই গত পঞ্চাশ বছরে গ্রামটির কোনও উন্নতিও হয়নি।

ভাল রাস্তার অভাবেই শুকিয়ে যাচ্ছে এ রকম অনেক গ্রাম।

সেতু একটা আছে বটে, অনেকদিন সংস্কার হয়নি, বেশ বিপজ্জনক অবস্থায় ঝুলছে। আসবার সময় এই সেতুর ওপারে গাড়ি থেকে নেমে হাঁটতে হয়েছিল।

আমি সেতুটার ওপর উঠে সাইকেল থামালাম।

www.amarboi.com

নদীটার এমন মুমূর্ষু দশা, কেউ আর তাকে গ্রাহ্য করে না। এখন শীতকাল, প্রায় শুকনো, এখানে সেখানে কয়েক খাবলা জল, আর শুধু বালি। দূরে কোথাও একটা বাঁধ তৈরি করা হয়েছে, তাতেই মরে যাচ্ছে নদীটা। হঠাৎ যেন নদীটিকে রাস্তার ধারে পড়ে থাকা কোনও কুষ্ঠরোগীর মতো মনে হল।

এই সব ছোট ছোট নদীগুলোকে দেখলে আমার কেমন যেন আত্মীয়ের কথা মনে হয়। অনেকে আমাকে চেনেই না, আমিও অনেকের কথা ভুলে গেছি। একবার বর্ষাকালে এসে এই নদীর সঙ্গে ভাব করে যেতে হবে।

হঠাৎ একটা প্রচণ্ড শব্দে আমার পিলে চমকে গেল।

কেউ কামান দাগল না কি? কিংবা বোমা ফাটল?

তা নয়, মেঘ ডেকেছে। শীতকালের আকাশে মেঘ? একেবারে অস্বাভাবিক নয়, কোনও কোনও বছরে শীতকালেও কয়েকদিন তুমুল বৃষ্টি হয়। বছর দু-এক আগেই তো জানুয়ারি মাসে সাংঘাতিক বৃষ্টিতে কলকাতার রাস্তায় জল জমে গিয়েছিল।

আরও দু'বার গর্জন করে চুপ করে গেল মেঘ।

ব্রিজটা পার হয়ে কিছু দূর যাবার পর দেখি, ধুলো উড়িয়ে একটা কোনও গাড়ি আসছে। সেটা চোখে পড়তেই বেশ পুলক জাগল। গাড়ির কাছ থেকেই গাড়ির খবর জানা যায়। এই গাড়িটা যদি সুবিধেজনক নাও হয়, কিংবা যেতে না চায়—

বেশ জোরে আসছে গাড়িটা, আমি এক পাশে সরে গিয়ে হাত নাড়তে লাগলাম ব্যাকুল ভাবে, কিন্তু সেটা থামল না, খানিকটা ধুলো দিয়ে গেল আমার চোখে। একেবারে আক্ষরিক অর্থে চোখে ধুলো দেওয়া।

কিন্তু ব্রিজের ওপর দিয়ে তো এ গাড়ি যাবে না, তা হলে যাচ্ছে কোথায়?

সেটা একটা জিপ। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি, জিপটা একটুও গতি না কমিয়ে রাস্তা ছেড়ে নেমে পড়ল মাঠের মধ্যে।

এই রকম সময়ে ধুর শালা বলতে ইচ্ছে করে।

মিনিট সাতেক পরেই আবার গাড়ির আওয়াজ, এবার পেছন দিকে। সেই জিপখানাই ফিরে আসছে।

এবারে ওকে থামাতেই হবে। রাস্তার মাঝখানে সাইকেল থেকে নেমে গ্যাঁট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম।

জিপটা আমাকে ধাক্কা মেরে চলে যেতেও পারত। পুলিশ কেসের প্রশ্ন নেই, কাছাকাছি আর কোনও জন মনিষ্যিও নেই।

কিন্তু সেটি দয়া করে থামল এবং চুপ করে রইল।

শুধু ড্রাইভারকে দেখা যাচ্ছে, তার হাতে একটা বিড়ি, সে তাকিয়ে আছে একদৃষ্টিতে। রাস্তার মাঝখানে একটা গোরু দাঁড়িয়ে থাকলে সে এরকমই করত।

অগত্যা আমিই কাছে গিয়ে বললুম, নমস্কার।

সে হাত তুলল না, সাড়া শব্দও করল না।

লুঙ্গির ওপর খাঁকি রঙের জামা পরা, সরু চেহারা, ছুঁচল থুতনি, গাঁজা খোরের মতন চকচকে চোখ, মাথায় চুল মনে হয় যেন খানিকটা খানিকটা কাকে খেয়ে

www.amarboi.com

নিয়েছে।

আমি বললুম, তখন আপনাকে থামবার জন্য হাত দেখালুম, আপনি দেখতে পাননি?

লোকটি এবার মুখ খুলল। বেশ তেজি লোক। খ্যাঁকশেয়ালের মতন ধমকের সুরে বলল, আপনি আমার সঙ্গে আমড়াগাছি করতে এসেছেন? কী চাই, বলুন চটপট!

গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ করেনি, ধকধক শব্দ হচ্ছে।

এ লোকের সঙ্গে কড়া হয়ে লাভ নেই। বিনীতভাবে বললুম, আপনাকে জোর করে থামিয়েছি, কিছু মনে করবেন না, আমার একটা গাড়ি ভাড়া করা খুব দরকার। কোথায় পাওয়া যাবে বলতে পারেন?

লোকটি বলল, দাঁড়া, দাঁড়া, একটু পরেই জল খাওয়াব!

বুঝতে না পেরে আমি জিজ্ঞেস করলুম, কী বললেন? জল চাইছি না। একটা গাড়ি ভাড়া—

লোকটি বলল, আজ শুক্কুরবার, হাট আছে, সেখানে চলে যান, গোরুর গাড়ি পাবেন, সাইকেল ভ্যান পাবেন। পথ ছাড়ুন, সামনে থেকে সরে যান।

—গোরুর গাড়ি কিংবা সাইকেল ভ্যান হলে তো চলবে না! একটা গাড়ি চাই।

—গাড়ি চাই তো বদ্ধোমানে গিয়ে গাড়ি কিনে আনুন। আমি কী করব?

—ভাড়া পাওয়া যাবে না?

—দেখুন দাদা, আমার এ গাড়ির একবার ইঞ্জিন বন্ধ হলে নেমে গিয়ে হান্ডিল মেরে এস্টার্ট দিতে হয়। কেন কথা বাড়াচ্ছেন?

—আপনার এই গাড়িটা পাওয়া যেতে পারে না?

—সে কথা এতক্ষণ বলেননি কেন? আমি হাওয়া খাওয়ার জন্য গাড়ি চালাই? ভাড়া খাটি। কী মাল যাবে?

—মাল নয়, মানুষ যাবে।

—হবে না। আমি মানুষ ক্যারি করি না, শুধু মাল।

—মানুষ আর মালে তফাত কী? পেছনে তো বসার সিট রয়েছে।

—মানুষ আর মালে তফাত নেই? মানুষ একটু ঝাঁকুনি লাগলেই চেল্লামেল্লি করে। দেরি হলে গ্যাজর গ্যাজর করে।

—আমাদের খুবই দরকার। আজই কলকাতায় ফিরতে হবে। নইলে খুব বিপদ হয়ে যাবে।

—কলকেতা? নো কোশ্চেন। অতদূর যাবার ধক নেই। কলকাতায় গেলে মদনা রাস্তা হারিয়ে ফেলে। বড়জোর বদ্ধোমান পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারি। বিপদ হবে বলছেন।

—বর্ধমান পর্যন্ত? সেখানে পৌঁছোলে অনেক ট্রেন পাওয়া যাবে। অন্য গাড়িও ভাড়া যেতে পারে।

—বদ্ধোমান থেকে হুদো হুদো গাড়ি কলকেতায় যাচ্ছে। তিন ঘণ্টার রাস্তা!

—ঠিক আছে। আপনাকে কত দিতে হবে?

www.amarboi.com

—দেখুন মোশাই, আমি এক কথার মানুষ। আমার সঙ্গে দরাদরি ফরাদরি চলে না। এক পয়সাও কমাই না। খাঁটি চারশো টাকা লাগবে।

—শুনুন দাদা, আমিও এক কথার মানুষ, চারশো টাকা একটু বেশি মনে হলেও মুখ থেকে যখন খসিয়েছেন, ঠিক চারশোই পাবেন। শুধু তাই-ই নয়, আরও কুড়ি টাকা, না, না, তাতে চারশো বিশ হয়ে যায়, আরও তিরিশ টাকা পাবেন টিফিন খাওয়ার জন্য।

—কখন যাবেন?

—এখনই। মানে, তৈরি হতে বড় জোর আধঘণ্টা লাগবে।

—এখুন? বললেই হল? আমার পেছুনে যে মালগুলো রয়েছে, তা কে ডেলিভারি দেবে? সীতারামপুরে যেতে আসতেই লেগে যাবে ঘণ্টা তিনেক। সেখান থেকে আবার মুরগি আসবে আজকের হাটে। বিকেল চারটের আগে হবে না।

—বিকেল চারটে? তার বেশি দেরি হবে না তো?

—আবার কোশ্চেন করছেন। বলেছি না, বিভূতি দাসের ব্যাটা টিভূতি দাস এক কথার মানুষ। ঠিক চারটের সময় ব্রিজের সামনে আমায় খাড়া দেখবেন।

—আপনার নাম টিভূতি?

—হ্যাঁ, কেন, পছন্দ হল না?

—না, না, তা নয়, বলছি যে, আপনার তো কিছু অ্যাডভ্যান্স লাগবে। দুশো টাকা দিই?

—আমি অ্যাডভ্যান্সের পরোয়া করি না। মুখের কথাই যথেষ্ট। আপনারা ঠিক টাইমে রেডি থাকবেন। দেরি হলে আমি দায়িক নই।

আমি তবু জোর করেই লোকটির পকেটে দুশো টাকা গুঁজে দিলুম।

টাকা নিলে খানিকটা দায়িত্ব এসেই যায়। আর গ্রামের মানুষ টাকা নিয়ে নিমকহারামি করে না। অবশ্য বইতে-পড়া গ্রামের মানুষদের সম্পর্কে এ রকমই ধারণা। সত্যিকারের গ্রামের মানুষদের কতটুকুই বা চিনি!

ঝর্নামাসি বলেছিলেন, যত টাকা লাগে লাগুক, দু'হাজার, পাঁচ হাজার...। এই লোকটি চাইল মোটে চারশো। কেউ চারশো টাকা চাইলে তাকে কি দু'হাজার টাকা দেওয়া যায়? সেটা বড়লোকদের চালিয়াতি কিংবা ভিক্ষের মতন মনে হবে না?

শুনেছি, বাঙালিরা যখন আমেরিকায় বেড়াতে যায়, তখন ডলার খরচ করতে গিয়ে পদে পদে ভারতীয় টাকা দিয়ে গুণ করে আর শিউড়ে শিউড়ে ওঠে! বেগুন আড়াই ডলার মানে একশো টাকারও বেশি, অ্যাঁ? আর আমেরিকার বাঙালিরা দেশে এসে টাকা খরচ করতে করতে ডলার দিয়ে ভাগ করে আর মনে মনে হাসে। বেগুন দশ টাকা, তার মানে মাত্র সিকি ডলার, অ্যাঁ?

চারশো টাকা প্রায় দশ ডলারেরও কম। রবীনমেসোদের কাছে দশ ডলার তো নস্যি! একটা সিনেমার টিকিটের দামও এর চেয়ে বেশি। সকালবেলা বাড়ি থেকে

www.amarboi.com

বেরিয়ে কোথাও চা-জলখাবার খেতে গেলেও দশ ডলার খরচ হয়ে যায়। সেই টাকায় এ দেশে আস্ত একখানা গাড়ি ভাড়া! আর ড্রাইভার সমেত গাড়ি ভাড়ার কথা ও দেশে অনেকে কল্পনাই করতে পারে না।

এত সহজে যে কার্যসিদ্ধি হবে, তা আশাই করিনি। ধরেই নিয়েছিলাম, রেলস্টেশনে পর্যন্ত যেতে হবে। খুবই ছোট এলেবেলে স্টেশন, সেখানেও যে গাড়ি ভাড়া পাওয়া যাবেই, তার কোনও নিশ্চয়তা নেই।

লোকটি খানিকটা তেড়িয়া ধরনের, তবে এই ধরনের লোকরা কাজেরও হয়।

শুধু ওর নামটা ঠিক মেনে নিতে পারছি না। টিভূতি? কোনও বাঙালির নাম শুনলেই সে নামের মানে বুঝতে চাওয়াটা আমাদের অভ্যেস। অনেক মুসলমানদের নামের মানে বুঝতে পারি না বলেই তো সহজে মনে রাখতে পারি না।

গাড়ি নয়, জিপ গাড়ি, দুটো এক বস্তু নয়। জিপ গাড়ি যদি ওঁদের পছন্দ না হয়? ছেলেমেয়েরা হয়তো কখনও জিপে চড়েইনি। অবশ্য গ্রামের গর্তবহুল রাস্তায় জিপ গাড়িই প্রশস্ত। ওঁরা অনেক বেশি টাকা দিতে রাজি আছেন, কিন্তু এর চেয়ে ভাল গাড়ি আমি পাব কোথায়?

নীচের বারান্দায় রাস্তার দিকে চেয়ে বসে আছেন ঝর্নামাসি। আমায় দেখেই তার মুখখানা মেঘলা মেঘলা হয়ে গেল।

চরম হতাশ ভাবে বললেন, পেলি না? খালি হাতে ফিরে এলি?

ঝর্নামাসি ভেবেছিলেন, বাজার থেকে মাছ কেনার মতন, আমি যাব আর একটা গাড়ি নিয়ে ফিরে আসব। ইচ্ছে মতন মাছও তো পাওয়া যায় না এই গ্রাম বাংলায়।

একটা চেয়ারে বসে আর একটা চেয়ারে পা তুলে দিয়েছেন রবীনমেসো। এটাই তাঁর প্রিয় ভঙ্গি।

তিনি বাঁকা হেসে বললেন, পাওয়া যায়নি তো? জানতাম!

ঝর্নামাসি সরোষে বললেন, আমি আজ যাব ঠিক করেছি। যাবই!

রবীনমেসো বললেন, দেখো তো, কী অদ্ভুত জেদ। আর একটা রাত থেকে গেলে কী হয়? আমাদের কি ভূতে খেয়ে ফেলবে?

ঝর্নামাসি বললেন, দরকার হলে আমি হেঁটে রেলস্টেশন পর্যন্ত যাব। আমার ছেলেমেয়েদের আমি এ বাড়িতে থাকতে দেব না!

রবীনমেসো বললেন, বিশুর কাছ থেকে খবর নিয়েছি। খুবই ছোট স্টেশন, সকালবেলা কলকাতা যাওয়ার গোটা দু-এক ট্রেন থামে, দুপুরের পর আর কিছু নেই। ওই স্টেশনে দু-একটা লরি ফরি দেখা যায়, কিন্তু গাড়ি, মানে কার এরা কখনও দেখেনি। কাল সকালের ট্রেনেই যেতে হবে মনে হচ্ছে। ইন ফ্যাক্ট, আমার একটা কৌতূহল রয়েছে, আজ রাত্তিরেও আর একটা জানলা ভেঙে পড়ে কি না দেখে যেতে চাই!

ঝর্নামাসি বললেন, তোমার ইচ্ছে হয়, তুমি থাকো!

আমার দিকে থমথমে মুখে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বললেন, নীলু, তোর

www.amarboi.com

আপনাদের পায়ে ধরে সেধেছি?

ঝর্নামাসি বললেন, না, না, আমার বেশ পছন্দ হয়েছে। তোমার নাম কী ভাই?

—টিভূতি

—কী বললে?

—টিভূতি, টিভূতি!

—টিভূতি?

রণ বলল, টিভূটি! আমি আপনাডের পায়ে ঢোড়ে সেঢেছি?

টিনা বলল, ডোন্ট বি সিলি। তুই কিছু বুঝিস না সুঝিস না।

আমি বসলুম ড্রাইভারের পাশে। মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে ভালিয়ে টিভূতির মন প্রসন্ন রাখতে হবে।

প্রথম স্টার্ট নেবার সময় বেশ ধক ধক শব্দ হতে লাগল বটে, তারপর জিপটা চলতে লাগল বেশ ভাল ভাবেই।

রবীনমেসো বললেন, ইস্, ধুলো উড়ছে!

আমি তাড়াতাড়ি বললুম, তা একটু উড়বেই!

টিভূতি বলল, রাস্তায় ধুলো না উড়ে কি পাউডার উড়বে?

ঝর্নামাসি বললেন, গ্রামের ধুলো মানে...শুধুই ধুলো, আমাদের ওখানকার মতন পলিউশান নেই।

রবীনমেসো বললেন, টিভূতি মানে কী?

টিভূতি বলল, মোশাই, আমি গাড়ি চালাই। আমার নাম দিয়ে আপনার দরকার কী? শুধু ড্রাইভার বলে ডাকবেন।

এই রে, রবীনমেসো আর টিভূতি পরস্পরকে প্রথম থেকেই অপছন্দ করে ফেলেছে!

ঝর্নামাসি নরম করে বললেন, রাগ করছ কেন ভাই। তোমার নামটা নতুন রকমের তো? তাই মানে জানতে ইচ্ছে করে। নিশ্চয়ই কিছু মানে আছে। ভাল নাম, সুন্দর নাম। কে রেখেছে?

—আমি।

—তুমি নিজেই নিজের নাম রেখেছ?

—হ্যাঁ। আমার আর একটা নাম আছে, সেটা আর বলি না। এটাই সুবিধের। কেন এই নাম রেখেছি শুনবেন?

—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই

—একবার আমি একটা ছাগল চাপা দিসলুম গয়লাপট্টিতে, আমার দোষ নেই, হঠাৎ সেই শুয়োরের বাচ্চা রামছাগলটা সামনে এসে পড়ল—

—শুয়োরের বাচ্চা রামছাগল?

—হ্যাঁ, সেই ছাগলটা এমন দৌড়ে এল, আমি ব্রেক কষেছি, কিন্তু ততক্ষণে সেটা চাকার তলায়...

—ইস্!

www.amarboi.com

—ছাগলটাকে সেইদিনই কেটে মাংস বিক্রি করলে আপনারা ইস্ বলতেন? অমনি আমার দোষ দিলেন তো?

—না, না, তোমার দোষ দেব কেন, ছাগলদের কাণ্ডজ্ঞান থাকে না, সবাই জানে! তারপর কী হল?

—আমি তো একটু গোঁয়ার টাইপ, গোয়ালারা ছুটে এসে গাড়ি আটকাল। আমি তর্ক করতে গেলুম তাদের সঙ্গে। মানে, ওই আর কী, বলতে গেলুম, আমার দোষ নেই, ওরা কেন ছাগল সামলায় না। ও গেরামটার লোকগুলো খুব মারকুটে, এমন ধোলাই দিল আমাকে...

—ইস্!

—বাপের নাম ভুলিয়ে দেওয়া কাকে বলে জানেন তো? এ হচ্ছে সেই ধোলাই। পাঁচদিন হাসপাতালে। বাঁচি কি মরি ঠিক নেই। তারপর তো শালা বেঁচে উঠলুম, কিন্তু সত্যি সত্যি বাপের নাম আর মনে করতে পারি না। পেটে আসে, মুখে আসে না। এ তো মহা ঝঞ্ঝাট, লাইসেন রিনিউ করতে গিয়ে বাপের নাম বলতে পারি না, থানায় গেলে বলতে পারি না। কলকেতায় কী নিয়ম জানি না। আমাদের এখানে বাপের নাম সবসময় কাজে লাগে। তারপর এই বুদ্ধি বার করেছি। যতই প্যাঁদানি খাক, নিজের নাম কেউ ভোলে না। নিজের নাম রেখেছি টিভূতি, শুনলেই মনে পড়ে যায়, আমার বাপের নাম বিভূতি!

ঝর্নামাসি বললেন, বাঃ, বেশ ভাল বুদ্ধি বার করেছ তো?

এই সময় গাড়িটা একটা গর্তে পড়ে লাফিয়ে উঠতেই টিভূতি বলল, আস্তে, আস্তে রে মদনা, ভেতরে বাচ্চা ছেলেমেয়ে আছে।

রবীনমেসো বললেন, মদন?

আমি বললুম, মদনা এই জিপটার নাম।

—ড্রাইভার নিজের জিপের সঙ্গে কথা বলে? দ্যাটস ভেরি ইনট্রেস্টিং!

—আমি শুধু কথা বলি না। মদনা উত্তরও দেয়।

—রিয়েলি? ইট স্পিকস ইন হোয়াট ল্যাঙ্গোয়েজ?

—আমার সঙ্গে ইংরিজি ফলাচ্ছেন কেন স্যার?

—ও আই অ্যাম সরি। জিপটা কোন ভাষায় কথা বলে?

—সে আপনি বুঝবেন না। দেখবেন? কীরে, ঠিক আছিস তো মদনা? সে ক্লাচ না অ্যাকসিলারেটরে কীসে জোরে চাপ দিল বোঝা গেল না, একটা ভ-র-র-র শব্দ হল!

মেঘে ঢেকে গেছে সারা আকাশ, এর মধ্যেই মুছে যাচ্ছে বিকেলের আলো, অন্ধকার হয়ে আসছে।

রণ জিজ্ঞেস করল, বাবা, ভ-র-র-র, ভ-র-র-র, কি বাংলা?

টিনা বলল, দূর বোকা! ট্রি-রি-রি-রিং ট্রি-রি-রি-রিং করে টেলিফোন বাজে, সেটা কি ইংলিশ?

আমি জানলার বাইরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলুম, এখন আমরা কোথা দিয়ে যাচ্ছি? এই জায়গাটার নাম কী?

www.amarboi.com

বিভূতি বলল, কোতুলপুর!

নামটা শুনেই মাসি-মেসো সচকিত হয়ে উঠলেন।

রবীনমেসো বললেন, এই গ্রাম থেকেই মেয়েটা—

ঝর্নামাসি বললেন, থাক, ওই নিয়ে কিছু বলতে হবে না।

টিভূতি বলল, এই কোতুলপুরেরই একটা মেয়ে সুইসাইড করেছে জলে ডুবে। বিধবা মেয়ে, পোয়াতি হলে আর কী করবে!

রবীনমেসো বললেন, আমাদের বাড়ির পুকুরেই তো? কেন এত দূরে গিয়ে...সত্যিই কি সে ইয়ে ছিল?

ঝর্নামাসি খুব তীব্র গলায় বলে উঠলেন, ওই নিয়ে কথা বলতে বারণ করেছি না? আমি একদম শুনতে চাই না।

কথা ঘোরাবার জন্য আমি বললুম, টিভূতিভাই, গ্রামের মানুষও কিন্তু অনেক ইংরিজি বলে। এই তো আপনি বললেন, সুইসাইড।

টিভূতি বলল, ওটা ইংলিশ বুঝি? বাংলায় তবে কী?

—আত্মহত্যা।

—কারুকে বলতে শুনি না। সবাই তো সুইসাইডই বলে। মার্ডার কথাটাও ইংরিজি, তাই না? পাঁচুর মা, ধাঁচুর মাও বলে মার্ডার।

চড়াত করে যেন সারা আকাশ চিড়ে বিদ্যুৎ চমকাল। তারপরই প্রচণ্ড শব্দে বজ্রপাত।

ঝর্নামাসি ভয় পেয়ে রবীনমেসোকে জড়িয়ে ধরলেন।

গাড়িটাও থেমে গেল হঠাৎ।

টিভূতি বলল, কীরে মদনা, কী হল? থামলি কেন?

মদনা কোনও উত্তর দিল না।

টিভূতি সেল্‌ফ-এর চাবি ঘোরাল কয়েকবার, তবু কিছুই হল না।

ঘাড় ঘুরিয়ে আমাদের সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গিতে জানাল, মদনা মেঘের আওয়াজে ভয় পায়। এক্ষুনি ঠিক হয়ে যাবে।

কিন্তু মেঘের ডাকের বিরাম নেই। সারা আকাশে কেউ যেন একটা বড় পাথর গড়িয়ে খেলছে, মাঝে মাঝে ধমকে উঠছে।

কয়েক মিনিট পর রবীনমেসো জিজ্ঞেস করলেন, ঠেলতে হবে নাকি?

টিভূতি বলল, চুপ মেরে বসে থাকুন তো আমার মদনা অন্য লোকের ছোঁয়াছুঁয়ি পছন্দ করে না।

সিটের তলা থেকে একটা হ্যান্ডেল বার করে লাফিয়ে নেমে পড়ল সে।

নীললোহিতও তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। এর মধ্যে বাতাস শোঁ শোঁ হয়েছে, পুরোপুরি অন্ধকার বলে বিদ্যুতের ঝলসানি আরও তীব্র দেখায়, বৃষ্টি এল বলে।

টিভূতি জিপের বনেটে দুটো চাপড় মেরে বলল, কীরে, মদনা, ঘুমিয়ে পড়লি নাকি?

মদনা তবু উত্তর দেয় না।

www.amarboi.com

নীললোহিত জিজ্ঞেস করল, ঠিক মতন ডিজেল খেতে দিয়েছিলেন তো?

—এই তো আধঘণ্টা আগে পোঁয়োরো লিটার ওর গলায় ঢেলেছি। আমি খেয়েছি, মনে করুন হাফ লিটার।

—আপনিও ডিজেল, ও না, বুঝেছি, আপনি বাংলা, আর ও ডিজেল। বেশ। কিন্তু হঠাৎ থেমে গেল? এ রকম হয় মাঝে মাঝে?

—কক্ষনও না। আমি আউট হই, তবু মদনা হয় না!

—কিন্তু এখন যে...দেখছেন তো কী রকম দুর্যোগ শুরু হল।

—শীতকালের মেঘের ডাক, খুব ডেঞ্জারিয়াস। চিন্তা করবেন না। ঠিক চালু হয়ে যাবে।

সে হ্যান্ডেল মারল কয়েকবার।

তবু কিছুতেই আর ইঞ্জিন জাগে না।

নীললোহিতের ধারণা ছিল, আজকাল গাড়িতে হ্যান্ডেল মারার ব্যাপারটা উঠেই গেছে। পথে ঘাটে আর দেখা যায় না।

রাস্তায় আর মানুষজন নেই। শুধু ক্যাঁচর ক্যাঁচর শব্দ করে একটা গোরুর গাড়ি চলে গেল পাশ দিয়ে।

অন্ধকারে গোরুর চোখ অতি হিংস্র প্রাণীর মতন জ্বলজ্বল করে।

এও যেন ঠিক গল্পের মতন। মাঠের মাঝখানে গাড়ি খারাপ। অন্ধকার, চার পাশে বাড়ি ঘরের কোনও চিহ্ন নেই। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে।

টিভূতি হ্যান্ডেল মারতে মারতে ক্লান্ত হয়ে গেল।

নীললোহিত সবিনয়ে বলল, অনেক সময় দেখেছি, ঠেললে গাড়ি স্টার্ট হয়ে যায়।

টিভূতি বলল, অন্য গাড়িতে হতে পারে। এ গাড়িতে হয় না।

তারপরই সে গাড়ির বনেটে খুব জোরে একটা চাপড় মেরে বলল, এই মদনা, কী হচ্ছে কী, ওঠ, ওঠ! শালা, আমার প্রেস্টিজ পাংকচার হয়ে যাচ্ছে।

রবীনমেসোও নেমে এসে ফিসফিস করে বললেন, এ কোন পাগলের পাল্লায় পড়লাম হে নীলু!

নীললোহিত এই ভয়টাই পাচ্ছিল। গাড়ি জোগাড় করল সে। এখন গাড়ি খারাপ হওয়ার সব দোষও তার ঘাড়ে পড়বে।

রবীনমেসো বললেন, ও যা-ই বলুক, এসো তো তুমি আর আমি খানিকটা ঠেলে দিই!

রণও তড়াক করে নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। আমরা সওয়া দু'জন মিলে ঠেলতে গাড়িটা গড়াল একটুখানি। টিভূতি আপত্তি করল না, হাতও লাগাল না।

এবড়ো খেবড়ো রাস্তা, গাড়ি ঠেলা সহজ কথা নয়। ভার কমাবার জন্য টিনাকে নিয়ে ঝর্নামাসিও নেমে এলেন।

কয়েক মিনিটের মধ্যে গলদঘর্ম হয়ে আমাদের হাল ছাড়তে হল।

গাড়িটাতে কোনওরকম প্রাণের স্পন্দন নেই।

টিভূতি বলল, আমি কিন্তু আর দায়িক নই।

www.amarboi.com

রবীনমেসো বললেন, তার মানে?

টিভূতি বলল, তার মানে খুব সোজা। আমি বলে দিসলুম, হাত লাগাতে হবে না। তবু আপনারা ঠেললেন। এখন যদি মদনার আরও মুড খারাপ হয়ে যায়—

রবীনমেসো বললেন, গাড়ির আবার মুড। একটা ডাইলাপিডেটেড গাড়ি নিয়ে এসেছ, আই মিন, ঝ্যাড়ঝেড়ে—

টিভূতি বললেন, আমি আপনাদের—

রণ বলে উঠল, আমি আপনাডের পায়ে ঢড়ে সেঢেছি?

টিনা বলল, তুই চুপ কর।

ঝর্নামাসি কাঁদো কাঁদো হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, গাড়ি কি আর চলবেই না?

সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি নামল। প্রথম থেকেই বড় বড় ফোঁটা।

ঝর্নামাসি আরও উতলা হয়ে উঠে ছেলে-মেয়েকে বললেন, এই ভিজবি না, ভিজবি না, শীতকালের বৃষ্টি, গাড়িতে উঠে বোস, ওঠ, ওঠ...

রণ আর টিনা বেশ মজা পেয়েছে। বৃষ্টি ভিজতে কোন বাচ্চাদের না ভাল লাগে। এমনকী বিলিতি বাচ্চাদেরও। তারা নাচতে লাগল দু'হাত তুলে।

তাদের ঠেলেঠুলে ওঠানো হল গাড়িতে। এর মধ্যেই তারা বেশ ভিজেছে।

গাড়িতে উঠেও তো নিস্তার নেই। এ যে জিপ গাড়ি। জানলা বলে কিছু নেই, দু'দিক থেকে তেড়ে বৃষ্টির ছাঁট আসছে।

এত জোর বৃষ্টি, এত বিদ্যুৎ ও বজ্রগর্জন, সত্যি ভয় লাগে।

এই যদি দোতলা বাড়ির নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে বসে, মুড়ি তেলে-ভাজা খেতে খেতে কাচের জানলা দিয়ে দেখলে এ রকম বৃষ্টি অনেক উপভোগ্য হতে পারত, কিন্তু অনিশ্চয়তার জন্য এখানে বেশি ভয় করে।

ঝর্নামাসি হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন, আমাদের মাথায়ও তো বাজ পড়তে পারে, তাই না? মাঠের মধ্যে লোকের মাথায় বাজ পড়ে, মানুষ মরে যায়, আমি জানি!

রণ বলল, মাথায় টাইগার পড়বে?

টিনা বলল, টাইগার নয়, থান্ডার। বাঘ না, বাজ, বাজ!

ঝর্নামাসি বললেন, মাথা ঢেকে থাক, মাথা ঢেকে থাক।

রবীনমেসো হাসলেন।

টিভূতি ড্রাইভার এই বৃষ্টির মধ্যেও গাড়িতে ওঠেনি। সে এর মধ্যেও জিপের বনেট চাপড়াতে চাপড়াতে কী সব বলে যাচ্ছে।

ঝর্নামাসি বললেন, ও বৃষ্টিতে ভিজছে। ওর নিউমোনিয়া হবে যে। কিংবা ওর মাথায় যদি বাজ পড়ে, কে এই গাড়ি চালাবে?

রবীনমেসো বললেন, আর গাড়ি! এ আর সারারাত চলবে বলে মনে হয় না।

ঝর্নামাসি বললেন, অ্যাঁ?

বৃষ্টিতে জামা-টামা সব ভিজে গিয়ে রীতিমতন শীত করছে। কতক্ষণে এই বৃষ্টি থামবে তাও বোঝা শক্ত।

খানিকবাদে এটা বোঝা গেল যে রবীনমেসোর আশঙ্কাই ঠিক। মদনা জিপকে

www.amarboi.com

আজ রাতে আর কিছুতেই জাগানো যাবে না।

তা হলে সারারাত কি ভিজে গায়ে এই জিপে বসে থাকতে হবে?

রবীনমেসো বললেন, আমি তখনই বলেছিলাম। তুমি শুধু শুধু জেদ ধরলে—আকাশে এমন মেঘ, তার মধ্যে কেউ বেরোয়?

ঝর্নামাসি বললেন, তুমি মোটেই মেঘের কথা বলোনি!

রবীনমেসো বললেন, বেরুবার সময় মেঘের ডাক শুনতে পাওনি? আজই ফেরার এমন কি দরকার ছিল?

ঝর্নামাসি বললেন, পর পর দুটি মেয়ে যেখানে আত্মহত্যা করে, সেখানে কেউ আর থাকে?

রবীনমেসো বললেন, মোটেই পর পর নয়, মাঝখানে ফর্টি ইয়ার্স! গাড়ি সম্পর্কে ভাল করে খোঁজ খবর না নিয়ে—

জানতুম, এবার সব দোষ আমার ওপর পড়বে। গাড়ি সম্পর্কে নিশ্চিত ভাবে কিছু বলা যায়? সকালবেলা এই জিপটা আমার সামনেই তো বেশ তেজের সঙ্গে ছুটে গেল। নতুন গাড়িও কি হঠাৎ খারাপ হয় না?

ঝর্নামাসি মুখে কিছু না বলে শুধু করুণ ভাবে তাকালেন আমার দিকে।

আমি বললুম, এ যা বৃষ্টি, নিশ্চয়ই নিম্নচাপ, আজ ও বাড়িতে থাকলে শুধু জানলা নয়, ঘরের ছাদও ভেঙে পড়তে পারত।

ঝর্নামাসি সঙ্গে সঙ্গে বললেন, ঠিক বলেছিস। এতক্ষণে বোধহয় ভেঙেও পড়েছে।

রবীনমেসো বললেন, এরকম বৃষ্টির মধ্যে সারারাত বসে থাকলে ছেলে-মেয়ে দুটোর নির্ঘাত অসুখ করবে।

টিনা ও রণ অবশ্য একেবারেই বিচলিত নয়। কী একটা গানের লাইন নিয়ে ওরা তর্ক করে যাচ্ছে।

বৃষ্টির ছাঁট খানিকটা কমলেও পড়ে যাচ্ছে অনবরত। নিম্নচাপের বৃষ্টি সহজে থামে না, কাগজ পড়ে আজকাল এ সব আমরা জেনে গেছি।

ঝর্নামাসি বললেন, এখানে কাছাকাছি হোটেল নেই।

রবীনমেসো বললেন, তোমার মাথা খারাপ? গ্রামের মধ্যে হোটেল!

রণ বলল, মা, লেট্স গো টু আ মোটেল!

টিনা বলল, গাড়ি চলছে না, কী করে মোটেলে যাবি?

রবীনমেসো বললেন, নীলু, একটু খোঁজ নাও না, কাছাকাছি কোথাও থাকার জায়গা পাওয়া যাবে নাকি?

ঝর্নামাসি বললেন, ড্রাইভার গেল কোথায়?

তাই তো, টিভূতি এত বৃষ্টির মধ্যেও গাড়িতে ওঠেনি, বনেট খুলে কী সব ঘাঁটাঘাঁটি করছিল। এখন বনেট ফেলা, সে নেই।

রবীনমেসো বললেন, সে ব্যাটা আমাদের ফেলে পালাল?

হিসিটিসি করতে গেছে হয়তো, আমি নেমে পড়ে এদিক ওদিক দেখলুম।

চেঁচিয়ে ডাকলুম, ড্রাইভার ভাই! টিভূতিবাবু!

কোনও সাড়া নেই।

আর একবার ডাকতেই শুনতে পেলুম, অত চেল্লাচ্ছেন কেন? এই তো আমি এখানে!

এখানে মানে, কোথায়? তাকে দেখা যাচ্ছে না, গলা শোনা যাচ্ছে।

টিভূতি জিপটার তলায় ঢুকে শুয়ে আছে।

বাঃ, বেশ ভাল জায়গা, গায়ে বৃষ্টি লাগবে না।

একটু নিচু হয়ে বললুম, একবার বেরিয়ে আসবেন ভাই?

—যা বলবার ওইখান থেকেই বলুন না!

—এখানে কাছাকাছি কোথাও থাকার জায়গা পাওয়া যাবে?

—বাঁ পাঁশে কোতুলপুর গাঁয়ে চলে যান!

গাড়ির ভেতর থেকে ঝর্নামাসি বললেন, না, না, আমি ওই গ্রামে যাব না! ডান পাশে কী আছে?

টিভূতি বলল, ডান পাশে শুধু মাঠ। এ মাঠ পেরিয়ে সীতারামপুর পৌঁছতে রাত ভোর হয়ে যাবে।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, অন্ধকারে তো বিশেষ কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কোতুলপুর কত দূরে?

টিভূতি বলল, হেঁটে গেলে বারো মিনিট, আর সাইকেলে পাঁচ মিনিট।

আমাদের কাছে সাইকেল নেই, সুতরাং ও হিসেবটা না জানালেও চলত।

টিভূতি এবার বেরিয়ে এসে বলল, আপনারা ছাতা আনেননি?

শীতকালে ছাতার কথা কে ভাববে? যাই হোক, ভিজতে তো কিছু বাকি নেই, হেঁটেই যেতে হবে বৃষ্টির মধ্যে। কোতুলপুরে কোথায় থাকা যায়?

টিভূতি জানাল যে, কোতুলপুর খুবই নগণ্য গ্রাম। পাকা বাড়ি মাত্র দু'খানা। একখানা মহাজন দীনবন্ধু সামন্তর, আর একটা ইস্কুলবাড়ি। এর মধ্যে দীনবন্ধু সামন্ত নাকি অতি চশমখোর, হাড় কেপ্পন, গরিবের রক্ত চুষে খায়, বাড়িতে কুকুর আর বন্দুক আছে। সে বাড়িতে ঢুকতে দেবে কি না সন্দেহ।

যার নাম দীনবন্ধু, সে গরিবের রক্ত চুষে খায়? নামের কী মহিমা! যাক গে, ওসব নিয়ে এখন মাথা ঘামাবার সময় নেই। যে বাড়িতে অপমানিত ও প্রত্যাখ্যাত হবার সম্ভাবনা আছে, সেখানে না যাওয়াই ভাল।

তা হলে ইস্কুলবাড়িতে গিয়ে মাথা গোঁজার চেষ্টা করাই ভাল।

টিভূতি বলল, ইস্কুল অবশ্য জবর দখল হয়ে আছে। তবু সেখানেই যেতে পারেন।

ইস্কুল বাড়ি জবর দখল হয়ে গেছে মানে? এ রকম তো কখনও শুনিনি!

অনেক কিছুই তো আমরা শুনিনি কিংবা জানি না।

এ বছর দুর্গা পুজোর সময় পুজো প্যান্ডেলে আগুন লাগে। এমনই ভয়াবহ আগুন যে তা ছড়িয়ে কাছাকাছি দশখানা বাড়িও ভস্মীভূত হয়ে যায়। পুড়েও মরেছে একটি পাঁচ বছরের শিশু।

ওরা সব গরিব মানুষ, নতুন করে বাড়ি বানাবার সামর্থ্য নেই। পুজোর সময় ইস্কুল

www.amarboi.com

ছুটি ছিল, সবাই সে বাড়িতে গিয়ে উঠেছিল। দু-একটা রাজনৈতিক দলের নেতা এসেছিল সমবেদনা জানাতে। এস ডি ও সাহেব পরিদর্শন করে বলে গিয়েছিলেন, এ রকম দুর্ঘটনায় গৃহহারাদের বাড়ি বানাবার জন্য অর্থ সাহায্য করার সরকারি স্কিম আছে। তিনি ব্যবস্থা করে দেবেন।

সেই এস ডি ও বদলি হয়ে গেলেন এক মাসের মধ্যে। নতুন এস ডি ও এসে কাজ বুঝে নিতে না নিতে ফসল কাটা নিয়ে দাঙ্গা হল সীতারামপুরে, তখন কোতুলপুরের কথা সবাই ভুলে গেল।

সেই লোকগুলোও জেদ ধরেছে, সরকারি টাকা না পেলে তারা স্কুল বাড়িও ছাড়বে না। তারা সেখানেই রয়ে গেছে, স্কুল এখন বন্ধ!

তা হলে?

টিভূতি বলল, ওই ইস্কুল বাড়িতেই যান। ওরা গরিব লোক হলেও বিদেশি মানুষদের দেখে একটা রাতের জন্য কিছু ব্যবস্থা করে দেবে ঠিকই। জগন্নাথের খোঁজ করবেন—

আপনি যাবেন না?

টিভূতি বলল, মাথা খারাপ নাকি? এর মধ্যে আমার গাড়িটা যদি কেউ হাপিস করে দেয়? আমি শুয়ে থাকব গাড়ির তলায়।

টিভূতি অবশ্য দয়া করে, টর্চ দেখিয়ে খানিকটা পথ আমাদের এগিয়ে দিতে রাজি হল।

॥ ৮ ॥

ইট বাঁধানো সরু রাস্তা, তার ওপর দিয়ে আমরা হাঁটতে লাগলুম লাইন করে।

প্রথমে কিছু ধান জমি পেরুবার পর, এক একটা মাটির বাড়ি চোখে পড়ে, প্রায় সব বাড়িই অন্ধকার, দু' একটাতে হারিকেন জ্বলছে। সে সব বাড়িতে এতজনের আশ্রয় চাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

বৃষ্টি পড়েই চলেছে।

একটা পুকুরের পাড়ে এসে, অদূরের আলো দেখিয়ে টিভূতি বলল, ওই যে ইস্কুল বাড়ি, সোজা চলে যান।

কেন যে সে আর একটু এগিয়ে পুরোটা পৌঁছে দিল না, কিংবা সেখানকার লোকদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিল না, তা কে জানে।

সে কথা আর জিজ্ঞেস করতেও ইচ্ছে হল না।

মনে মনে আর একটাও ভয় পাচ্ছি।

ইস্কুল বাড়ি যারা জবর দখল করে আছে, তারা গরিব মানুষ, গৃহহারা, সরকারি অব্যবস্থায় নিশ্চয়ই খেপে আছে। আমাদের মতন ভদ্রলোক শ্রেণীর ওপরেও ওদের রাগ থাকার কথা। আমাদের যদি জায়গা না দেয়!

সরকারের প্রতিনিধি মনে করে যদি আমাদের তাড়া করে?

www.amarboi.com

এবার দেখা যাবে, নীললোহিত, তোমার কেরামতি। ঝর্নামাসি আর রবীনমেসো তো গ্রামের মানুষের সঙ্গে কথা বলতেই জানেন না।

ইস্কুল বাড়ির চওড়া বারান্দায় একটা উনুনে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। তার চারপাশ ঘিরে বসে আছে বেশ কয়েকটি ছায়ামূর্তি।

আমরা কাছাকাছি যেতেই দুটো কুকুর ঘেউ ঘেউ করে তেড়ে এল।

আমি রণের হাত ধরে বললুম, ভয়ের কিছু নেই। গ্রামের কুকুর সহজে কামড়ায় না, এমনিই চ্যাঁচায়।

লোকগুলি কুকুরের চ্যাঁচানি শুনে ঘুরে তাকিয়েছে এদিকে।

আমি ঝর্নামাসিদের অপেক্ষা করতে বলে এগিয়ে গেলুম একা। ওখানে অন্তত দশ-বারোটি লোক, সবাই নিস্তব্ধ, সকলের দৃষ্টি সমান্তরাল।

বুক ঢিপ ঢিপ করছে। প্রথম প্রতিক্রিয়াটাই আসল। প্রথমেই যদি তেড়ে না আসে, তা হলে যুক্তি তর্ক দিয়ে অনেক কিছু বোঝানো যায়।

যতদূর সম্ভব অসহায় মুখ করে আমি বললুম, নমস্কার। আমরা বেশ বিপদে পড়ে আপনাদের কাছে এসেছি। জগন্নাথবাবু আছেন কি?

গায়ে একটা কাঁথা জড়ানো, পাকা চুল, সবচেয়ে প্রবীণ মানুষটি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, কী ব্যাপার?

অন্য একজন চোখ সরু করে বলল, এনাকে তো আজ সকালে দেখেছি মল্লিক বাড়ির পুকুরের ধারে।

আর একজন বলল, যে-পুকুরে টেঁপি ডুবে মরেছে?

আমি বললুম, ও বাড়িতে আমরা কয়েকদিনের জন্য বেড়াতে এসেছিলুম। আজ ফেরার পথে গাড়িটা খারাপ হয়ে গেছে, তার ওপরে এমন বৃষ্টি, এখন আর কোথাও যাবার উপায় নেই।

ওদের একজন বলল, বৃষ্টি তো ধরে এল দেখছি!

সত্যিই তাই। এমনই লক্ষ্মীছাড়া বৃষ্টি, ঠিক এখনই তাকে থামতে হবে?

জগন্নাথ নামে ব্যক্তিটি জিজ্ঞেস করলেন, আপনি আমার নাম জানলেন কী করে?

আমি বললুম, আমাদের জিপ গাড়ির ড্রাইভার টিভূতিবাবু বললেন, আপনি কিছু সাহায্য করতে পারেন।

জগন্নাথ বললেন, টিভূতি? মানে আমাদের ভূতো?

সবাই হো-হো করে হেসে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে যেন আমার গা থেকে জ্বর নেমে গেল। যারা হাসে, তারা মারতে আসে না।

একজন বললেন, ভূতোর গাড়ি ভাড়া নিয়েছেন? আর গাড়ি পেলেন না? ও নিজে যেমন পাগল, ও গাড়িখানাও তেমন পাগল!

ঘর থেকে কয়েকজন মহিলাও বেরিয়ে এসেছেন এর মধ্যে। তাঁদের একজন বললেন, সবাই যে ভিজে নেয়ে গেছে। ওপরে উঠে আসুন গো। ছেলেমেয়ে দুটোর গা-মাথা না মুছলে যে জ্বর হবে!

www.amarboi.com

একজন একটা গামছা দিয়ে রণের মাথা মুছিয়ে দিতে এলেন।

সে গামছার চেহারা ও রং দেখে চোখ বড় বড় হয়ে গেল ঝর্নামাসির। রণ কিন্তু আপত্তি জানাল না।

এরপর আর প্রায় কিছুই বলতে হল না আমাকে।

নিজেদেরই বাড়ি ঘর নেই, তবু অতিথিকে আশ্রয় দেবার রীতি যেন রয়ে গেছে মজ্জায় মজ্জায়।

রবীনমেসোর কম্পিউটারটি ছাড়া আমরা ব্যাগে প্রায় আর কিছুই আনিনি। এক মহিলা জোর করে ঝর্নামাসির ভিজে শাড়ি ছাড়িয়ে নিজের একটি শাড়ি পরালেন, আমাদেরও সেই অবস্থা। আমি পেলুম একটা লুঙ্গি। নীললোহিত কখনও লুঙ্গি পরে না, কিন্তু এখানে আর উপায় তো নেই।

বড় উনুনটায় খিচুড়ি রান্না হচ্ছে। সবার সঙ্গে আমরাও বসে গেলাম মেঝেতে, কলাপাতায় গরম গরম খিচুড়ি, আর কিছু নেই, খিচুড়ির মধ্যে রয়েছে আলু, কাঁচা লঙ্কা দিয়ে এই বৃষ্টির রাতে তারই স্বাদ যেন অমৃত।

খাওয়ার সময় একটা মজার ব্যাপার হল।

একটি অল্প বয়েসি মেয়ে ঝর্নামাসির বাহু ছুঁয়ে বলল, কী সুন্দর, কী সুন্দর, ঠিক যেন দুর্গা ঠাকুর।

পাশের এক মহিলা মুখ ঝামটা দিয়ে বললেন, তুই চুপ কর তো! পুজোর সময়ই তো ঘরবাড়ি সব পুড়ল। দুর্গা রক্ষা করলেন?

অল্প বয়েসি মেয়েটি বলল, ওমা, ঠাকুর দেবতার নামে বুঝি দোষ দিতে হয়! ঝড়-বৃষ্টি-আগুন-ভূমিকম্প এসব যখন ভগবান ঘুমিয়ে থাকেন, তখনই তো হয় গো।

মুখ ঝামটা দেওয়া মহিলা বললেন, ভগবান ঘুমোয়? তুই দেখিছিস!

ঝর্নামাসি লজ্জা পেয়ে অল্প বয়েসি মেয়েটির থুতনি ছুঁয়ে বললেন, তুমিও তো খুব সুন্দর!

মুখ ঝামটা দেওয়া মহিলা বললেন, সুন্দর হলেই ঠাকুর দেবতার কথা মনে করতে হবে কেন? তুমি মা ভেবো না, তোমাকে সুন্দর বলায় আমি রাগ করিছি, তুমি বড়ই সুন্দর গো। তুমি ইন্দিরা গান্ধী আর বৈজয়ন্তীমালার চেয়েও বেশি সুন্দর!

কে বলে গ্রামের মানুষ কোনও খবর রাখে না?

ইস্কুলের অফিসঘরটিই শুধু এরা দখল করেনি, সেটা তালাবন্ধ থাকে। চৌকিদারকে ডেকে সেই তালা খোলানো হল এক রাত্রির জন্য।

চেয়ার টেয়ার সরিয়ে অন্যরাই মেঝেতে চট বিছিয়ে, মাদুর পেতে তৈরি করে দিল বিছানা। নিজেদের কম্বল ধার দিল। এদের আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয়ে ঝর্নামাসি সে সবের পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে কোনও প্রশ্ন তুললেন না। রবীনমেসো পর্যন্ত চুপ।

আমার জায়গা হয়েছে জগন্নাথবাবুর পাশে।

সবাই শুয়ে পড়ার পর আমি বারান্দায় বসে একটা সিগারেট ধরালুম।

যাদের আমেরিকায় দু'খানা বাড়ি ও ফ্ল্যাট, কলকাতায় ফ্ল্যাট, গ্রামে বিশাল প্রাসাদ, তারা আজ রাত কাটাচ্ছে একদল সর্বহারার দাক্ষিণ্যে। একেই বুঝি বলে নিয়তির

নির্বন্ধ। মাটিতে বসে ভাগ নিয়েছে তাদের অন্ন।

এ সব কথা মুখে বলার দরকার নেই, তবু মনে আসেই।

উনুনটা নিবু নিবু, কাছে বসে তাপ নিতে আরাম লাগছে বেশ। বৃষ্টি থেমে যাবার পর শীত পড়েছে আরও জাঁকিয়ে। তবু আমার বারান্দা থেকে উঠে যেতে ইচ্ছে করছে না।

আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে, ফুটেছে মৃদু মৃদু জ্যোৎস্না। ঝিঁঝি ডাকছে নিস্তব্ধতা ফুঁড়ে।

হঠাৎ দেখি, একজন রমণী বেরিয়ে এল ঘর থেকে। কম্বলে গা ঢাকা। বারান্দা থেকে নেমে পেরিয়ে গেল সামনের চাতাল।

বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। কে? মুখটা দেখিনি, তবু যেন মনে হয় ঝর্নামাসি। এতরাত্রে কোথায় যাচ্ছেন?

আমিও উঠে অনুসরণ করতে লাগলুম পা টিপে টিপে।

চলার ছন্দেও মানুষকে চেনা যায়। ঝর্নামাসি ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। তিনি চলে এলেন পুকুর পাড়ে।

অল্প জ্যোৎস্নায় বোঝা গেল, এ পুকুরটাও বেশ বড়, দিঘিই বলা চলে, ঘাট বাঁধানো, দু'পাশে বসবার জায়গা।

মালতী নামের মেয়েটি এ পুকুরে ঝাঁপ না দিয়ে অত দূরে মল্লিকদের পুকুরে গেল কেন? গ্রামের সব মেয়েরাই সাঁতার জানে, শুধু ঝাঁপ দিলে তো ডুবে মরার কথা নয়। তা হলে কী—

আপাতত সেই রহস্যের সমাধানের কথা চিন্তা না করে আমি মন দিলুম ঝর্নামাসির দিকে। ঝর্নামাসি সাঁতার জানেন না, জলকে ভয় পান, তবু এত রাতে পুকুর পাড়ে এলেন কেন?

সিঁড়ির কয়েক ধাপ নেমে তিনি জলে পা দিতেই আমি ডেকে উঠলুম, ঝর্নামাসি!

তিনি মুখ ফেরালেন খুব চমকিতভাবে। আকাশের আলোয় সেই মুখখানি মনে হল যেন শ্বেত পাথরে গড়া। তারপর কাঁদলেন দু হাতে মুখ ঢেকে।

আমি খুব কাছে এসে তাঁর পিঠ ছুঁয়ে জিজ্ঞেস করলুম, কী হয়েছে, ঝর্নামাসি?

তিনি উত্তর না দিয়ে ওপরে উঠে এসে বসলেন ঘাটলায়। একটু পরে বললেন, নীলু, আজ সকাল থেকে আমার খুব কাঁদতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু কোথায় বসে কাঁদব...ছেলেমেয়েদের জন্য চিন্তা—

আমি বললুম, এখন তো সব ঠিক হয়ে গেছে, কাল সকালে একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবেই।

ঝর্নামাসি ধরা গলায় বললেন, সে জন্য নয়। ওই মালতী বলে মেয়েটা... জলে ভাসছিল... ওকে দেখার পরেই... নীলু, একটা কথা কারুকে কখনও বলিনি, মন থেকে কতবার তাড়াবার চেষ্টা করেছি, যায় না। এক এক সময় যেন বুক ফেটে বেরিয়ে আসতে চায়...নীলু, বিয়ের আগে আমিও একবার জলে ডুবে মরতে চেয়েছিলাম।

www.amarboi.com

কিছু একটা বলতে হয়, তাই আমি বললুম, সে তো অনেকদিন আগেকার কথা।

ঝর্নামাসি ঘোরলাগা গলায় বললেন, হ্যাঁ, অনেকদিন আগে। কলেজে পড়ি, জামশেদপুরে...একটা দারুণ ভুল করে ফেলেছিলাম, আমার দাদার এক বন্ধু, আমাকে সিডিউস করেছিল, তারপর পেটে...মরবই ঠিক করেছিলাম, পারিনি রে, ভীতু আমি, নিজে মরিনি, পেটের সন্তানটিকে...

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বললেন, এ সব কখনও হারিয়ে যায় না। ওই যে রমলা, যে ওই পুকুরে অনেকদিন আগে, তারও পেটে হয়তো সন্তান ছিল, তারপর এই মেয়েটা, এখান থেকে অত দূর গিয়ে...যেন আমাকেই মনে করিয়ে দেবার জন্য...কেন আমি ওখানে গেলাম—

আর কোনও কথা মানায় না। যুক্তি দেখাবারও প্রয়োজন নেই। আমি চুপ করে রইলুম, ঝর্নামাসি আবার কাঁদতে লাগলেন। এখন ওঁকে কিছুক্ষণ কাঁদতে দেওয়াই তো ভাল। কান্নায় বুক খালি হয়ে যায়।

গভীর স্তব্ধ রাত, পুকুরের জলে চিকচিক করছে জ্যোৎস্না, এক অসাধারণ রূপসী রমণী আমার সামনে বসে কাঁদছে। আড়াল থেকে কেউ দেখলে ভাববে প্রেমের দৃশ্য।

হ্যাঁ, প্রেমই তো, আমি যে ঝর্নামাসির অন্ধ প্রেমিক। উনি তার কিছু জানেন না, না জানলেই বা ক্ষতি কী? কিংবা সত্যিই কি জানেন না? বোঝেন না?

প্রেম তার প্রতিদান চায়। সমস্ত জীবনের মধ্যে এই যে একটা অন্যরকম রাত, যে কথা ঝর্নামাসি কারুকে বলেননি, শুধু বললেন আমাকেই, এই যে বিশ্বাস, এও তো এক রকমের প্রেম। এই যে দ্বিধাহীন কান্না, যেন আত্মসমর্পণের মতন। ঝর্নামাসির হাতও ধরলুম না, শুধু কান্না ভরা মুখখানি এমন এক রকম সৌন্দর্য নির্মাণ করল, সে রকম উপহার ক'জন মানুষ পায়?

www.amarboi.com

www.amarboi.com

কর্ণ-রুমা বউদি সংবাদ

www.amarboi.com

www.amarboi.com

আমার কোনও বন্ধু যদি কোনও দুপুরে এসে বলে, চল নীলু, পরশু আমরা গরলগাছায় একটা ব্যাঙ্ক ডাকাতি করতে যাব, তুই আমাদের দলে থাকবি তো, তা হলে আমি কী উত্তর দেব?

ব্যাঙ্ক ডাকাতি ভাল না খারাপ, আমার ডাকাত হবার যোগ্যতা আছে না নেই, তা ভাবার আগেই আমার মুখ দিয়ে একটা প্রশ্ন বেরিয়ে আসবে, গরলগাছাটা কোথায়?

কোনও নতুন জায়গার নাম শুনলেই আমার কৌতূহল হয়। সেখানে একবার যেতে ইচ্ছে করে। গরলগাছা নামটাও অদ্ভুত ধরনের।

বন্ধুটির নামটা বলা ঠিক হবে না। ধরা যাক, তার নাম বাপ্পা। বেশ গ্যাঁট্টাগোঁট্টা চেহারা, গোঁফ-দাড়ি নেই, কিন্তু মাথায় বাবরি চুল। চোখ দুটো গাঁজাখোরদের মতন লালচে ধরনের, যদিও সে গাঁজা খায় না।

সে পকেট থেকে একটা হাতে-আঁকা ম্যাপ বার করে আমাকে বোঝাল। হাই ওয়ে থেকে কতটা ভেতরে যেতে হবে, গরলগাছায় নতুন একটা ব্যাঙ্ক হয়েছে। সেখানে প্রতি শনিবার আলু ব্যবসায়ীদের টাকা জমা পড়ে। এই শনিবার আবার সেখানে এক মন্ত্রী একটা কালভার্ট উদ্বোধন করতে যাবেন, তাই পুলিশ ওদিকে ব্যস্ত থাকবে। বাপ্পা নিজেই চালাবে একটা জিপ গাড়ি। সেটা স্টার্ট দেওয়াই থাকবে, আমাকে শুধু ব্যাঙ্কের দরজার সামনে দুটো বোমা ছুঁড়তে হবে। ব্যস, আর কিছু না!

প্রথমে উৎসাহের ঝোঁকে মনে হবে, বাঃ, বেশ ভালই তো। জিপ গাড়িতে বেড়াতে যাওয়া হবে অনেকটা, গরলগাছা গ্রামটা দেখা হবে, তারপর পুলিশ যদি তাড়া করে, তা হলে সিনেমার মতন দারুণ স্পিডে পালানো, রাস্তার দু'পাশের লোক হাঁ করে দেখছে...।

এ সব কল্পনা করতে করতেই নিজেকে সামলে নিলুম। বাপ্পাটা বলে কী? ব্যাঙ্ক ডাকাতি? এ কি ছেলেখেলা নাকি? এরকম চোর-পুলিশ খেলায় পুলিশ সত্যি সত্যি গুলি চালায়। অনেক সময় রাস্তার লোক হাঁ করে তাকিয়ে না থেকে গাছ ফেলে গাড়ি থামিয়ে দেয়। তারপর ডাকাতদের কোনও কথা বলার সুযোগ না দিয়েই প্রথমে তাদের পকেট মারে। টাকা-পয়সা, ঘড়ি-কলম যা থাকে হাতিয়ে নেয়। তারপর পেটাতে পেটাতে ছাতু করে দেয়।

আমি বললুম, না ভাই, আমি ওসবের মধ্যে নেই। ভদ্দরলোকের ছেলে ডাকাতি করতে যাব কেন? জীবনে কখনও বন্দুক-পিস্তল ছুঁইনি।

বাপ্পা বলল, তুই এখনও সেকেলে ধারণা নিয়ে পড়ে আছিস। ভদ্দরলোকের ছেলে আবার কী? ওসব উঠে গেছে। ভদ্দরলোক থাকলে ছোটলোকও থাকতে হয়। এখন তুই কারওকে ছোটলোক বলতে পারবি? সবাই জনসাধারণ। আর তোকে বন্দুক-

www.amarboi.com

পিস্তল ছুঁতেও হবে না। আমাদেরই শর্ট আছে। তুই শুধু দুটো বোমা ছুঁড়বি শেষ কালে, যাতে কেউ আমাদের চেইজ করতে সাহস না পায়।

আমি ভাই কোনওদিন বোমাও ছুঁড়িনি। পারব না।

আগে থেকেই পারব না বলছিস কেন? খুব সহজ কাজ।

যদি হাতেই বোমা ফেটে যায়?

ধ্যাত! বসিরহাট থেকে ভাল বোমা আনাচ্ছি। ফরেন মাল। আগেই ফাটবে কেন?

ফাটুক বা না ফাটুক, ভাই বাপ্পা, আমার দ্বারা এ কাজ হবে না।

শোন নীলু, আমরা খবর নিয়েছি, অন্তত সাড়ে তিন লাখ টাকা পাওয়া যাবেই। সেটা সমান ভাগ হবে আমাদের পাঁচ জনের মধ্যে। তুই এইটুকু কাজের জন্য তোর ভাগ পেয়ে যাবি সাতচল্লিশ হাজার।

অঙ্কটা মোটেই ঠিক হল না। যাক গে, অত খুঁটিনাটি ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই।

আমাকে দৃঢ়ভাবে বলতে হল, নো! আমি এসব কাজ করতে পারব না, আমার টাকার দরকার নেই।

বাপ্পা কয়েক পলক আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, তা হলে তো খুব মুশকিল হল।

মুশকিল আবার কী? আমি ছাড়া অন্য লোক নেই?

তা নয়। বন্ধুদের কাছে বড় মুখ করে বলে এসেছি, নীলুটা বেকার বসে আছে, ওকে বললেই রাজি হয়ে যাবে। অন্য অনেক ছেলে মুখিয়ে আছে, আমি তোর উপকারই করতে চেয়েছিলুম। তুই রাজি হলি না। এখন তো তোকে হাপিস করে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

হাপিস মানে?

হাপিস মানে হাপিস! তুই আমাদের প্ল্যানটা জেনে ফেললি, এখন তুই যদি পুলিশের কাছে গিয়ে সব ফাঁস করে দিস? সেই জন্য তোকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতেই হবে আগে।

না, না, আমি পুলিশের কাছে তোদের নামে লাগাতে যাব কেন? আমি পুলিশ-টুলিশ চিনি না।

তুই না হয় লাগাতে গেলি না। কিন্তু কোনও কারণে পুলিশ যদি তোকে ধরে, জেরার মুখে তুই ঠিক আমাদের নাম বলে দিবি!

তা বলব কেন? আমি বলব, আমি কিছু জানি না। ওই শনিবার আমি বাড়ি থেকে বেরোবই না।

পুলিশের জেরা কেমন হয় তুই জানিস? তোর আঙুলের ডগায় আলপিন ফুটিয়ে দিলে সহ্য করতে পারবি?

খুব লাগে বুঝি?

জ্বলন্ত সিগারেট ঘাড়ে চেপে ধরবে। হাঁটুর ওপর একটা বস্তা চাপা দিয়ে তার ওপর হাতুড়ি দিয়ে পেটাবে। তাতে হাড়-ফাড় গুঁড়ো হয়ে যাবে, কিন্তু রক্ত বেরুবে

www.amarboi.com

না।

যাঃ, আমি কোনও দোষ না করলেও আমাকে এসব করবে কেন?

তুই যা ভীতু রে নীলু, তোর একটা আঙুলে আলপিন ফোটালেই তুই গড়গড় করে আমাদের নামগুলো বলে দিবি! সেই জন্য তোকে আমাদের আগেই হাপিস করে দেওয়া উচিত কি না বল? তুই নিজেই ন্যায্য কথাটা বল। হয় তুই আমাদের দলে যোগ দিবি, আর নইলে তোকে আগেই মরতে হবে। তুই কোনটা চাস, ফাইনালি বলে দে! আর যদি মরতে চাস, তা হলে কোনটা তোর চয়েস, পেটে ছুরি, না গলায় গুলি?

আসলে এটা একটা ধাঁধা।

উত্তরটা একেবারে প্রথমেই আছে। যদি।

আমাকে এরকম প্রস্তাব বা শাসানি এখনও পর্যন্ত কেউ দেয়নি। কোনও হবু ব্যাঙ্ক ডাকাতের সঙ্গেও আমার পরিচয় নেই। তবু মাঝে মাঝেই আমি এরকম একটা পরিস্থিতির কল্পনা করে ভয় পাই।

অন্য কারও গুপ্ত কথা জেনে ফেলাটাই বিপজ্জনক।

মানুষের এমনই প্রবৃত্তি, অন্যদের জীবনের গোপন থেকে গোপনতর, গভীর থেকে গভীরতর দিকে উঁকিঝুঁকি মারার একটা অদম্য ইচ্ছে থাকে সব সময়।

ধরাবাঁধা রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন যাতায়াত করছে অসংখ্য মানুষ তাদের মধ্যে কেউ একটু অন্য দিকে বেঁকে গেলেই আমাদের চোখ তাকে অনুসরণ করতে চায়।

গত মাসের আঠেরো তারিখে ঠিক বিকেল পাঁচটা চল্লিশ মিনিটে পায়রাডাঙায় হঠাৎ একটা দৃশ্য আমার মাথার মধ্যে আটকে গেল। সেই দৃশ্যটির মধ্যে যেন অগাধ রহস্য আছে।

পায়রাডাঙা এমন কিছু দূর নয়। সেখানে বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থান কিছু নেই। লোকে শখ করে বেড়াতে যায় না। ভাগ্যিস যায় না, ভারী চমৎকার জায়গা, বেশি লোকজনের ভিড়ভাট্টা হলে সেই পল্লীটির বিশুদ্ধতা নষ্ট হয়ে যেত!

ডায়মন্ডহারবার থেকে কাকদ্বীপ যাবার পথে মূল রাস্তা থেকে বাঁদিকে বেঁকে যেতে হয়, তারপর বড় জোর আড়াই মাইল। ডায়মন্ডহারবার কিংবা কাকদ্বীপে সারা বছর ট্যুরিস্ট পার্টির উপদ্রব লেগেই আছে। বড় রাস্তা দিয়ে গাড়ি যায় অজস্র, কিন্তু এ রাস্তাটায় কেউ ঢোকে না, তার কারণ, রাস্তাটা গাড়ি চলবার উপযুক্ত নয়, পিচের নয়, ইটের, ভ্যান গাড়ি যায় লাফিয়ে লাফিয়ে। মাঝখানে একটা খালের ওপর নড়বড়ে সেতু।

যত ছোট জায়গাই হোক, তারও একটা ইতিহাস থাকে।

পায়রাডাঙা নাম হল কেন, তা অবশ্য কেউ জানে না। এমন নয় যে সেখানে হাজার হাজার পায়রার বসতি। পায়রা দেখাই যায় না বলতে গেলে। শান্তিনিকেতনের কাছে ভুবনডাঙায় কি ভুবন আছে। না, ভুবন কারও নাম?

যাই হোক, ইদানীং নাম বদলাবার ধুম পড়ে গেছে, পায়রাডাঙার নামও বদলেছে সরকারিভাবে। এ গ্রামের বিষ্ণুপদ মান্না নামে এক ব্যক্তি মাছের ভেড়িতে হঠাৎ ধনী হয়েছিলেন, তিনিই পঞ্চায়েতের সভা ডেকে নাম বদলের প্রস্তাব দেন। তাঁকে অতি

www.amarboi.com

বিনয়ী ব্যক্তি বলতেই হবে, তিনি প্রাইমারি ইস্কুলটি সারাবার টাকা দিয়েছেন, হেল্‌থ সেন্টারের জন্য জমি দিয়েছেন, (এখনও বাড়িটা তৈরি হয়নি পুরোপুরি) অর্থাৎ বেশ প্রভাবশালী ব্যক্তি। তিনি নিজের নাম বা তাঁর মায়ের নাম চাপিয়ে দিতেই পারতেন, তা দেননি, তাঁর বাড়ির সংলগ্ন একটি রামকৃষ্ণ-মন্দির আছে, তাই পায়রাডাঙার নতুন নাম হয়েছে রামকৃষ্ণপুর। কেউ আপত্তি করেনি।

কিন্তু পুরনো নামটা মুছে ফেলাও সহজ নয়।

কলকাতায় ইন্দিরা গান্ধীর নামে একটা রাস্তা আছে। কোনটা, ক'জন লোক বলতে পারে? এখনও সবাই বলে রেড রোড। জওহরলাল নেহরু রোড আজও চৌরঙ্গি। আর লেনিন সাহেবের এত জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও লেনিন সরণির বদলে ধর্মতলাই বলে বেশির ভাগ মানুষ।

রামকৃষ্ণপুরও লোকের মুখে মুখে এখনও পায়রাডাঙা। আমারও এই নামটাই পছন্দ। রামকৃষ্ণের নামে আরও অনেক জায়গা আছে, শান্তি পারাবতদের নামও একটা গ্রামের সঙ্গে জড়িয়ে থাক না!

উক্ত বিষ্ণুপদ মান্নারই উদ্যোগে এই পায়রাডাঙায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নতুন পোস্ট অফিস। সেখানকার সহকারী পোস্টমাস্টার দুর্লভরতন বসু আমার বন্ধু। সেই সূত্রে পায়রাডাঙার সঙ্গে আমার পরিচয়।

যাদের নাম দুর্লভরতন হয়, তাদের সেই নামে ডাকার মতন লোক খুঁজে পাওয়া যায় না। ছোটবেলা থেকেই সে শুধু দুলু, এখানে দুলুবাবু। আমরা কলেজজীবনে বলতুম ডি আর, তার থেকে মাইডিয়ার।

আমাকে তো সবাই নীলু বলেই ডাকে। অনেকে বলত, দুলু আর নীলু যেন দুই যমজ ভাই।

আমাদের দু'জনের চেহারার মোটেই মিল নেই, তবে স্বভাবে কিছু কিছু মিল আছে হয়তো। দুলুর মুখভর্তি খোঁচা খোঁচা দাড়ি, ও বড় দাড়ি রাখে না, দাড়ি একেবারে কামায় না। এটাই বুদ্ধিজীবীদের চিহ্ন। প্যান্টের ওপর হাফ-হাতা পাঞ্জাবি পরে।

পায়রাডাঙার ডাকঘরের সঙ্গে একটা কোয়ার্টারও তৈরি হয়েছে, সেটা শুধু প্রধান পোস্টমাস্টারবাবুর জন্য। দুলু কিংবা অন্যান্য কর্মচারীদের গ্রামের মধ্যেই বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকার কথা। কিন্তু দুলুর ভাগ্যটা ভাল। প্রধান পোস্টমাস্টারবাবু স্থানীয় লোক, তাঁর নিজের বাড়ি বড় রাস্তার ওপাশে, তিনি এই কোয়ার্টারে থাকতে যাবেন কেন? সেটা তিনি দুলুকে ব্যবহার করতে দিয়েছেন।

আমার পক্ষে সুবিধে এই, আগে থেকে দুলুকে কোনও খবর না দিয়েই পায়রাডাঙা চলে আসা যায় যখন তখন। দু-তিন মাস না গেলে দুলু ডাক পাঠায়।

গত মাসের সেই আঠেরো তারিখ বিকেলে দুলু আর আমি বেড়াতে বেরিয়েছিলাম সাইকেলে। এসব গ্রামে সাইকেলই প্রধান যানবাহন, দুলুর নিজের একটা আছে। আর একটি ওর পিওন রূপলালের। রূপলাল দুলুর সঙ্গেই থাকে। সে-ই রান্নাবান্না করে দেয়।

www.amarboi.com

সত্যজিৎ রায়ের তিন কন্যার পোস্টমাস্টার গল্পের গ্রামের মতন পায়রাডাঙা তেমন অজ পাড়াগাঁ নয়, অত নোংরা-কাদাটাদা নেই, হাড়জিরজিরে বুড়োর দল কিংবা ভয়-দেখানো পাগলও নেই। ইটের রাস্তা হলেও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ফাঁকা ফাঁকা।

সাইকেল চালিয়ে গ্রামটা পার হয়ে গেলে চোখে পড়ে একটা পানের বরজ, তারপর অনেকটা জলা জায়গা।

পানের বরজটা দেখে আমি প্রথমে চিনতে পারিনি। অতখানি জায়গা বেড়া দিয়ে ঘেরা আর ওপরটা ঢাকা কেন? আমার ধারণা ছিল, পানের বরজ বুঝি হয় শুধু মেদিনীপুরে আর ওড়িশায়। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনাতেও পানের বরজ দেখে প্রথমেই মনে হল, কত বিষয়ে আমরা কত কম জানি!

যেন, পানের বরজ বিষয়ে জ্ঞান থাকাটা খুব দরকারি! এ জ্ঞান নিয়ে কী করব? আমি নিজে পানই খাই না! দু-একবার বিয়ে বাড়ির নেমন্তন্ন'র পর বাধ্য হয়ে পানের খিলি মুখে দিয়ে দেখেছি, তারপর আঠেরো ঘণ্টা জিভের কোনও স্বাদই থাকে না!

পরের জলা জায়গাটা অবিন্যস্ত, মনে হয় কোনও সীমানা নেই। মাঝে মাঝে দু-একটা গাছ রয়েছে মাথা উঁচিয়ে। এটা ঠিক মাছ চাষের ভেড়ি বলেও মনে হয় না। হয়তো শীতকালে শুকিয়ে যায়।

প্রথমবার সেই জলাভূমির ধারে সূর্যাস্ত দেখে আমার মুখ ফস্কে বেরিয়ে এসেছিল, আরেঃ, এ তো ক্যালেন্ডারের ছবি হবার মতন!

আমার মনে ছিল না, ছবিটবি নিয়ে কেউ আলটপকা কথা বললেই দুর্লভরতন বসু খুব রেগে যায়। গ্রামের ডাকঘরের সহকারী ডাকবাবু হলে কী হবে, দুলু ছবি-টবি খুব বোঝে। বিশেষজ্ঞ বলা যেতে পারে।

দুলু মুখ বিকৃত করে বলল, ক্যালেন্ডারের ছবি মানে? তুই বুঝি শুধু চুল কাটতে গিয়ে সেলুনে ক্যালেন্ডার দেখিস? ভাল কোম্পানির ক্যালেন্ডারের ছবি আঁকে নামকরা শিল্পীরা। কোনও ভাল শিল্পী সানসেটের ছবি আঁকে? সেই ক্লদ মোনের 'ইম্প্রেশান' নামে ছবিটার পর আর কোনও শিল্পী সূর্যাস্ত ছোঁয় না।

কিন্তু আকাশের পশ্চিম দিকটায় যেন দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে, জলের ওপর লক লক করছে অজস্র লাল শিখা, এটা একটা সুন্দর দৃশ্য নয়? এ দৃশ্য শিল্পীরা ছোঁয় না কেন? মানুষের মুখখানা ঘটি-বাটির মতন করে আঁকাটাই বুঝি এখন আর্ট!

সেলুনগুলোর জন্য বুঝি আলাদা ক্যালেন্ডার তৈরি হয়!

দুলু আমাকে ছবি বিষয়ে আরও জ্ঞান দিতে যাচ্ছিল, হঠাৎ ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল, কুমির! একটা কুমির!

এবারে আমার জ্ঞান দেবার পালা।

গ্রাম-ট্রাম বিষয়ে দুলুর চেয়ে আমি ভাল জানি।

জলাভূমিটার একেবারে ধারের দিকে কিছু কিছু ঘাস জন্মে আছে। সেখানে আদ্ধেকটা জলে আর আদ্ধেকটা পাড়ে যে প্রাণীটা শুয়ে থেকে আমাদের দিকেই তাকিয়ে আছে জুলজুল করে, সেটাকে একটা কিশোর বয়সি কুমিরের মতনই

দেখতে।

আমি বললুম, ওটা কুমির নয়, ওটা গোসাপ।

দুলু বলল, গোসাপ আবার কী? যে-সাপ গোরু খায়?

তুই গোসাপ কাকে বলে জানিস না? ওদের ভাল নাম গোধিকা। তুই মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল' পড়িসনি? সেই যে কালকেতু...

তোর মাথা খারাপ হয়েছে, নীলু? এসব বই বাংলা অনার্সের ছেলেমেয়েরা ছাড়া আর কেউ পড়ে? তুই পড়েছিস?

এ সব ক্ষেত্রে হ্যাঁ পড়েছি বলাটা বোকার মতন শোনায়। সত্যি কথা বলতে কী, আমিও নানা জায়গায় কোটেশান পড়ে গল্পটা জানি, পুরো বইটা উল্টে দেখিনি কখনও।

দুলু আবার জিজ্ঞেস করল, তোর সেই কালকেতুর কী হয়েছিল? গোসাপে কামড়ে দিয়েছিল? এ ব্যাটা যদি আমাদেরও কামড়ায়?

আমি বললুম, না, না, গোসাপ গোরুও খায় না, মানুষকেও কামড়ায় না। দেখবি?

আমি পা দিয়ে ধপাস ধপাস আওয়াজ করে আর হুস হুস বলতেই সেটা মুখ ঘুরিয়ে তড়বড়িয়ে জলে নেমে গেল।

দুলু বলল, কুমিরের মতনই চেহারা, জলে থাকে, অথচ কুমির নয়? ওদের ইংরিজিতে কী বলে?

আমি বললুম, তোর কাছে বেঙ্গলি টু ইংলিশ ডিকশনারি নেই? তাতে দেখে নিস। শুনেছি, এই প্রাণীটা প্রায় লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

তা হলে তোকে একটা রেয়ার জিনিস দেখালুম বল!

আমি আগে গোসাপ দু'বার দেখেছি, তুই-ই তো এই প্রথম দেখলি।

সে যাই হোক, জলাভূমির ধারে সূর্যাস্ত কিংবা দুর্লভরতনের পাশে দাঁড়িয়ে একটি দুর্লভ প্রাণী দেখা নয়, যে-দৃশ্যটি আমাকে এক রহস্যময় ধাঁধায় ফেলে দিল, সেটি একটি জানলার ফ্রেমের মধ্যে একটি রমণীর মুখ।

পরের দিন দুলু আর আমি সাইকেল নিয়ে আবার বেরিয়েছি বিকেলে। আজ আর শুধু প্রকৃতি দেখার জন্য নয়, পাশের গ্রামে হাট বসে শনিবার, সেখানে মাছ-টাছ তো পাওয়াই যায়, আগের দিন আমার প্রিয় আর একটা জিনিস পেয়ে গিয়েছিলাম। সবুজ বেগুন।

সাধারণত বেগুন হয় বেগুনি রঙের কিন্তু সাদা কিংবা সবুজ বেগুনও দেখা যায়। সব বেগুনের মধ্যে কাঁটাওয়ালা, গোল সবুজ বেগুনের স্বাদই শ্রেষ্ঠ। দুর্লভ প্রাণীর মতন এই বেগুনও দুর্লভ।

গল্প করতে করতে সাইকেল চালাচ্ছি দু'জনে। এই রাস্তায় কয়েকটা পাকা বাড়ি আছে, একতলা, দোতলা, তবে গায়ে গায়ে ঘেষাঘেঁষি নয়।

হঠাৎ আমার মনে একটা প্রশ্ন জাগল।

বাড়ি বানাতে গেলে ইট, সিমেন্ট, লোহালক্কড় আনতে হয় ট্রাকে করে। যে-সব গ্রামের মধ্যে ট্রাক চলার মতন রাস্তাই নেই, সেখানেও ওই সব সরঞ্জাম আনা হয় কী

www.amarboi.com

করে?

আমার প্রশ্ন শুনে দুলু বলল, তাজমহল বানানো হল কী করে? তখন কি ট্রাক ছিল? অত সব বড় বড় পাথর।

হাতির পিঠে চাপিয়ে এনেছে?

শুধু হাতি কেন, ঠেলাগাড়ি তো ছিলই। এখানেও ঠেলাগাড়িতে এনেছে।

অনেকবার আনতে হয়।

তা তো হবেই! অনেক পাহাড়ের ওপর একটা করে মন্দির থাকে। পায়ে চলা রাস্তা ছাড়া সেখানে ঠেলাগাড়িও উঠবে না। তবু সেই পাহাড়ের চুড়োয় মন্দিরের ইট-কাঠ পৌঁছয় কী করে?

পিঁপড়েরা নিয়ে যায়।

এটা ঠিক বলেছিস।

এই বাড়িটা কাদের রে?

এখানে গ্রাম প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। মাঠের মধ্যে একটা বাড়ি। ছোট গ্রামের পক্ষে বেশ বড় বাড়িই বলা যায়।

বেশ উঁচু পাঁচিল ঘেরা, তার ওপরে বোতল ভাঙা কাচ। দোতলা বাড়ি, তিনতলাতেও একটা ঘর আছে। সেই ঘরের রাস্তার দিকের একটা জানলা খোলা।

সেই জানলায় দাঁড়িয়ে আছেন এক মহিলা। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে মুখখানা।

সে দিকে চোখ পড়তেই বেশ অবাক হলুম। সাইকেলটা থেমে গেল।

রুমা বউদি? তিনি এখানে এলেন কী করে? পায়রাডাঙায় ওঁদের চেনাশুনো কেউ আছে, কখনও শুনিনি তো!

আমি সেদিকে হাতছানি দিতেই মহিলা সরে গেলেন জানলার কাছ থেকে। তারপরেই বন্ধ করে দিলেন জানলার দুটো পাল্লা!

দুলু খানিকটা এগিয়ে গিয়েছিল। পিছিয়ে এসে, আমাকে জানলাটার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করল, কী হল?

আমি বললুম, ওই জানলায় একজন মহিলাকে দেখলুম, আমার খুব চেনা!

মহিলা? এ বাড়িতে কোনও মহিলা তো থাকেন না।

থাকেন না, বেড়াতে আসতে পারেন তো। এ বাড়িটা কাদের?

বললুম তো, এটা আগে ছিল এক উকিলবাবুর বাগানবাড়ি। বছর খানেক আগে বিক্রি হয়ে গেছে শুনেছি। বাইরের একজন লোক কিনেছে। তবে, প্রায় কেউই থাকে না। আমি তো কখনও কারওকে দেখিনি। তুই একজন মহিলাকে দেখলি কী করে?

চোখে পড়ে গেল, তাই দেখলুম।

আমি আট মাস এই পোস্টাপিসে এসেছি। এ বাড়ির কারও নামে এর মধ্যে একটাও চিঠি আসেনি। তুই চোখে ভুল দেখিসনি তো?

খামোখা চোখে ভুল দেখতে যাব কেন? রুমা বউদি, আমাদের পাড়ার, দেবেনদার বউ। আমাকে ভালই চেনেন।

তোকেও উনি দেখেছেন?

www.amarboi.com

হ্যাঁ। আমি হাতছানি দিলুম।

জানলা তো বন্ধ। তোর চেনা, তোকে দেখেও জানলা বন্ধ করে দিলেন?

তাই তো দেখছি। একবার বাড়িটায় খোঁজ করলে হয় না?

দেখ নীলু, ভদ্রমহিলা তোকে দেখেও যদি জানলা বন্ধ করে দেয় তা হলে তোর চেনা হতে পারেন না। এর পরেও খোঁজ নিতে যাবার কোনও মানে হয়? গ্রামে এসব চলে না। ভাববে, তুই হিড়িক দেবার চেষ্টা করছিস!

আমার পিঠে চাপড় দিয়ে দুলু বলল, চল, চল!

প্যাডেলে পা দেবার পর দুলু আবার জিজ্ঞেস করল, সুন্দরী?

হ্যাঁ, মানে সুন্দরীই বলা যায়। সেরকম আহামরি কিছু নয়। বেশ ছিমছাম। খুব ভাল ব্যবহার করেন। আমি কতবার গেছি ওঁদের বাড়িতে, খাবারটাবার খেয়েছি।

তোর এত চেনা, খাবারটাবার খেতে দেন, আর এখানে তোকে দেখেই জানলা বন্ধ করে দিলেন, তার মানে কী হল ভাই?

সেটাই তো আমি বুঝতে পারছি না।

আমি বুঝিয়ে দেব? তোর দৃষ্টিবিভ্রম হয়েছে। মনে মনে কোনও মেয়ের কথা ভাবছিলি? খুব গভীরভাবে কারও কথা চিন্তা করলে বন্ধ জানলাতেও তাকে দেখা যায়!

মনে মনে আমি রুমা বউদির কথা ভাবতে যাব কেন? সেরকম সম্পর্কই নয়।

কার অবচেতনে কে আছে, তা কি বলা যায় রে ভাই?

ধ্যাত! তুই আবার সাইকোলজিস্ট হলি কবে থেকে?

রাস্তার মাঝখানে একটা খড় বোঝাই গোরুর গাড়ি, তার একটা চাকা ভেঙে কাত হয়ে আছে। আমাদের সাইকেল থেকে নামতেই হল।

যে-দিকের চাকা ভেঙেছে, সে-দিকের গোরুটাও ঘাড় কাত করে আছে দাঁড়িয়ে কোনওক্রমে। গোরুরা কাঁদে কি না জানি না। কিন্তু তাদের চোখ ছলছলে হয়ে থাকে অনেক সময়।

দুলু এগিয়ে দিয়ে গাড়োয়ানকে এক ধমক দিয়ে বলল, কী করছ, মিঞা! গোরুটাকে খুলে দিতে পারছ না!

লোকটি ধমকের কারণ বুঝতে না পেরে সরলভাবে বলল, চাকাটা সারাচ্ছি। একটু দাঁড়ান বাবু!

দুলু বলল, চাকা সারাচ্ছ বেশ করছ। ততক্ষণ এই গোরুটাকে খুলে দিলে কী হয়? ওর ঘাড়টা যে ভেঙে যেতে পারে।

দুলুর সঙ্গে আমার এই একটা তফাত।

ওর মতন আমারও মনে হয়েছে যে এই গোরুটা খুব কষ্ট পাচ্ছে। গাড়োয়ানটার বোকামি দেখলে রাগ হয়। কিন্তু গাড়োয়ানটাকে কিছু বলার জন্য আমি এগিয়ে যেতে ইতস্তত করি, সবই হয় আমার মনে মনে। দুলু ওর চিন্তাটাকে কাজে পরিণত করতে চায়।

এই জন্য আমার মতন মানুষদের দিয়ে পৃথিবীর কোনও উপকার হয় না।

www.amarboi.com

আমি গোরুটার দিকে তাকিয়েছিলাম বটে, কিন্তু আমার মনটা তখন দ্বিধাবিভক্ত। মনের একটা অংশ একটা জানলা ও এক রমণীর মুখের চিন্তায় ব্যাপৃত ছিল। জানলাটা বন্ধ হয়ে গেল কেন?

হাটে আজ আর কাঁটাওয়ালা সবুজ গোল বেগুন পাওয়া গেল না। এইসব গ্রাম্য হাটবাজারে ভাল মাছ পাওয়া খুবই ভাগ্যের ব্যাপার। বড় বড় সব মাছই তো চালান হয়ে যায় শহরে। তেলাপিয়া আর চারা পোনা, কিছু ছোট মাগুর আর কাতলা।

দুলু মাছ চেনে না। এক জায়গায় জিজ্ঞেস করল, শিক্‌নির মতন দেখতে ওগুলো কী রে?

আমি বললুম, লটকা মাছ, কেন, কেন, ওগুলো খুব ভাল।

দুলু বলল, দেখেই তো ঘেন্না করছে।

আমি বললুম, স্বাদ খুব ভাল। আমি রান্না শিখিয়ে দেব।

তার পাশেই চিত হয়ে পড়ে আছে একটা কচ্ছপ। খুবই ছোট্ট, হাতের তালুতে এঁটে যায়। সোনালি রঙের।

কচ্ছপ মারা বা বিক্রি করা নিষিদ্ধ। এরাও প্রায় বিলুপ্ত হবার মুখে। গ্রামের দিকে ওসব আইন-কানুন কে আর জারি করতে যাচ্ছে। হাটে বিক্রি করতে এনেছে, কেউ ওটাকে খেয়ে ফেলবে।

দুলু লোকটাকে জিজ্ঞেস করল, ওটার দাম কত?

আমি বললুম, কিনিস না। কচ্ছপ কেনা বে-আইনি।

দুলু বলল, সেইজন্যই তো কিনব। যাতে অন্য কেউ কিনতে না পারে। আমাদের কোয়ার্টারের পিছন দিকে একটা ছোট পুকুর আছে। সেখানে ছেড়ে দেব। ও বেঁচে যাবে।

কচ্ছপটা মাথা ঢুকিয়ে আছে ভেতরে। একটা প্লাস্টিকের ব্যাগে সেটা ভরে নেওয়া হল। এখন ঠিক যেন একখণ্ড পালিস করা পাথর। কচ্ছপ সহজে মরে না। কথায় বলে কচ্ছপের প্রাণ।

প্লাস্টিকের ব্যাগটা দুলু ঝুলিয়ে নিল ওর সাইকেলের হ্যান্ডেলে।

ফেরার পথে সাইকেলের গতি কমিয়ে সেই বাড়িটার দিকে আমি ভাল করে তাকালুম।

তিনতলায় জানলাটা এখন বন্ধ। বেশ সন্ধে হয়ে গেছে, তবু সে-বাড়ির কোথাও আলো জ্বলছে না। সম্পূর্ণ অন্ধকারের মধ্যে নিঃশব্দ বাড়ি।

যে-বাড়িতে সন্ধের পর বাতি জ্বলে না, যেখানে আট মাসের মধ্যে একটাও চিঠি আসে না, সেখানে রুমা বউদি কী করছেন?

অথবা রুমা বউদি নয়, অন্য কেউ?

আমাদের পাড়ার মল্লিকবাড়িটা দেখলে একটা অতিকায় পৌরাণিক জন্তুর কঙ্কাল বলে মনে হয়।

বাড়িটার বয়স নাকি একশো বছরের বেশি।

সেকালের কর্তারা অনেকখানি ছড়িয়েছিটিয়ে আর মজবুত করে বাড়িটি বানিয়েছিলেন এই আশা করে যে, এখানে তাঁদের বংশধররা সাতপুরুষ ধরে ভোগ করবে।

তখন এই মল্লিকদের জমিদারি ছিল, চা-বাগানের মালিকানা ছিল। সেসব হাতছাড়া হয়ে গেছে কবে! মোটা অঙ্কের আয় না থাকলে এরকম বাড়ি ঘাড়ের ওপর বোঝা হয়ে থাকে। এখনকার মালিকদের মেরামত করারও মুরোদ নেই। তাই ভেঙে পড়ছে এখানে সেখানে। বাইরের দেওয়াল প্লাস্টার করা বা রং করা হয়নি বহুদিন। ইঁট বেরিয়ে পড়েছে, ঠিক হাড়গোড়ের মতন দেখায়।

একটা ঝুলবারান্দা ভেঙে পড়ল গত বছর শীতকালে। দেবেনদার জ্যাঠামশাই রোজ সকালে ওখানে বসে রোদ পোহাতেন আর কাগজ পড়তেন। গুজরাতের ভয়ংকর ভূমিকম্প হয়ে গেছে কয়েকদিন আগে। এক সকালে তিনিও নিশ্চয়ই ভেবেছিলেন, কলকাতাতেও ভূমিকম্প শুরু হল বুঝি। ভাবতে ভাবতেই হুড়মুড়িয়ে পড়ে গেলেন রাস্তায়।

তিনি নিজে তো ভবলীলা সাঙ্গ করলেন বটেই, বারান্দার চাঙড় চাপা পড়ে মরে গেল বাবুলাল মুচি। সে ওই বারান্দাটার তলাতেই বসত রোজ।

মিনিট পনেরো আগে আমি যে ওখানে বাবুলালকে দিয়ে আমার চটিটার কয়েকটা পেরেক ঠুকিয়েছি, আর একটু সময়ের এদিক-ওদিক হলে যে আমিও অক্কা পেতুম, তা কেউ বিশ্বাস করে না। বন্ধুদের কাছে বলতে গেলেই তারা থামিয়ে দিয়ে বল, যা, যা, গুল মারিস না! এরকম কিছু হলেই অনেকে বলে, পাঁচ মিনিট আগে আমি ওখানে ছিলুম!

আমার কথার সত্যতার সাক্ষী দিতে পারত একমাত্র বাবুলাল! তাকে আর কোথায় পাব। বাবুলালের মৃত্যুতে আমাদের খুব ক্ষতি হয়ে গেল। এখন আর দরকারের সময় কিছুতেই মুচি খুঁজে পাওয়া যায় না।

যাই হোক, একটা ব্যাপারে আমি নিশ্চিত হয়েছি। আমার মাথায় আর কোনওদিন আকাশও ভেঙে পড়বে না। এই যে একবার ফাঁড়া কেটে গেল! এক জিনিস দু'বার ঘটে না।

একটু তেজি ধরনের বৃষ্টি হলেই আমাদের পাড়ার রাস্তায় খুব জল জমে। বছরে অন্তত দু-তিনবার হাঁটু পর্যন্ত ডোবা। রাস্তায় জল জমা দেখতে আমার বেশ ভালই লাগে। রোজ রোজ একঘেয়ে দৃশ্যের বদলে রাস্তার চেহারা সেই সময় বদলে যায়। শুধু দৃশ্য নয়, শব্দও অন্য রকম। গাড়িগুলো যখন দু'পাশে জল ছেটাতে ছেটাতে চলে, তখন মনে হয় যেন ময়ূরপঙ্খী নৌকো।

www.amarboi.com

কাজ না থাকলেও আমি সেই সময় উরু পর্যন্ত পাজামা গুটিয়ে সেই জলের মধ্য দিয়ে হাঁটি।

এই সময় কোথা থেকে যেন অনেক নেংটি পরা বাচ্চা ছেলে জুটে যায়, তারা জলের মধ্যে দাপাদাপি করে। যে-সব গাড়ি অচল হয়ে পড়ে, সেগুলো ঠেলে দেয়। বয়স্ক লোকরা এই জলে সহজে নামতে চায় না। সেরকম বয়স্ক হওয়া বোধহয় আমার ভাগ্যে নেই। আমি ওই নেংটি পরা বাচ্চাদের সঙ্গেই নিজের মিল খুঁজে পাই। আমার বাল্যকালটা হারাতে চাই না।

এবারের বর্ষায় গুরুপদবাবু সেই জলের মধ্যে হাঁটতে গিয়ে পড়ে গেলেন খোলা ম্যানহোলের মধ্যে। আমি ছিলাম খানিকটা পিছনে, ছুটে গিয়ে তাঁকে ধরলুম, বাচ্চা ছেলেরাও এসে পড়ল, তাঁকে টেনে তোলা হল। গুরুপদবাবু প্রাণে বেঁচে গেলেও উরুর হাড় এমন ফ্র্যাকচার হল যে বিছানায় শুয়ে রইলেন চার মাস, আর লোহা গুঁজে জুড়তে হল সেই ভাঙা হাড়।

এই ঘটনাটা স্বচক্ষে দেখেও আমার উপলব্ধি হয়েছিল যে, আমার কোনওদিন ম্যানহোলে পড়ে পা ভাঙবে না। কারণ, এক রকম ঘটনা দু'বার ঘটে না। এইরকম ভাবে আমি একটার পর একটা বিপদ থেকে মুক্ত হচ্ছি!

গুরুপদবাবুর ওই দুর্ঘটনায় সহানুভূতি জাগার বদলে আমি নিজের বেঁচে যাওয়ার কথা ভেবেছি, এটা স্বার্থপরতা? গুরুপদবাবু বয়স্ক লোক হয়েও কেন রাস্তার জলে নামতে গিয়েছিলেন, কী এমন রাজকার্য ছিল? তা ছাড়া তিনি নিশ্চয়ই তাঁর বাল্যকালটা একেবারেই হারিয়ে বসে আছেন!

আমি এরকম অনেক ব্যাপারে বেঁচে যাই বটে, তবু সাধ করেও কেন যে এক একটা বিপদের মধ্যে মাথা গলাতে যাই!

যেমন রুমা বউদি ও বন্ধ জানলা নিয়ে আমার আর মাথা ঘামাবার কী দরকার?

মল্লিকবাড়িতে এখন অনেক শরিক, তাদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি লেগেই আছে।

এক একজনের ভাগে পড়েছে একখানা-দেড়খানা ঘর। বাথরুম নিয়ে খুবই টানাটানি। একতলার একটা উঠোন ও ঠাকুরদালান বারোয়ারি। সেই উঠোনটাই শরিকি বিবাদের কুরুক্ষেত্র।

এইসব বাড়ি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে অনবরত প্রমোটারদের খপ্পরে পড়ে। তারপর উঠছে বহুতল ফ্ল্যাটবাড়ি। মল্লিকবাড়িটা এখনও তা হতে পারছে না, কারণ শরিকদের মধ্যে মামলা ঝুলে আছে পাঁচখানা।

এই বাড়ির অনেক লোকের মধ্যে দু'জনকে পাড়ার লোক বিশেষভাবে চেনে। সম্পূর্ণ বিপরীত কারণে।

বিজয় মল্লিকের ষণ্ডামার্কা চেহারা, পারিবারিক ধারা অনুয়াযী গায়ের রং ফর্সা অবশ্য। পাড়ার অনেক গণ্ডগোলের মূলে তিনিই। মাঝরাতে দু-তিন গাড়ি লোক এসে হইহল্লা করে তার নাম ধরে ডাকে। আবার তার খোঁজে পুলিশও আসে। একবার পাড়ার একটা ছেলেকে তিনি কানে একটা থাবড়া মেরেছিলেন এত জোরে যে ছেলেটা তারপর থেকে এক কানে শুনতেই পায় না।

www.amarboi.com

এই বিজয় মল্লিকের খুড়তুতো ভাই দেবেনদা। সবাই তাঁকে ভালবাসে। তিনি চাকরি করেন একটা নামকরা প্রচার প্রতিষ্ঠানে। লিট্‌ল ম্যাগাজিনের সম্পাদকদের উদারভাবে বিজ্ঞাপন পাইয়ে দেন। পাড়ার ছেলেমেয়েদের নিয়ে তিনি 'ছোট পৃথিবী' নামে ক্লাব করেছেন, প্রতি শনিবার সেই ক্লাবের অধিবেশন হয় তাঁদের বাড়ির ঠাকুরদালানে। গান-বাজনা, কবিতা পাঠ হয়। সেই সূত্রেই আমি মল্লিকবাড়ির অভ্যন্তরে প্রবেশের সুযোগ পেয়েছি।

পায়রাডাঙার সেই নির্জন বাড়িটায় আমি রুমা বউদিকেই দেখেছিলাম কি না, এটা জানার জন্য অদম্য কৌতূহল একটা খাঁচায় বন্দি বাজপাখির মতন আমার বুকের মধ্যে ছটফট করছে।

সেই মহিলা যদি রুমা বউদি না হন, তা হলে আর কোনও সমস্যাই থাকে না। গ্রামের কোনও মহিলার দিকে যদি একজন অচেনা যুবক প্যাট প্যাট করে তাকিয়ে থাকে, তা হলে তো তিনি জানলা বন্ধ করে দেবেনই। ব্যস, চুকে গেল!

কিন্তু আমি কি চোখে ভুল দেখেছি? সবাই যে বলে নীললোহিতের আর কিছু গুণ থাক বা না থাক, দূরদৃষ্টি আছে!

এরকম ভুল হলে তো ধরে নিতেই হবে আমার চোখ খারাপ হয়েছে! চোখ খারাপ হলে আমার ভালই হয়, অনেকদিন ধরেই আমার চশমা পরার শখ। আমার বন্ধু নিখিলেশ অল্প বয়েস থেকেই চশমা পরে, তাই তাকে বেশ ইন্টেলেকচুয়াল-ইন্টেলেকচুয়াল দেখায়!

কিন্তু চোখের ডাক্তার দেখানোর আগে আমার রুমা বউদিকে একবার দেখা দরকার।

পায়রাডাঙা থেকে ফিরেছি সোমবার, এরপর শনিবার পর্যন্ত ধৈর্য ধরে থাকা যায় না।

মঙ্গলবার সন্ধেবেলা ঢুকে পড়লাম মল্লিকবাড়ির ভেতরে।

দেবেনদারা থাকেন দোতলায়। সরাসরি উঠে যাওয়া যায়, কেউ কিছু বলে না।

দরজা খুলে দিলেন দেবেনদা নিজে।

সাধারণত সন্ধের সময় দেবেনদা অফিসের পোশাক ছেড়ে সিল্কের লুঙ্গি আর স্যান্ডো গেঞ্জি পরে থাকেন। এটাই মল্লিকবাড়ির পুরুষদের বাড়ির পোশাক। দেবেনদার চেহারায় বনেদি পরিবারের ছাপ আছে। রোমশ বুক, চওড়া কাঁধ, দাড়ি কামাবার পর মুখে একটা নীল আভা লেগে থাকে।

আজ দেবেনদা পুরোদস্তুর স্যুট পরা, গলায় টাইটা ঝুলছে, এখনও বাঁধা হয়নি। আমাকে দেখে খানিকটা অবাক হলেও হাসিমুখে বললেন, কী ব্যাপার, নীলু?

কোনও একটা প্রয়োজন না থাকলে কেউ কারও বাড়িতে হুট করে দেখা করতে আসে না। আমি দেবেনদার সমবয়েসি বন্ধুও নই যে বলব, এ রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলুম, ভাবলুম একবার তোর সঙ্গে দেখা করে যাই—

সেরকম কোনও প্রয়োজন বা ছুতো আগে থেকে ভেবেও আসিনি। খুব ভুল হয়ে গেছে। প্রায় কয়েকটি মুহূর্তের মধ্যে সেটি বানিয়ে ফেলতে হল। জিজ্ঞেস

www.amarboi.com

করলুম, দেবেনদা, আপনি কখনও লটারির টিকিট কেটেছেন?

না তো!

লটারির টিকিটের নম্বর মিলে গেলে কী করতে হয় আপনি জানেন?

তুমি পেয়েছ নাকি?

হ্যাঁ। ভুটান লটারির একখানা টিকিট আমাকে একজন গছিয়ে দিয়েছিল পাঁচ টাকায়। আজই কাগজে রেজাল্ট বেরিয়েছে। আমার টিকিটের নম্বরটা।

অ্যাঁ, বলো কী, লটারি পেয়েছ। দারুণ ব্যাপার! কত টাকায় ফার্স্ট প্রাইজ?

ফার্স্ট প্রাইজ পঞ্চাশ লাখ।

প-ঞ্চা-শ লা-খ! এ যে দারুণ খবর নীলু! আমি পেলে হার্ট ফেল হয়ে যেত বোধহয়। তুমি এমন শান্তভাবে... এখন দেখবে কত লোক তোমাকে খাতির করবে। আবার চাঁদা চেয়ে চেয়ে জ্বালাতনও করবে অনেকে। যাক, এতদিনে তোমার বেকার জীবন সার্থক হল।

দেবেনদা, আমি ফার্স্ট প্রাইজ পাইনি।

তবে কি সেকেন্ড প্রাইজ? সেটা কত লাখ?

সেকেন্ড প্রাইজ তিরিশ লাখ।

ও রে বাবা, তাও কি কম হল? ইনকাম ট্যাক্স কিছুটা কেটে নেবে, তাতেও লাখ পঁচিশেক। তুমি যে কখনও চাকরি করবে না বলেছিলে, এই টাকাটা ব্যাঙ্কে রাখলে তোমার দিব্যি চলে যাবে সারাজীবন! পুরোটা ব্যাঙ্কে না রেখে কী করে ইনভেস্ট করবে, আমি তার একটা প্ল্যান করে দেব!

আমি সেকেন্ড প্রাইজও পাইনি। আমি...

পাওনি? তবে যে বললে নম্বর মিলে গেছে?

ফার্স্ট-সেকেন্ড প্রাইজ পাইনি। তলার দিকে যে অনেকগুলো নম্বর থাকে, তার একটার সঙ্গে মিলেছে। সাড়ে বারো শো টাকা!

দেবেনদা একেবারে চুপসে গিয়ে বললেন, সাড়ে বারো শো? নীলু, সাড়ে বারো শো। ঠিক দেখেছ?

হ্যাঁ, দেখেছি। শেষের চারটে সংখ্যা।

যেন দেবেনদা নিজেই এই মাত্র পঞ্চাশ লাখ কিংবা তিরিশ লাখ টাকা জুয়ায় হেরে গেলেন, এরকম ফ্যাকাসে হয়ে গেল তাঁর মুখ।

তবু শান্তভাবে বললেন, সাড়ে বারো শো, মাত্র পাঁচ টাকার টিকিটে, তাও খারাপ নয়। একদিন ক্লাবের সবাইকে খাইয়ে দাও! টিকিটটা জমা দিয়ে দাও ব্যাঙ্কে।

দেবেনদা, আপনার কাছ থেকে একটা পরামর্শ নিতে এসেছি। এই সাড়ে বারোশো টাকা কি আমার নেওয়া উচিত? বোধহয় না নেওয়াই ভাল।

কেন, নেবে না কেন?

এই সাড়ে বারো শো টাকা নিয়ে নিলে আমি জীবনেও কখনও ফার্স্ট প্রাইজ পাব না। কেউ কি দু'বার লটারি পায়? আমার লাকটা কেটে যাবে।

www.amarboi.com

একটু চিন্তা করে দেবেনদা বললেন, তা অবশ্য ঠিক। দু'বার কেউ লটারি পেয়েছে, এমন শোনা যায় না। তুমি ও টাকাটা না নিয়ে আরও টিকিট কেটে যাও!

আমার যুক্তি অবশ্য অন্য। একবার কিছু নম্বর মিললে তো লটারি পাওয়া হয়েই গেল, টাকাটা আমি নিই বা না নিই! দ্বিতীয়বার আর ভাগ্যলক্ষ্মী এ মুখো হবে না।

সুতরাং যা পাওয়া যায়, তা নিয়ে নেওয়াই উচিত।

অবশ্য আমি টিকিটই কাটিনি, আমার পক্ষে পঞ্চাশ লাখ কিংবা সাড়ে বারো শো সবই সমান। হাতে পাখি নেই, সবই ঝোপের পাখি।

কথা হচ্ছে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে।

কিন্তু এক্ষুনি ফিরে গেলে তো আমার চলবে না।

দেবেনদা, আপনি কি কোথাও যাচ্ছেন?

হ্যাঁ। একটু বেরুতে হবে।

সিনেমায় যাচ্ছেন বুঝি?

না, না। এক জায়গায় নেমন্তন্ন আছে।

ও।

এমনভাবে ও উচ্চারণ করলুম, যার মানে হয়, সিনেমা-থিয়েটারে যেতে হলে ঠিক সময় রাখার ব্যাপার থাকে, নেমন্তন্ন বাড়িতে তো খানিকটা দেরি করেও যাওয়া যায়।

আমার গলার সুরটা যেন বুঝতে পেরেই দেবেনদা বললেন, আরে বাইরে দাঁড়িয়ে কেন, ভেতরে এসে বসো!

প্রথম বড় ঘরটা দেবেনদার মায়ের ভাগে ছিল। মা গত হবার পর দেবেনদা এটার দখল নিয়েছেন, কিন্তু তাঁর এক জামাইবাবু নাকি এই ঘরের ভাগ পাবার জন্য মামলা করে বসেছেন। এ-বাড়ির সব শরিকদেরই শ্রাদ্ধ, অন্নপ্রাশন, বিয়ের মতন আছে বাৎসরিক মামলা খরচ।

ঘরটার দুটি ভাগ, সামনের দিকে কয়েকটা সোফা-চেয়ার পাতা। পিছন দিকে একটা পুরনো আমলের মস্ত পালঙ্ক। অর্থাৎ দিনের বেলা বসবার ঘর, রাত্তিরে কেউ ওখানে শোয়।

সোফাগুলো মান্ধাতার আমলের না হলেও ব্রিটিশ আমলের। এখন ঐতিহ্য আছে, আরাম নেই। বসলেই গদির স্প্রিং খড়খড় করে ওঠে।

টাইটা বাঁধতে বাঁধতে দেবেনদা বললেন, তুমি লটারির কথাটা বলে আমায় দারুণ চমকে দিয়েছিলে। অন্য কেউ হলে, প্রথমেই সাড়ে বারোশো টাকার কথাটা বলে দিত।

একগাল হেসে বললুম, আমি তো কেউ কেউ না! আপনাকে আমি বলিনি কিন্তু আমি ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছি।

তা ঠিক। তবে লটারির কথা শুনলেই কেন যেন আমাদের ফার্স্ট প্রাইজের কথাই মনে হয়। আমি অবশ্য কখনও লটারির টিকিট কাটি না। আমি আন আর্নড্ মানি, বিনা উপার্জনের টাকায় বিশ্বাস করি না। এইসব লটারিতে হঠাৎ কিছু

www.amarboi.com

উট্‌কো বড়লোক তৈরি হয়, সেটা কিন্তু সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর।

এখন আর দেবেনদাকে বলার উপায় নেই যে আমিও কস্মিনকালে লটারির টিকিট কাটিনি।

উল্টো চাপ দেবার জন্য বললুম, আগেকার দিনে যে জমিদারির ইনকাম ছিল, সেটাও কি আন আর্নড্ ইনকাম নয়?

দেবেনদা বললেন, উঁ, প্রথম জেনারেশানে সেটা ছিল ইনভেস্টমেন্ট, জমিদারি তো এমনি এমনি হত না, নিজের টাকা দিয়ে কিনতে হত, পরের জেনারেশানগুলোয়—

জমিদারি প্রথার কুফল ও সুফল বিষয়ে দেবেনদা অনেক কিছু বলে যেতে লাগলেন।

আমি উশখুশ করছি। নতুন প্রেমিক যেমন প্রেমিকার বাড়িতে গিয়ে প্রেমিকার দাদার সঙ্গে গল্প করতে বাধ্য হয়ে বারবার দরজার দিকে কিংবা সিঁড়ির দিকে তাকায়, আমারও সেই অবস্থা।

যদিও আমি নতুন প্রেমিকও নই, এ বাড়িতে আমার কোনও প্রেমিকাও নেই।

দেবেনদা বললেন, আমাদের আর কিছু পাবার আশা নেই, শুধু হারাতে হবে। আমার বাপ-ঠাকুরদারা খেটেখাওয়া মানুষের রক্ত জল করা টাকা নিয়ে বিলাসিতা করে গেছেন। আমাদের এখন তার খেসারত দিতে হচ্ছে। এত বড় বাড়িতে থাকি, তবু এবাড়ির অনেকেরই এখন সংসার চলে না। খালি পেটে থাকে, তবু পান খেয়ে ঠোঁট লাল করে রাস্তায় বেরোয়।

এই সময় পাশের দরজা খুলে ঢুকলেন রুমা বউদি। এই শোনো, চাবিটা— বলতে বলতে আমাকে দেখে থেমে গিয়ে বললেন, ওমা, নীলু, কখন এসেছ?

রুমা বউদি পরে আছেন চকলেট রঙের জর্জেটের শাড়ি।

এই, দাঁড়াও, দাঁড়াও নীললোহিত, তুমি কী করে জানলে ওটা জর্জেটের শাড়ি? তুমি শাড়ি চেনো? জর্জেট কাকে বলে জানো? লেখার ঝোঁকে লিখে গেলেই হল? ওটা যে কট্‌কি কিংবা কাঞ্জিভরম নয়, তা তুমি কী করে জানলে?

মোটকথা, রুমা বউদির গায়ের শাড়িটা বেশ জমকালো আর চকলেট রঙের। দারুণ দেখাচ্ছে। ঠোঁটের লিপস্টিকও ওই রঙের।

রুমা বউদি আমাকে দেখে তেমন কিছু চমকে ওঠেননি, মুখে কোনও অপরাধ বোধ নেই। সরল, কৌতূহলী মুখ।

আমি বললুম, অসময়ে এসে আপনাদের বিরক্ত করছি। আপনারা বেরুবেন।

রুমা বউদি বললেন, না, না, আমাদের তেমন কিছু তাড়া নেই, এখনও তো সাতটাও বাজেনি।

দেবেনদা বললেন, নীললোহিত চন্দর লটারিতে সাড়ে বারোশো টাকা পেয়েছে, বুঝলে।

রুমা বউদি বললেন, বাঃ, আমাদের সবাইকে একদিন খাইয়ে দাও। লটারির টাকা জমিয়ে রাখতে নেই।

www.amarboi.com

দেবেনদা বললেন, আমাদের ক্লাবের সবাইকেই খাইয়ে দেবে বলেছিল। কিন্তু টাকাটা যদি ও না নেয়, তা হলে ভবিষ্যতে ফার্স্ট প্রাইজ পাবার সম্ভাবনা থাকবে। একবার যখন লাক খুলে গেছে।

ফার্স্ট প্রাইজ পেলে আবার খাওয়াবে। কিংবা আমাদের সবাইকে কোথাও স্টিমার করে নিয়ে যাবে।

এই সামান্য টাকাটা অ্যাকসেপ্ট করলে যদি পরের চান্সটা মিস হয়ে যায়!

পরে কী হবে না হবে, তা ভেবে... নিয়ে নাও, নিয়ে নাও এই টাকাটা— আমি খাওয়াবার মেনু করে দিচ্ছি।

হাসন রাজার একটা গান আছে, কী ঘর বানাইনু আমি শূন্যের মাঝার...। এখানেও তাই চলছে।

কোথায় লটারির টিকিট? খাওয়ার মেনু তৈরি হবে।

বাজারে আমার এমনই সুনাম, লটারির টাকা না পেলে কারওকে খাওয়াবার ক্ষমতা আমার নেই। শুধু অন্যদের বাড়িতে খেয়ে যাই।

রুমা বউদি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি চা খাবে নীলু?

আমি ঘাড় নাড়লুম, দেবেনদাও বললেন, আমাকেও এক কাপ।

যাক, চা বানাতে ও খেতে আরও দশ মিনিট সময় পাওয়া যাবে অন্তত।

ভেতরে চায়ের কথা বলে এসে রুমা বউদি বসলেন আমার সামনের সোফায়।

দেবেনদা জিজ্ঞেস করলেন, নীলু, তুমি এই শনিবার আমাদের ক্লাবের আড্ডায় আসোনি কেন? ছোটগল্প ভার্সাস কবিতা নিয়ে দারুণ একখানা তর্ক জমে উঠেছিল।

এই তো সুযোগ পাওয়া গেছে।

বললুম, হ্যাঁ, দেবেনদা, এই শনিবারটা আসা হল না। আমি পায়রাডাঙা গিয়েছিলাম।

বলেই সোজাসুজি তাকালুম রুমা বউদির চোখের দিকে।

সেখানে কোনও চমক নেই। পায়রাডাঙা নামটা তার মনে কোনও দাগ কাটল না?

দেবেনদা বললেন, পায়রাডাঙাটা আবার কোথায়?

ডায়মন্ডহারবার আর কাকদ্বীপের মাঝামাঝি একটা জায়গায়। এখন যদিও নতুন নাম হয়েছে রামকৃষ্ণপুর, তবু লোকে পায়রাডাঙাই বলে। বেশ সুন্দর গ্রাম। নাম শোনেননি?

না শুনিনি। পায়রাডাঙা। দমদমের কাছে আছে ঘুঘুডাঙা। পাখির নামে নাম। ভালই তো। টিয়াডাঙা, বুলবুলিডাঙা কোথাও নেই? এগুলো তো বাংলার কমন্ বার্ড।

নর্থ বেঙ্গলে আছে বাজপুর। সেটা বজ্র থেকে বাজ বা বাজপাখি, তা অবশ্য বলা যায় না।

রুমা বউদি জিজ্ঞেস করলেন, বাজপাখি কী রকম হয়? কখনও দেখিনি।

দেবেনদা বললেন, এক ধরনের ঈগল বোধহয়। আচ্ছা, কাকদ্বীপের নাম কাকের নামে কেন?

কাকও তো খুব কমন বার্ড।

www.amarboi.com

তা হোক। শতকরা নিরানব্বই ভাগ পাখিই দেখতে সুন্দর, গলার আওয়াজও ভাল। সবচেয়ে কুৎসিত হল কাক, আর তেমনই বিচ্ছিরি ওদের ডাক। ঠিক যমদূতের মতন। কাক কেউ ভালবাসে, এমন শুনিনি। তবু আহ্লাদ করে কেন একটা জায়গার নাম হয়েছে কাকদ্বীপ?

আলোচনা অন্য দিকে গড়িয়ে যাচ্ছে। এখন নাম তত্ত্ব নিয়ে দামি সময় নষ্ট করা চলে না।

আমি বললুম, পায়রাডাঙাটা বেশ সুন্দর জায়গা। আমার এক বন্ধু থাকে ওখানে। দেবেনদা রুমা বউদি, একবার বেড়াতে যাবেন ওখানে?

দেবেনদা বললেন, হ্যাঁ, একবার যাওয়া যেতে পারে। সেখানকার বিশেষত্ব কী?

একরকম সবুজ রঙের কাঁটাওয়ালা বেগুন পাওয়া যায়। দুর্দান্ত স্বাদ।

দেবেনদা মাথাটা ঝুঁকিয়ে এনে বললেন, বেগুন? বেগুন?

চারবার হেসে উঠলেন হা-হা শব্দে প্রাণ খুলে।

দেবেনদা পায়রাডাঙার নাম শোনেননি বোঝাই গেল। রুমা বউদি সরাসরি কিছু বলেননি। কিন্তু তার মুখ সরল, স্বাভাবিক। যেন, তিনিও পায়রাডাঙা সম্পর্কে কিছুই জানেন না।

যদিও কথায় বলে, মেয়েরা সবাই স্বভাব অভিনেত্রী। মুখ দেখে মনের কথা টের পাওয়া শিবেরও অসাধ্য।

রুমা বউদিকে স্ট্রেট জিজ্ঞেস করব, আপনি কি এর মধ্যে পায়রাডাঙা গিয়েছিলেন?

যদি তিনি না বলেন, তা হলে ধরে নিতে হবে, আমার দেখারই ভুল হয়েছে। চোখের দোষ।

আর আমি যদি জেদ ধরে বসে থাকি যে, না আমি ভুল দেখিনি, তা হলে বুঝতে হবে রুমা বউদি মিথ্যে কথা বলছেন। কেন শুধু শুধু মিথ্যে বলবেন? নিশ্চয়ই এর মধ্যে কিছু রহস্য আছে। সেই রহস্যের মধ্যে আমার মাথা গলানোর কী দরকার?

জীবনে অনেক সময়ই আমরা এরকম সোজাসুজি প্রশ্ন করতে পারি না।

কিংবা জীবনে কিছুই সোজাসুজি নয়, সবই আঁকাবাঁকা।

চা শেষ হয়ে এসেছে, এবার উঠতেই হবে।

দেবেনদা এর মধ্যে অন্য সাবজেক্টে চলে গেছেন।

এই শনিবার, বুঝলে, কবির দল আর গদ্য লেখকদের দল এমন তর্কাতর্কি শুরু করে দিল, শেষ পর্যন্ত প্রায় হাতাহাতি লেগে যাবার উপক্রম। আমাদের ছোটগল্প লেখক শুভ্র ফস করে বলে ফেলেছিল, কবিতা লেখা তো খুব সহজ। দশ-বারো লাইন কে না লিখতে পারে। কিন্তু একটা ছোটগল্প লিখতে এলেম লাগে, দশ-বারো পাতার মধ্যে তুলে ধরতে হয় চলমান জীবন। অমনই হইহই করে উঠল কবির দল। অরুণাংশু বলল, ছোটগল্প বাঁ হাতে লেখা যায়, চেষ্টা করলে সবাই পারে। কিন্তু কবিতা লিখতে অলৌকিক ক্ষমতা লাগে। অনেক এম এ-তে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট পাওয়া ছেলেমেয়ে মাথা খুঁড়েও দু' লাইন কবিতা লিখতে পারে না।

www.amarboi.com

রুমা বউদি জিজ্ঞেস করলেন, নীলু, তুমি কোন দলে?

আমি মিনমিন করে বললুম, আমি হচ্ছি বাদুড়। পাখিও না, জন্তুও না। কোনও দলেই নেই।

দেবেনদা বললেন, তুমিও খুব মিস করেছ রুমা। নীলু, এই শনিবার রুমাও ছিল না এখানে। কয়েকদিনের জন্য ও গিয়েছিল শ্রীরামপুরে ওর দিদির কাছে।

এবার আমার চমকে ওঠার পালা।

রুমা বউদি এখানে ছিলেন না? তা হলে তো উনি পায়রাডাঙায় যেতেই পারেন। শ্রীরামপুর সম্পূর্ণ উল্টোদিকে। একদিনের জন্য শ্রীরামপুর ছুঁয়ে এসে তারপর পায়রাডাঙায় যাওয়া অসম্ভব কিছু নয়।

কিন্তু তিনি পায়রাডাঙায় সেরকম একটা বাড়িতে যাবেন কেন, যেখানে সন্ধের সময় কোনও আলো থাকে না, যে-বাড়িতে আট মাসের মধ্যে একটাও চিঠি আসে না। এবং যে-পায়রাডাঙা তাঁর স্বামী চেনেন না!

আমি রুমা বউদির মুখের দিকে তাকালুম।

তিনিও পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। গল্প-উপন্যাসে একেই বলে বোধহয় আয়ত নেত্র। যদিও আমি আয়ত কথাটার সঠিক মানে জানি না।

সেই দৃষ্টি কি সামান্য একটু কেঁপে উঠল? তার মধ্যে আছে কি একটু মিনতি? তিনি কি আমাকে কিছু গোপন করতে বলছেন?

আমার সারা শরীরে একবার শিহরনের অনুভব হল।

॥ ৩ ॥

দেখো নীললোহিত, মাঝে মাঝে আত্মদর্শন করা খুবই দরকার।

কেন তুমি অন্যের জীবনের গোপনীয়তার মধ্যে ঢুকতে চাইছ?

রুমা বউদি যদি তাঁর স্বামীকে না জানিয়ে পায়রাডাঙায় ঘুরে আসতে চান, সেটা তাঁর ব্যক্তিস্বাধীনতা। তাঁর স্বামীকে জানাবেন কি জানাবেন না, সেটাও তিনি ঠিক করবেন। তোমার কী আসে যায়?

বিয়ে হয়ে গেছে বলেই যে একজন মহিলা তাঁর সব গতিবিধি স্বামীদের জানাতে বাধ্য থাকবেন, এর কোনও মানে আছে? স্বামীদের কিছু না জানিয়ে দোকান-পাটে যেতেই তো বিবাহিত মহিলাদের বেশি আনন্দ!

আরে, দাঁড়াও, দাঁড়াও, বিবাহিত নারী-পুরুষের সম্পর্ক নিয়ে তোমার কিছু মন্তব্য করার কী অধিকার আছে হে? তুমি তো আজ অবধি একটি প্রেমিকাই সংগ্রহ করতে পারলে না! তোমার চকচকে কথা শুনলেও মেয়েরা হাসে।

আসল কথা হচ্ছে গোপনীয়তা।

মানুষের সব সময় ঝোঁক থাকে গোপনীয়তার দিকে। নিজের না, অন্যের। যেন অন্যের গোপন কথা না জানলে তার ভাত হজম হবে না।

রুমা বউদি যদি তিনতলার জানলা থেকে আমার হাতছানি দেখে নিজেও হাতছানি

www.amarboi.com

দিতেন, তারপর ওই বাড়ির ভেতর ডেকে এক কাপ চা খেতে বলতেন, তা হলেই চুকে যেত সব ব্যাপারটা। তিনি যদি বলতেন, এটা তার দিদি-জামাইবাবুর বাগানবাড়ি, তা হলে সন্দেহের কিছু থাকত না।

কিন্তু জানলা বন্ধ করে দিলেন কেন?

নীললোহিত, পৃথিবীতে তোমাকে কি অনেক বন্ধ জানলা দেখতে হবে না?

রুমা বউদি এখনও পায়রাডাঙায় যাওয়ার কথা স্বীকার করেননি, শুধু তোমার দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন। সেই দৃষ্টিতে যেন কিছু একটা বলতে চেয়েছিলেন, সত্যি চেয়েছিলেন, নাকি সেটাও তোমার কল্পনা?

কী সুন্দর সেজেগুজে দেবেনদা আর রুমা বউদি নেমন্তন্ন খেতে গেলেন। দু'জনে খুব ভাব আছে। যেসব দম্পতির বিয়ের অনেকদিন পরেও কোনও সন্তান হয় না, তারা স্বামী-স্ত্রীর বদলে যেন প্রেমিক-প্রেমিকা হয়েই থাকে। মেয়েদের যতদিন সন্তান না হয়, ততদিন তারা প্রেমিকার মতনই থাকে, মা হয়ে গেলেই মা মা!

আবার বাড়াবাড়ি করছ নীললোহিত, এ বিষয়েই বা তুমি কী জানো?

রুমা বউদির যদি আলাদা একটা গোপন জীবন থেকেও থাকে, সেটা দেবেনদাকে জানাবার দায়িত্ব তোমার নয়। তুমি কেন নিমিত্তের ভাগী হতে যাবে?

তোমার পক্ষে আর বেশি কিছু না জানাই ভাল, জানলেই ফাঁস হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে।

সুতরাং, তুমি পায়রাডাঙায় রুমা বউদিকে দেখোনি, সে অন্য রমণী ছিল। শিগগিরই আর পায়রাডাঙায় তোমার যাবারও দরকার নেই। কলকাতা ছেড়ে কিছুদিন অন্য কোথাও গিয়ে কাটিয়ে এসো বরং।

কোথায়? কেন, দিকশূন্যপুরে!

হাতে পয়সাকড়ি একেবারেই নেই। বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে একমাত্র প্রীতমই ধার দিতে পারে। কিন্তু সে এখন প্রথমা ওরফে জাহানারা ওরফে জুন নামে একটি মেয়েকে নিয়ে খুব মেতে আছে।

প্রীতমের মতন জুনও ফটোগ্রাফার হিসেবে বেশ নাম করেছে। ওরা পরস্পরকে চিঠি-ফিঠি লেখার ধার ধারে না, নিজেদের তোলা ছবি বিনিময় করে। প্রীতম আগে বলত, পোর্ট্রেট ফটোগ্রাফিতে ওর কোনও আগ্রহ নেই। এখন রিলের পর রিল শুধু জুনের মুখচ্ছবি তুলে যাচ্ছে। সুতরাং সেখানে আমার কোনও ভূমিকা নেই।

দিকশূন্যপুরে তো আর ডানা মেলে উড়ে যাওয়া যায় না, কিছুটা ট্রেনে, কিছুটা বাসে যেতেই হয়। প্রত্যেকবার ওখানে যাবার সময় আমি কিছু সূচ-সুতো আর জামার বোতাম সঙ্গে নিয়ে যাই, এই জিনিসগুলো ওখানে পাওয়া যায় না। কিছু ডটপেনের রিফিলও কাজে লাগে। কিছু টাকা জোগাড় করতেই হবে।

প্রেমে পড়লে নাকি মানুষ খুব উদার হয়ে যায়। যারা কৃপণ হয়, তারা প্রেম-ভালবাসার জন্য যথেষ্ট আবেগও খরচ করতে পারে না। প্রীতমের কাছেই একটা চান্স নেওয়া যাক।

প্রীতম আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে ভোরবেলা। সারাদিন ও ঘোরে টো-টো

www.amarboi.com

করে। সাধারণত সন্ধের পর ওকে বাড়িতে পাওয়া যায়, তখন ও কম্পিউটারের সামনে বসে কিংবা নিজের ডার্ক রুমে কাজ করে অনেক রাত পর্যন্ত। ঘুমোয় কখন কে জানে!

আগেকার দিনে ছেলেমেয়েদের জন্ম হত আঁতুরঘরে। শুনেছি সেই আঁতুরঘরে পুরুষদের প্রবেশ অধিকার ছিল না। ক্যামেরায় তোলা ছবির জন্ম হয় ডার্ক রুমে, সেখানেও অন্য লোকের ঢোকার অনুমতি পাওয়া যায় না। প্রীতম যদি ডার্ক রুমে ঢুকে বসে থাকে তা হলে আজ আর দেখা হবার আশা নেই।

প্রীতমের নিজস্ব ঘর তিনতলায়, সে সৌভাগ্যবশত এখন কম্পিউটার নিয়ে খেলা করছে।

আমাকে দেখে বেশ খুশি খুশি ভাবেই বলল, আয় নীলু, চেয়ারটা টেনে বোস।

কম্পিউটারের পর্দা জোড়া একটা ছবি, দুই বয়েসি দু'জন মহিলা দাঁড়িয়ে, হাতে চায়ের গেলাস। জুন আর তার মা।

প্রীতম জিজ্ঞেস করল, এটা কোথায় তোলা বল তো?

দেখে তো মনে হচ্ছে কোনও ধাবার সামনে।

হ্যাঁ, ঝাড়গ্রাম থেকে ফেরার সময় খড়্গপুর ছাড়িয়ে এসে থেমেছিলাম এখানে।

বাঃ, বেশ ভাল হয়েছে।

তুই ছবির কী বুঝিস, যে বাঃ বললি? একটা পাশ স্লাইটলি আউট অফ ফোকাস হয়ে গেছে।

এ তো মহা মুশকিল, শিল্পীদের আঁকা ছবি সম্পর্কে কিছু বললে, দুলু অমনই ধমক দেবে, তুই কী বুঝিস? আর ফটোগ্রাফ সম্পর্কে প্রীতম সব জান্তা!

আমি কিছুই জানি না, টেকনিক্যাল ব্যাপার সব না বুঝলেও কি ভাল লাগতে পারে না?

পরের ছবিটা শুধু জুনের। গাড়ির জানলায় তার মুখ।

আমি চুপ।

প্রীতম জিজ্ঞেস করল, এটা কেমন লাগল বললি না?

কী জানি বাবা, আউট অফ ফোকাস ওইসব আছে কি না!

ধ্যাত! এটা ফ্ল্যাশ ছাড়া খুব সফ্‌ট লাইটে তোলা হয়েছে। দেখতে কেমন লাগছে?

জুনের মুখটা আসলে যেমন দেখতে, ছবিতে তার চেয়েও সুন্দর দেখাচ্ছে।

আবার বাজে কথা বলছিস? মোটেই সেটা ভাল ফটোগ্রাফারের কাজ নয়। এক একজনের মুখ এক একটা অ্যাংগ্‌ল থেকে বেশি ভাল দেখায়। যারা সত্যিকারের প্রফেশনাল ফটোগ্রাফার, তাদের কৃতিত্ব হচ্ছে ঠিক সেই অ্যাংগ্‌লটা খুঁজে বার করা।

প্রীতমের মেজাজ যেদিকে যাচ্ছে, এরপর কি আর ওর কাছে টাকা চাওয়া যাবে?

নিরীহ গলায় জিজ্ঞেস করলুম, ছবিগুলো কম্পিউটারের মধ্যে গেল কী করে রে?

কী করে গেল মানে? স্ক্যান করে ঢুকিয়ে দিয়েছি। এবার জুনকে পাঠিয়ে দেব। জুন ওর কম্পিউটারে পেয়ে যাবে!

কম্পিউটার থেকেই ছবি চলে যাবে?

www.amarboi.com

নীলু, তুই আর কতদিন অবোধ বালকটি হয়ে থাকবি রে? মাঝে মাঝে আমার কাছে এসে শিখলেও তো পারিস। আমার তোলা ছবি আমি নিজের হাতে জুনকে দেব কী করে? আমার লজ্জা করে না? সেইজন্য কম্পিউটারে ভরে দিই, জুন হঠাৎ হঠাৎ দেখে অবাক হয়ে যায়। এখন জুনও ওর ছবি পাঠায় এইভাবে।

আমি শুনেছিলাম, তুই আর জুন দু'জনেই ফটোগ্রাফার, তোরা দু'জনে দু'জনকে ছবি পাঠাস, কিন্তু তা যে কম্পিউটারের মাধ্যমে, তা বুঝিনি!

এবার বুঝলি তো? আরও ছবি দেখ!

আগে আমরা মাউজ মানে জানতুম ইঁদুর, এখন কম্পিউটারের একটা উপাদান। সেটা ক্লিক করলে মুহূর্তে দুনিয়া উল্টে যায়।

ইঁদুরের কী মাহাত্ম!

প্রীতম একটার পর একটা ছবি দেখিয়ে যেতে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে রানিং কমেন্ট্রি।

এক সময় সে থেমে গিয়ে বলল, এবার জুনের তোলা ছবি দেখবি?

হ্যাঁ। আচ্ছা প্রীতম, জুন ফটোগ্রাফার হিসেবে কী রকম? মেয়ে বলেই কি ওর একটু-আধটু নাম হচ্ছে, নাকি সত্যিই যোগ্যতা আছে!

তুই বিশ্বাস করবি না নীলু, জুন অসাধারণ ট্যালেন্টেড। ছবি তো অনেকেই তুলতে পারে। কিন্তু ছবিকে আর্টের পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে ক'জন? তার জন্য চোখ লাগে। শুধু টেকনিক্যাল জ্ঞানই নয়, সেই আসল চোখ যার থাকে... জুনের এক একটা ছবিতে পেইন্টিং-এর এফেক্ট আসে... তোকে আমি ফ্র্যাংকলি বলছি, জুনের তুলনায় আমি মিডিওকার। দেখবি, ঠিক মতন সুযোগ পেলে জুন ইন্টারন্যাশনালি ফেমাস হয়ে যেতে পারে।

আমি হাততালি দিয়ে বলে উঠলুম, বাঃ, বাঃ, এই তো চাই!

প্রীতম ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, হাততালি দিলি কেন?

এই যে তুই বললি, জুন তোর চেয়েও ভাল ফটোগ্রাফার, সেই জন্য। ক'জন এটা বলতে পারে? প্রেমিকাকে যে-পুরুষ নিজের থেকেও বেশি গুণী ভাবতে পারে, তার প্রেম সাকসেসফুল হবেই! জুনকে তুই আসল কথাটা বলেছিস?

আসল কথা মানে?

কবে ও বাড়ি বদল করবে? অর্থাৎ তোর বাড়িতে চলে আসবে?

নাঃ, ওসব কথা কিছু হয়নি।

আমি সাহায্য করব?

না, তোকে এখন মাথা গলাতে হবে না। দরকার হলে বলব। এখন ওর ছবি দেখ।

জুনের তোলা দ্বিতীয় ছবিটা দেখে আমার বুকটা ধক করে উঠল।

প্রথম ছবিটা এক জোড়া খেজুর গাছের। ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে নদীতে একটা পালতোলা নৌকো।

তেমন তো আহামরি কিছু লাগল না।

প্রীতম বলে যেতে লাগল, ছবির টেক্সচার লক্ষ করেছিস? ব্যাকগ্রাউন্ডে নৌকোর মাঝির মাথার চুল পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

www.amarboi.com

মনে মনে বললুম, মাঝির মাথায় যদি চুল থাকে, তা হলে তা ছবিতে দেখা যাবে, এতে আর আশ্চর্য হবার কী আছে? মাঝির টাক মাথা হলে টাকই দেখা যেত।

মুখে জিজ্ঞেস করলুম, এ ছবিটা কোথায় তোলা?

আমার গাড়িতে ওকে লং ড্রাইভে নিয়ে গেসলুম। না, না, শুধু বেড়াতে নয়, গাড়িটা কিনব বলে ট্রায়াল দিচ্ছি, একটা কাজ ছিল ওদিকে, গত সপ্তাহে।

দ্বিতীয় ছবিটা প্রীতমের, হাতে এক গোছা বেলুনের সুতো। এ জায়গাটাও মনে হয় কোনও নদীর ধার, আরও কিছু কিছু লোক আছে পিছনে, একজন মহিলা একটি বেলুন দিচ্ছেন একটি ভিখিরি বাচ্চাকে।

প্রীতমের মুখখানা এক দিকে ফেরানো, মনে হয়, ছবিটা তাকে না জানিয়ে তোলা হয়েছে।

প্রীতম বলল, এ ছবিটার আসল গুণ কী বুঝেছিস? আমার হাতে এক গোছা বেলুন, সেটা ডানদিকে, আর বাঁদিকের ভদ্রমহিলার হাতে একটা মাত্র বেলুন, তাতেও বেশ ব্যালান্স হয়েছে, অথচ ব্যাপারটা একটুও সাজানো নয়—আমি টেরই পাইনি কখন ছবিটা তোলা হল।

আমি নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে আছি। নির্বাক।

ইঁদুর টিপে অন্য একটা ছবি আনল প্রীতম, আমি সচকিতভাবে বললুম, এই দ্বিতীয় ছবিটা আবার দেখব।

সে ছবিটা ফিরে এল।

এটা কোন নদী রে প্রীতম?

চিনতে পারছিস না? গঙ্গা। ডায়মন্ডহারবারের ট্যুরিস্ট লজ একটুখানি ছাড়িয়ে।

তুই বুঝিয়ে দিলি বলে বুঝতে পারলুম কম্পজিশানটা। দারুণ। ওই যে ভদ্রমহিলা ভিখিরিকে বেলুন দিচ্ছেন, উনি কে রে?

তা আমি কী করে জানব? ওখানে অনেক লোক ছিল।

মহিলাটি যে রুমা বউদি, তাতে কোনওই সন্দেহ নেই। ওঁর কথা আর মনেই আনব না ভেবে বেরিয়েছিলাম বাড়ি থেকে, অথচ এখানে রুমা বউদির ছবি। প্রীতমের কম্পিউটারে। রুমা বউদি সেই ডায়মন্ডহারবারে, যখন তাঁর শ্রীরামপুরে থাকবার কথা।

এরপর প্রীতম আরও কয়েকটা ছবি দেখাল, আমার ভালই লাগল না।

ডায়মন্ডহারবারের দিকে বেড়াতে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। ভিখিরিকে বেলুন দেওয়াটাও রুমা বউদির চরিত্রে বেশ মানিয়ে যায়, কিন্তু দেবেনদা এ ব্যাপারটা জানেন না কেন?

আবার কৌতূহল? না, আমি এ নিয়ে মাথা ঘামাব না।

ছবি দেখানো শেষ করে প্রীতম বলল, এবার তোর খবর বল, নীলু। তুই তো চাকরি করতে চাস না। কিন্তু একটা খুব ভাল কাজের অফার ছিল।

কোথায়?

আমার বাবার বন্ধু জহর চ্যাটার্জি, জার্মানি থেকে ফিরে এসেছেন রিটায়ার করে,

www.amarboi.com

একগাদা টাকা নিয়ে এসেছেন। ওঁর মাথায় এখন খেয়াল চেপেছে, ফুলের চাষ করবেন। বাকি জীবন কাটাবেন শুধু ফুলের মধ্যে। অনেকখানি জমি সমেত বাড়ি কিনেছেন একটা, সুন্দর বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি। ফুলের চাষও শুরু হয়ে গেছে। উনি চাইছেন একজন বিশ্বাসী কেয়ার টেকার কাম ম্যানেজার। শুনেই আমি তোর কথা ভেবেছি। তুই সেখানে গিয়ে থাকবি। সারাদিন নিশ্বাসে ফুলের গন্ধ পাবি, সে রকম কিছু খাটনি নেই, রাত্তিরে ঘুম না এলে বারান্দায় বসে দেখবি, গোলাপ বাগানে জ্যোৎস্না পড়েছে। নিতে চাস তো বল। তবে কলকাতা ছেড়ে ওখানে গিয়ে থাকতে হবে কিন্তু।

ওখানে মানে কোথায়?

ডায়মন্ডহারবার থেকে বড় জোর দু'আড়াই মাইল দূরে।

আবার ডায়মন্ডহারবার? আজ খালি ঘুরে ফিরে ডায়মন্ডহারবার চলে আসছে। সকালে খবরের কাগজেও ডায়মন্ডহারবারের কাছে গঙ্গায় একটা নৌকোডুবির খবর দেখেছি প্রথম পাতায়।

প্রীতম বলল, তোর ওখানে খাইয়িং থাকিং ফ্রি। যা মাইনে পাবি, তার কিছুই প্রায় খরচ হবে না। তোর কোয়ার্টারে আমরাও মাঝে মাঝে বেড়াতে যাব!

আমি বললুম, আমার এ চাকরি নেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

প্রীতম হকচকিয়ে গিয়ে বলল, তুই নিবি না? এর চেয়ে ভাল কাজের অফার আর কখনও পাবি? আমি মাসিমাকে গিয়ে বলব, আপনার ছেলে...

দেখ প্রীতম, এটা যদি ভাল চাকরিই হবে, তবে তুই আমার বাড়িতে গিয়ে খবর দিসনি কেন? তুই কতবার ভোরবেলা গিয়ে আমাকে ডেকে তুলেছিস, এজন্য যেতে পারলি না? এখানে আমি আজ হঠাৎ এসে পড়েছি, তাও প্রথমেই কিচ্ছু বলিসনি, কতকগুলো বাজে বাজে ছবি দেখালি—

বাজে বাজে ছবি?

বাজে না হোক, অতি সাধারণ। অ্যাংগেল ম্যাংগেল কত কী বোঝাবার চেষ্টা করলি, ওরকম ছবি আমি ঢের দেখেছি!

ছবি শুধু দেখলেই হয় না। বুঝতে হয়। তুই চাকরিটা নিবি না?

আমি হঠাৎ এসে পড়েছি বলে তোর মনে পড়ল? তাও এতক্ষণ পর। রাস্তায় কোনও বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলে, অনেকক্ষণ কথা বলার পর যদি কেউ বলে, কাল আমার বিয়ে, তোমাকে আগে নেমন্তন্ন করা হয়নি, এই নাও কার্ড—তা হলে সে বিয়েতে কেউ যায়? আমি কি ভিখিরি নাকি? আমি কি চাকরির জন্য কুকুরের মতন জিভ বার করে হন্যে হয়ে ঘুরছি?

আমার ভুল হয়ে গেছে রে নীলু! এবারে ক্ষমা করে দে। সত্যি, তোর বাড়িতে গিয়েই বলা উচিত ছিল। কিন্তু কাজটা ভাল কি না বল! সারাদিন চারপাশে শুধু ফুল আর ফুল!

এমন কিছু ভাল নয়। থাকতে হবে কোন ধ্যাদ্দারা গোবিন্দপুরে। আর কোনও ভাল জিনিসই দিনের পর দিন ভাল লাগে না। ফুল দেখতে দেখতেও চোখ পচে যায়।

www.amarboi.com

তোর বাবার বন্ধু ফুলের ব্যবসা করবেন, তার মানে কী? ডায়মন্ডহারবারে অত ফুল কে কিনবে?

ডায়মন্ডহারবারে শুধু কিনবে কেন? কলকাতায় চালান আসবে। কলকাতার এত ফুল আসে কোথা থেকে? ফুল আমাদের দেশ থেকে এক্সপোর্টও হয়। কোটি কোটি টাকা ফরেন এক্সচেঞ্জ আসে।

বাজে ব্যবসা!

তার মানে?

গাছ থেকে ফুল ছিঁড়ে ছিঁড়ে বিক্রি করা একটা নিষ্ঠুর ব্যাপার। ফুল তো মানুষের জন্য ফোটে না। প্রজাপতি, ভোমরা, মৌমাছি, ফড়িং ওদের জন্য ফোটে। ওদের জন্য সেজে থাকে।

ওসব এলেবেলে কথা ছাড় তো। মানুষের বিয়ে থেকে শ্রাদ্ধ, কোনওটাই ফুল ছাড়া চলে না। তুই এইসব ছুতোনাতা দেখিয়ে চাকরিটা নিতে চাস না?

এবার নীললোহিতকে একটুক্ষণ চুপ করে থাকতেই হল। প্রীতম এরপর আমার মাকে আর দাদা-বউদিকে বলবে, বন্ধু-বান্ধবদের বলবে, নীলুটা এত সহজ শর্তে একটা লোভনীয় চাকরিও নিতে চায় না, ও আসলে অলস, ফাঁকিবাজ, অকর্মণ্য, সব রকম দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে চায়—

অর্থাৎ সপ্তরথী দিয়ে ঘিরে ফেলবে আমাকে। কোনও যুক্তিগ্রাহ্য উত্তরই দিতে পারব না।

সুতরাং আমাকে বলতেই হল, ঠিক আছে, কিছুদিনের জন্য ট্রাই করা যেতে পারে। তবে আমার একটা কন্ডিশান আছে। তোর বাবার বন্ধু জহরবাবু আমাকে তুমি বলতে পারবেন না। আপনি বলতে হবে।

উনি তোর বাবার বয়েসি।

তা হোক। একজন অচেনা লোক, চাকরি দিয়েছে বলেই হুট করে তুমি তুমি করবে কেন? আর আমাকে কখনও বাজারে পাঠাতে পারবেন না। কাজের লোক কাছাকাছি নেই বলে উনি যে বলবেন, যাও তো নীলু, ডায়মন্ডহারবার থেকে চারটে সোডার বোতল নিয়ে এসো—তা চলবে না!

সোডার বোতল? উনি মদ খান না।

কিংবা যদি দাড়ি কামাবার ব্লেড আনতে বলেন—

উনি দাড়ি কামান না। আচার্য পি সি রায়ের মতন দাড়ি রেখেছেন। কী আজেবাজে কথা বলছিস নীলু? আলাপ হলে দেখবি, উনি কত ভাল মানুষ। তুই নিজেই পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করবি। রাজি থাকিস তো বল, এক্ষুনি ফোন করে জানিয়ে দিই।

আমাকে রাজি-সূচক সামান্য ঘাড় হেলাতেই হল।

প্রীতম টেলিফোন নিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে বলল, কী ব্যাপার হচ্ছে? রিং হচ্ছে, কেউ ধরছে না। উনি তো ওখান থেকে আর কোথাও যান না।

রাত্তিরেও কি একবারও বেরোন না? হয়তো গঙ্গার ধারে হাওয়া খেতে গেছেন!

প্রীতম বলল, মোবাইল ফোনটাতেও চেষ্টা করলুম, সেটা খোলা নেই। এরকম

www.amarboi.com

সাধারণত হয় না।

অনেক সময় এক একটা এক্সচেঞ্জেই জ্যাম থাকে।

বেশি দেরি করা ঠিক হবে না, বুঝলি নীলু। তোকে তো একটা ইন্টারভিউ মতন দিতেই হবে। চল, সোজাসুজি ডায়মন্ডহারবার চলে যাই। উনি তো ওখানে থাকবেনই।

চল।

এক্ষুনি?

তুই কখন যেতে চাস?

এখন রাত সাড়ে আটটা। গাড়ি নিয়ে গেলে অন্তত দশটা বাজবেই। তাতে অবশ্য অসুবিধে নেই। জহরকাকা অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকেন। কিন্তু ফিরব কখন?

ফিরতেই হবে?

ওখানেও থেকে যাওয়া যায়। না, না, তা তো হবে না। কাল সকালে আমার হেভি কাজ আছে। নটার সময় একজন আসবে।

তা হলে রাত্তিরেই ফিরে আসা যায়। কটা আর বাজবে, দুটো-তিনটে। অত রাতে আমার বাড়িতে দুম দুম করে দরজায় ধাক্কা দেব। দরজা খুলে দেবে মা কিংবা দাদা। খুব সম্ভবত দাদাই। দু'চোখে ভাঙা ভাঙা ঘুম আর ঠোঁটে বিরক্তি মাখানো। আমাকে বকুনি দেবার আগেই আমি বলে উঠব, আমি চাকরি পেয়েছি। আমি চাকরি পেয়েছি। গোলাপ বাগানে। সুর লাগিয়ে গান গেয়ে বললে আরও ভাল হয়। তখন দাদার মুখের অবস্থাটা কেমন হবে বল?

তোর দাদা ভাববে, তুই গাঁজা খেয়ে এসেছিস। অত রাতে গাড়ি ড্রাইভ করাও সেফ নয়। বরং কাল সকালে, আমার কাজটা হয়ে গেলে, দশটা-সাড়ে দশটা আন্দাজ বেরিয়ে পড়লেই হবে। জুনকেও বলা যেতে পারে, যদি সঙ্গে যায়—

এখন গেলে জুনকে নেওয়া যাবে না, তা ঠিক।

তা হলে এটাই ঠিক রইল, কাল সকাল দশটা থেকে সাড়ে দশটার মধ্যে তোকে তুলে নেব বাড়ি থেকে। এর মধ্যে জুনের সঙ্গে কথা বলে রাখব। তুই এখন বাড়ি ফিরে ডিকশনারি খুলে যতগুলো পারিস ফুলের বাংলা নাম মুখস্থ কর। যেমন ধর অ্যাজেলিয়া, তার বাংলা নাম জানিস? না জানলেও ক্ষতি নেই। জহরকাকু এরকম কিছু জিজ্ঞেস করলেই তুই চোখ বুজে তক্ষুনি একটা নাম বানিয়ে বলে দিবি। জহরকাকু সন্দেহ প্রকাশ করলে বলবি, রবীন্দ্রনাথ এই নাম দিয়েছেন। ব্যস, রবীন্দ্রনাথের ওপরে তো আর কথাই নেই!

অ্যাজেলিয়াকে বলব অঞ্জলি ফুল।

বাঃ, চলবে, চলবে।

আর ক্যামেলিয়াকে বলব কমলিকা।

এ দুটো এক্ষুনি বানালি?

আগে তো ভাই কখনও কোনও ফুল বাগানের মালির চাকরির ইন্টারভিউ দিইনি।

মালির চাকরি কে বলল?

www.amarboi.com

দারোয়ান। বাংলায় যাকে বলে কেয়ারটেকার।

না, তাও নয়। বাংলায় যাকে বলে ম্যানেজার। দেখিস, তোর খুব ভাল লাগবে কাজটা।

প্রীতম আমাকে এগিয়ে দিতে এল সিঁড়ি পর্যন্ত। যেন ও নিজেই একটা দারুণ চাকরি পেয়ে গেছে। এমনই উৎফুল্ল ওর মুখ। এমন বন্ধু ক'জন পায়!

আমার মুখ ফস্‌কে হঠাৎ বেরিয়ে এল, ওই ভদ্রমহিলার সঙ্গে আর কেউ ছিল?

চোখ মুখ ঘুঁচিমুচি করে প্রীতম জিজ্ঞেস করল, কোন ভদ্রমহিলা?

ওই যে ছবিতে, যার হাতে একটা বেলুন।

তোর মাথা খারাপ হয়েছে? বললুম তো, ভদ্রমহিলাকে আমি চিনিই না। তার সঙ্গে কেউ ছিল কি না, তা আমি জানব কী করে? ভদ্রমহিলা তোর চেনা?

একটু চেনা চেনা লাগল। ভুলও হতে পারে।

আবার কৌতূহল? নিজের গালে ঠাস ঠাস করে চড় মারতে ইচ্ছে হল। রুমা বউদির সঙ্গে কেউ ছিল কি না, তাতে আমার কী আসে যায়?

॥ ৪ ॥

কাল রাতেই যদি ঝোঁকের মাথায় আমরা বেরিয়ে পড়তুম, ডায়মন্ডহারবার পৌঁছে যেতুম দশটার মধ্যে, তা হলে পরবর্তী ঘটনাগুলো সব বদলে যেত।

ছোটখাটো এক একটা ভুল সিদ্ধান্তের জন্য কত বড় বড় কাণ্ড ঘটে যায়।

এই তিন মাসের মধ্যেই জুনের চেহারায় যেন বেশ বদল ঘটে গেছে।

চিকলিগড়-ঝাড়গ্রামে যখন দেখেছি, তখন তার ভাব-ভঙ্গি ছিল গম্ভীর গম্ভীর। কখনও একটু হাসলে মনে হত যেন দয়া করে উপহার দিচ্ছে।

মেয়েরা কেন বোঝে না যে অকারণ গাম্ভীর্য জিনিসটা শুধু ফাঁপা মানুষদেরই মানায়। ঠোঁট দুটি সোজা থাকার বদলে একটু ঢেউ খেলালেই বাতাসেও তরঙ্গ ওঠে।

এর মধ্যে চুল আরও ছোট করেছে জুন। চিকলিগড়ে ওকে জিন্‌স আর ঢোলা জামা পরতে দেখিনি। গাড়ি চলতে শুরু করার পর সে একটা সিগারেট ধরাল। মেয়েদের সিগারেট খেতে দেখলে আমার ভাল লাগে, কারণ তখন তাদের ঠোঁট দুটো খুব ইয়ে দেখায়। ইয়ে মানে চুম্বন-উন্মুখ।

এই ধরনের মেয়েদের ঠিক প্রেমিকা কিংবা বিয়ের পাত্রী হিসেবে যেন মানায় না। যেন এরা বড্ড বেশি স্বাধীনচেতা। সারা জীবন একা থাকার সংকল্প নিয়েছে।

অবশ্য এটা বাইরের রূপ।

আমার সম্পর্কে এর মধ্যে প্রীতমের কাছ থেকে কী শুনেছে কে জানে, প্রথম থেকেই মুচকি মুচকি হাসছে। প্রীতম বাংলায় লবডঙ্কা, ও যে প্রথম চিঠিটা জুনকে দিয়েছিল, সেটা যে আসলে আমারই লেখা, তা নিশ্চয়ই জুন জানে না।

প্রীতম আর জুন দু'জনের কাঁধ থেকে ঝুলছে দু-তিনটে করে ক্যামেরা।

যদি ওরা শেষ পর্যন্ত বিয়ে করে, তা হলে ফটোগ্রাফার দম্পতি হিসেবে নিশ্চয়ই

www.amarboi.com

ওরা বাংলায় রেকর্ড করবে। গিনেস বুক অফ রেকর্ডসেও নাম উঠে যেতে পারে। পাইলটের সঙ্গে পাইলটের বিয়ে তবু কল্পনা করা যেতে পারে, কিন্তু ফটোগ্রাফারের সঙ্গে ফটোগ্রাফারের গাঁটছড়া বন্ধনের কথা আগে কেউ শুনেছে কি?

এক সময় জুন বলল, আমি কখনও চাকরি করার কথা ভাবিনি। কিন্তু এখন, নীললোহিত, আপনাকে আমার হিংসে হচ্ছে। এই ফুলবাগানের চাকরিটা আমার পাওয়া উচিত ছিল। আর সারাদিন ফুলের সঙ্গে কাটানো, গাছে জল দেওয়া, ফুলগুলোকে হাত বুলিয়ে আদর করা—

আমি বললুম, মেয়েদের নাম মালিনী হয় বটে, কিন্তু কোনও মেয়ে-মালির কথা আমি আগে শুনিনি।

প্রীতম বলল, আঃ, কেন, মালি, মালি করছিস। এটা মোটেই মালির চাকরি নয়। ও বাগানে পাঁচজন মালি কাজ করে। নীলু হবে ম্যানেজার।

জুন বলল, সে আপনি যা-ই বলুন। আগেরবার যখন এসেছিলুম, তখন পাড়ার লোক আপনার জহরকাকাকেও বলছিলেন মালিবাবু!

জহরকাকা এত জন মালি রেখেও নিজের হাতে গাছগুলোর যত্ন করেন। রাত্তিরবেলা, ঘুরে ঘুরে দেখেন বাগানটা।

আমি বললুম, প্রীতম, আমি এখনও স্যাক্রিফাইস করতে রাজি আছি, জুন চাকরিটা নিতে পারে ইচ্ছে হলে।

জুন বলল, আমি কারও স্যাক্রিফাইস-এর সুযোগ নিতে চাই না। আপনার তো দিকশূন্যপুরে যাবার কথা ছিল, হঠাৎ চাকরি নিতে রাজি হলেন?

দিকশূন্যপুর? আপনি জানলেন কী করে?

বাঃ, চিকলিগড়ে আপনি বলেছিলেন না, আমাকে দিকশূন্যপুর দেখাতে নিয়ে যাবেন?

আমি সে কথা বলিনি। আপনি জায়গাটার কথা শুনে যেতে চেয়েছিলেন। আমি কারওকে সেখানে সঙ্গে নিয়ে যাই না। যে যাবে, সে নিজেই রাস্তা খুঁজে খুঁজে যাবে।

প্রীতম বলল, জানেন জুন, নীলু এটাও সহজে নিতে রাজি হয়নি। ও তো গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ায়। এদিকে মাসিমা আমাদের কাছে দুঃখ করেন, তোমরা নীলুর জন্য একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দিতে পারো না? আমি যতবার একটা কিছু জোগাড় করি, ও কাটিয়ে দেয়।

জুন বলল, সবাই যদি চাকরি করে, তা হলে গান গাইবে কে?

নীলু গান গাইতে পারে না।

কিংবা ছবি আঁকা কিংবা নাটক, কিংবা কবিতা লেখা, কিংবা বাঁশি বাজানো, আই মিন, জীবনের যে একটা নান্দনিক দিক, সেটাও তো কারওকে কারওকে জাগিয়ে রাখতে হবে।

নীলু ওর কোনওটাই কিন্তু পারে না। মাঝে মাঝে খালি কোথাও উধাও হয়ে যায়।

তবু তো ওর একটা দিকশূন্যপুর আছে। তাই-ই বা ক'জনের থাকে?

www.amarboi.com

আমি চোখ সরু করে তাকালুম জুনের দিকে।

ব্যাপারটা কী, মেয়েটি হঠাৎ আমার পক্ষ নিয়ে কথা বলছে কেন? চিলকিগড়ে যা হয়েছিল, তাতে আমার ওপরে ওর রাগ থাকারই কথা।

তা ছাড়া, প্রীতমেরই বা এসব কথা পছন্দ হবে কেন? প্রেমিকার মুখে বন্ধুর প্রতি পক্ষপাতিত্ব! মহাভারতের রাম, অত যে ভাইয়ের প্রতি ভালবাসা, সেও সীতাকে বলেছিল, তুমি আমার সামনে ভরতের প্রশংসা করবে না!

দুর ছাই, রাম আবার মহাভারতে আসবে কোথা থেকে! একটি মেয়ে যেই একটু আমার দিকে টেনে কথা বলছে, অমনি আমার রামায়ণ-মহাভারত গুলিয়ে যাচ্ছে?

মন, শেষবারের মতন জেনে নাও, জুনের প্রতি তুমি কিছুতেই দুর্বল হবে না। সে তোমার বন্ধুর প্রেমিকা। বন্ধুর প্রতি অনার রক্ষা করতেই হবে।

আমতলায় গাড়ি থামিয়ে চা খাওয়া হল।

রাস্তার ওপর একটা লম্বা সাপ পড়ে আছে। কেউ থেতলে দিয়েছে তার মাথাটা, তবু লেজের দিকে একটু একটু নড়ছে।

জুন মুখ কুঁচকে বলল, এঃ, সাপ দেখলে আমার গা গুলিয়ে ওঠে।

আমি বললুম, পেছন ফিরে দাঁড়ান। এটা একটা দাঁড়াশ সাপ। এদের বিষ থাকে না। এ বেচারাকে না মারলেও হত।

জুন খানিকটা অবিশ্বাসের সুরে বলল, আপনি বুঝি সাপ চেনেন?

প্রীতম বলল, ও গ্রামে গঞ্জে ঘুরে বেড়ায়, তাই অনেক কিছু চেনে।

জুন বলল, অনেক লোক দেখেছি, যারা বেশির ভাগ গাছ চেনে না, বুলবুলি পাখি দেখে জিজ্ঞেস করে এটা কী পাখি! পৃথিবীর অনেক কিছু না জেনেই তারা জীবনটা কাটিয়ে দেয়। আপনি কী করে জানলেন, এই সাপের বিষ থাকে না?

এটা পুরুষ সাপ। এদের যে-গুলো মেয়ে, সেই কেউটের সাংঘাতিক বিষ! জানেন নিশ্চয়ই, জীবজগতে মেয়ে প্রাণীরাই সবচেয়ে হিংস্র আর নিষ্ঠুর। মশা থেকে সিংহী পর্যন্ত। যে মশার কামড়ে ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া হয়ে মানুষ মরে, সেগুলো সব মেয়ে। পুরুষ মশারা অতি নিরীহ। আর মেয়ে মাকড়সারা তো পুরুষদের খেয়েই ফেলে।

আর মানুষরা ঠিক তার উল্টো। হিংস্র হয় পুরুষরাই। তারা মেয়েদের ওপর কত অত্যাচার করে, মারে, ঘরে আটকে রাখে, আর অপমানের তো শেষ নেই।

তা ঠিক। নিছক গায়ের জোরের জন্যই বোধহয় পুরুষদের কাছে মেয়েরা অসহায়। তবে, মাঝে মাঝে মেয়েরাও প্রতিশোধ নিতে ছাড়ে না। টিরানি অফ দা উইক বলে একটা কথা আছে না? মেয়েরা কেঁদে অনেক সময় জিতে যায়। কিংবা এমন বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে কথা বলে যে পুরুষদের বুক ভেঙে যায়। মেয়েদের কাছে আঘাত পেয়ে পুরুষরা আত্মহত্যা করে না?

সে আর ক'জন? ওসব প্রেমট্রেমের কথা বাদ দিন। আমাদের দেশে এখনও কত অসংখ্য বধূহত্যা হয়। বউদের পুড়িয়ে মারে কিংবা অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে তারা নিজেরাই গায়ে আগুন দিয়ে মরে। এই সব কারণে বিয়ে ব্যাপারটার ওপরেই

www.amarboi.com

আমার ঘেন্না ধরে গেছে!

এই রে, আলোচনা ঘুরে যাচ্ছে অন্য দিকে।

প্রীতম তো নিছক বান্ধবী চায় না, লিভ টুগেদারও চায় না। সে চায় একটা জলজ্যান্ত বউ। আর জুন সম্পর্কেই তার যাকে বলে অবসেশান!

কথা ঘোরাবার জন্য আমি বললুম, এই দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় বড্ড সাপের উপদ্রব। বিশেষ করে এই বর্ষার সময় খুব সাপ বেরোয়। এই সব জায়গাগুলোই আগে সুন্দরবনের মধ্যে ছিল তো!

জুন বলল, আপনি এখনকার সুন্দরবনে গেছেন?

অনেকবার।

প্রীতম বলল, নীলুর সঙ্গে আমিও কয়েকবার গেছি। সাতজেলিয়াতে ওর একটা চেনা জায়গা আছে, সেখানে থাকাও যায়। দু -একদিন না থাকলে জায়গাটা ঠিক ফিল করা যায় না। নৌকোয় করে ঘোরা।

আমি বললুম, প্রীতম, তোর সঙ্গেও তো চেনা হয়ে গেছে। তুই জুনকে নিয়ে যেতে পারিস। তোরা দু'জনেই ছবি তোলার অনেক সাবজেক্ট পাবি!

জুন বলল, আমি কখনও নৌকোয় করে কোথাও ঘুরিনি।

প্রীতম বলল, ব্যবস্থা করা যেতে পারে। খুব ইজি।

ছিপ ছিপ করে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। তবু তার মধ্যে বেশ জোরে গাড়ি চালাচ্ছে প্রীতম। সঙ্গে একটি মেয়ে থাকলেই স্পিড বেড়ে যায়।

ছেলেরা কেন যে মনে করে, একটা মেয়ের সামনে খুব জোরে গাড়ি চালানো পৌরুষের লক্ষণ! তা হলে তো মিনি বাসের ড্রাইভাররাই পৌরুষের পরাকাষ্ঠা!

সত্যি কথা বলতে কী, কেউ খুব জোরে গাড়ি চালালে আমার বেশ ভয় ভয় করে। কখনও অ্যাকসিডেন্টে পড়িনি বলেই বেশি ভয়। একবার অন্তত ছোটখাটো একটা অ্যাকসিডেন্ট হলে তবু বুঝতুম। যাক, ফাঁড়া কেটে গেল। এক জিনিস দু'বার হয় না!

ভয়ের কথা বলাও যায় না মুখে। তা হলেই কাপুরুষ হয়ে যাব। সিঁটিয়ে বসে রইলুম। আর মনে মনে ভাবলুম, এই সময় প্রীতমের গাড়িটা একবার খারাপ হয়ে গেলে বেশ হয়!

জুন আমাকে বলল, সত্যিই একবার যাবেন সুন্দরবন? নৌকো করে ঘোরা হবে।

আমি বললুম, প্রীতমই ব্যবস্থা করতে পারবে। ঘুরে আসুন না।

আপনি যাবেন না কেন?

তিনজন গেলে বড্ড ভিড় হয়ে যায়!

এবারে জুন বেশ স্বচ্ছ, সাবলীলভাবে হেসে উঠল জোরে।

প্রীতম বলল, তা ছাড়া, নীলু নতুন চাকরি নিয়েই তো ছুটি পাবে না। অন্তত মাস ছয়েক ওর কোথাও যাওয়া চলবে না।

রাস্তার মাঝখানে একটা গোরু, দারুণ ঝুঁকি নিয়ে সেটাকে পাশ কাটিয়ে গেল প্রীতম। তারপরেই এক হৃষ্টপুষ্ট মুরগিমাতা তার এক পাল বাচ্ছাকে নিয়ে পথ অতিক্রম করছে।

www.amarboi.com

আমার এক বন্ধুর কাছে শুনেছি, গ্রামের দিকে গাড়িতে কোনও মুরগি চাপা দিলে অন্তত পাঁচশো টাকা খেসারত দিতে হয়। অত টাকা কেন? মুরগির মালিক বলেছিল, ওই মুরগিটা সামনের কুড়ি বছর ধরে কত ডিম দিত, সেটা হিসেব করুন! (মুরগিরা কত বছর বাঁচে এবং সারা জীবনে কত ডিম দেয়, সে বিষয়ে আমার কোনও ধারণা নেই।) বন্ধুটি যেটাকে চাপা দিয়েছিল, তার মাথায় ঝুঁটি আছে, অর্থাৎ সেটা মোরগ, ডিম দেওয়া বোধহয় তার কাজ নয়। সে কথা উল্লেখ করায় মোরগের মালিকটি এমনই কাঁচা একটা যৌন তুলনা দিয়েছিল, যা উচ্চারণ করা যায় না।

প্রীতমের এই গতি— পৌরুষে কিন্তু আপত্তি জানাচ্ছে না জুন। সে-ই বসে আছে সামনের সিটে। মাঝে মাঝে ক্যামেরা তুলছে চোখের কাছে, ছবি তুলছে না।

শহরে ঢোকার আগে ব্রিজটা পেরনোর সময় প্রীতমকে গাড়ির গতি শ্লথ করতেই হল।

গঙ্গার ধার দিয়ে যেতে যেতে আমার মনে হল, এক হিসেবে এই চাকরিটা ভালই! ফুলের বাগান আর অনাথ আশ্রম একই। সব ফুলই তো অনাথ। সেজন্য নয়, এখান থেকে পায়রাডাঙা কাছেই, মাঝে মাঝে দুলুর সঙ্গে দেখা হবে। সুতরাং এ জায়গাটাকে নির্বান্ধব পুরী বলা যাবে না।

বড় রাস্তা ছেড়ে সামান্য ভেতরে, লাল সুরকির রাস্তা, তারপর লোহার গেট।

সেই গেটের ওপর আর্ট করে বাংলায় লেখা 'পুষ্প বিকাশ কেন্দ্র'।

ফুলের ব্যবসার নাম পুষ্প বিকাশ? বাংলাটা কি ঠিক হল? বেশি আধুনিক কাব্যগন্ধী নয়?

প্রীতমের দিকে তাকাতেই ও বুঝতে পারল। বাংলা সম্পর্কে আমার অকারণ খুঁতখুঁতনি আছে।

প্রীতম বলল, জহরকাকার ছেলের নাম ছিল বিকাশ। তরুণ ব্রিলিয়ান্ট ইঞ্জিনিয়ার। এয়ার ক্র্যাশে মারা গেছে। সেই কারণে মন ভেঙে যাওয়ার জন্যই জহরকাকা জার্মানি ছেড়ে চলে আসেন। কাকিমাও অনেকদিন নেই। ভদ্রলোক প্র্যাকটিক্যালি একা। সেই জন্যই ফুল আর গাছপালা নিয়ে বাকি জীবনটা কাটাতে চান।

গেটে কোনও দারোয়ান নেই।

এসব জায়গায় চোর-ডাকাতদের খুবই উপদ্রব আছে শুনেছি। ভদ্রলোক বিদেশে ছিলেন বহুদিন। এখানকার বাস্তববুদ্ধি নিশ্চয়ই খুব কম। গেটে বন্দুকধারী পাহারা রাখা উচিত ছিল।

আমার চাকরিজীবনে প্রথম কাজই হবে পাহারার ব্যবস্থা করা।

গাড়িটা সোজা চলে এল ভেতরে।

দু'পাশের বাগানে অধিকাংশ গাছই ছোট ছোট। অনেক গাছেই ফুল নেই। এক দিকে অনেকখানি গোলাপবাগান। এখন অবশ্য গোলাপ ফোটার সময় নয়, অপেক্ষা করতে হবে শীতকাল পর্যন্ত। সেই বাগানের মাটি কোদাল দিয়ে কোপানো, এবড়োখেবড়ো। গোলাপের জন্য বিছানা তৈরি করতে হয় শুনেছি।

কী আশ্চর্য, শুধু একটা গোলাপ গাছে দুটি ফুল ফুটে আছে।

www.amarboi.com

বাগানে কোনও মালি এখন কাজ করছে না।

সমস্ত জায়গাটাই জনশূন্য।

প্রীতম আপন মনেই বলল, লোকজন সব গেল কোথায়?

এক পাশে পুরনো আমলের একটা দোতলা বাড়ি। আর খানিকটা দূরে, উল্টোদিকে একটা ছোট একতলা বাড়ি, সামনে অনেকটা বারান্দা।

প্রীতম ছোট বাড়িটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, ওটা, বুঝলি নীলু, খুব সম্ভবত হবে তোর কোয়ার্টার। হ্যাঁ, ওটা হওয়াই স্বাভাবিক।

জুন বলল, বাঃ, খুব কিউট। আমি ওই বাড়িতে এসে থাকব মাঝে মাঝে।

প্রীতম বলল, যখন বলবেন, নিয়ে আসব।

জুন বলল, আপনাকে নিয়ে আসতে হবে কেন? আমি একলা আসতে পারি না? কী, নীললোহিত, আমি একলা এলে থাকতে দেবেন না?

এ সব প্রশ্নের উত্তর দিতে একটুও দেরি করতে নেই, তা হলে মজা নষ্ট হয়ে যায়।

আমি সঙ্গে সঙ্গে বললুম, হ্যাঁ, যখন ইচ্ছে চলে আসবেন। আমার পিসিমা তো থাকবেনই, আপনার কোনও অসুবিধে হবে না।

প্রীতম বিস্মিতভাবে বলল, পিসিমা?

আমি বললুম, হ্যাঁ। আমার মা রেগুলার আসতে পারবেন না। দাদার সংসারে থাকে, নাতি-নাতনি আছে, কিন্তু পিসিমা আমায় একা ছাড়বেন না। পিসিমার ছেলেমেয়ে নেই, আমাকে দারুণ ভালবাসেন। যা দারুণ রান্না করেন, ডিমের পোলাউ, চিতল মাছের মুইঠ্যা, পুঁইশাক-চিংড়ি ...

আমার অস্তিত্বহীন পিসিমার রান্নাবান্নায় এমনই বর্ণনা দিতে লাগলুম, যা শুনলে যে-কোনও লোকেরই জিভে জল আসবে।

জুন বলল, চলুন, আগে কোয়ার্টারটা দেখে আসি!

প্রীতম বলল, দাঁড়ান, আগে জহরকাকার সঙ্গে কথাবার্তা ঠিক হোক। কোথাও তো কারওকে দেখতে পাচ্ছি না।

বস্তুত, পুরো বাগানটাই মনে হচ্ছে জনমানব শূন্য।

প্রীতম দোতলা বাড়িটার সামনে গাড়ি থামাল।

সে বাড়ির সদর দরজা বন্ধ।

প্রীতম গাড়ি থেকে নেমে সে দরজায় ধাক্কা দিতে দিতে ডেকে উঠল, জহরকাকা! জহরকাকা!

একটু বাদে দরজা খুললেন একজন বেশ বয়স্ক মহিলা। তাঁর শাড়ি কিংবা মুখের ভাব, কিছু একটা দেখেই বোঝা যায়, তিনি ঠিক আত্মীয় শ্রেণীর নন, কাজের লোক, বড় জোর রাঁধুনি কিংবা হাউস কিপার।

প্রীতম জিজ্ঞেস করল, জহরকাকা কোথায়?

মহিলা বললেন, তুমি কে বাবা?

প্রীতম বলল, এখানকার জহরবাবু আমার কাকা হন। আপনি তো আমায় আগে দেখেছেন। বেশ কয়েকবার এসেছি।

www.amarboi.com

ভদ্রমহিলা হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন।

এরপর জানা গেল এক চমকপ্রদ, নিদারুণ সংবাদ।

গত রাতে জহরকাকাকে সাপে কামড়েছে।

তিনি প্রবাসের অভ্যেস অনুযায়ী ডিনার খেয়ে নেন আটটার মধ্যে। তারপর বই পড়েন এক ঘণ্টা। এর পরের এক ঘণ্টা তিনি টিভি-তে বি বি সি'র বিশ্ব সংবাদ দেখেন।

তারও পরে, রাত দশটা থেকে সাড়ে দশটা তিনি ঘুরে বেড়ান বাগানে। বিশেষত গোলাপ বাগানে একটা গাছে ফুল আছে, তিনি কুঁড়ি থেকে ফুল ফোটা পর্যন্ত দেখতে চান। ঘুমোতে যান ঠিক সাড়ে দশটার সময়।

কাল ঠিক রাত দশটা থেকে সাড়ে দশটার মধ্যে গোলাপবাগানে তাঁকে সাপে কামড়েছে। তাঁর চিৎকারে কয়েকজন মালি ছুটে গিয়েছিল, সাপটাকে তারা দেখেছে। কালকেউটে, সেটা মারাও পড়েছে। অত বিষাক্ত সাপ মানুষকে কামড়াবার পর জোরে পালাতে পারে না।

এর পরের অবস্থাটা আরও মর্মান্তিক।

জহরকাকা নিজস্ব গাড়ি রাখেননি। একটা ভ্যান আছে, যাতে বাহারে ফুলটুল নিয়ে যাওয়া হয়।

ভ্যান চালকের তখন ছুটি, তার বাড়ি পাশের গ্রামে। সেখানে খোঁজ করতে গিয়ে দেখা যায়, সে ওই সময়ে মদ খেয়ে একেবারে বেহুঁশ। তাকে জাগানোই যায়নি।

জহরকাকা নিজে গাড়ি চালাতে জানেন। কিন্তু সাপটা এতখানি বিষ ঢেলেছে যে তিনি অবশ হয়ে ঝিমিয়ে পড়ছিলেন। আর বারবার বলছিলেন, আমাকে হাসপাতালে নিয়ে চল!

শেষ পর্যন্ত রাত আড়াইটের সময় একজন ড্রাইভার জোগাড় করে জহরকাকাকে নিয়ে যাওয়া হয় স্থানীয় হাসপাতালে। এর মধ্যে ভুল বাঁধনটাধন দিয়ে তার অনেক ক্ষতি করে দেওয়া হয়েছে।

তার শেষ নিশ্বাস এখনও পড়েনি, টানাটানি চলছে যম-মানুষে। এ বাগানের মালিটালিরা সবাই ভিড় করে আছে হাসপাতালের সামনে।

আমাদেরও ছুটতে হল সেখানে।

গাড়ি চালাতে চালাতে প্রীতম পাংশু মুখে আপন মনে বলতে লাগল, ইস্, জহরকাকা এখানকার সাপ-টাপের কথা কিছুই বোঝেননি। যদি না বাঁচেন, তা হলে এই এত বড় বাগান, এই ব্যবসা, এসবের কী হবে। এত শখ করে এসব করেছিলেন।

জুন জিজ্ঞেস করল, ওঁর আর কেউ নেই?

এক মেয়ে আছে শুধু। সেও জার্মানিতে মিউনিখে থাকে। যাই হোক, সেই এসে যা হয় ব্যবস্থা করবে। সে আবার সাহেব বিয়ে করেছে, এ দেশের সঙ্গে কোনও সম্পর্কই নেই।

আমি মনে মনে ভাবলুম, কাল রাতেই প্রীতমের সঙ্গে আমার এখানে আসার কথা হয়েছিল। দশটার মধ্যে এসে পৌঁছলে আমাদের সঙ্গেই কথাবার্তা হত, জহরকাকাকে

www.amarboi.com

গোলাপবাগানে গিয়ে সাপের কামড় খেতে হত না।

সে বেচারি সাপটাকেও মরতে হত না। বিনা কারণে সাপ কখনও মানুষকে কামড়ায় না, এ কথা সবাই জানে।

সুতরাং প্রীতমই এই ঘটনার জন্য খানিকটা দায়ী বলা যায়। এমনকী জুনেরও খানিকটা দায়িত্ব আছে। জুনকে সঙ্গে আনবে বলেই তো প্রীতম কাল রাতে আসতে রাজি হয়নি!

অবশ্য এসব কথা মুখে বলা যায় না। প্রীতম ও জুনের প্রত্যক্ষ কোনও দোষ নেই। এগুলিকে বলা যায়, কার্য-কারণ। কিংবা, সহজ বাংলায় নিয়তি!

যে-কোনও অবস্থাতেই মানুষ নিজের কথাই বেশি ভাবে। যেমন ডেল কার্নেগি বলেছিলেন, যে-কোনও গ্রুপ ফটোগ্রাফে মানুষ নিজের মুখটাই খোঁজে সবচেয়ে আগে।

সুতরাং, এ সময় আমার মনে হতেই পারে, যাঃ, আমার চাকরিটা আর হল না!

এরকম মনে হওয়াটা কি দোষের?

লোকে বলে, নীললোহিত চাকরি করতে চায় না। চাকরিরাও যে নীললোহিতকে চায় না, তা কেউ বোঝে না। পৃথিবীর সমস্ত চাকরিই নীললোহিতের নামটা শুনলেই বলে, না, না, ওকে চাই না! ওকে চাই না!

আসলে পৃথিবীতে নাই কোনও বিশুদ্ধ চাকুরি!

এখন আমি মুক্তধারা নাটকের ধনঞ্জয় বৈরাগীর মতন অনায়াসে গেয়ে উঠতে পারি, 'আমাকে বাঁধবি তোরা, সেই বাঁধন কি তোদের আছে?'

হাসপাতালের সামনে দাঁড়িয়ে আর একটা কথাও আমার মনে এল। সেটা কিছুটা স্বার্থপরতা।

যাক, সাপের কামড়ে অন্তত আমার মরণ নেই। এক ব্যাপার দু'বার ঘটে না। মালিক ও কর্মচারী দু'জনকেই সাপে কামড়েছে, বিশ্বে কখনও ঘটেনি এরকম। নো রেকর্ড।

আমি এখানকার কর্মচারী হইনি। কিন্তু হতে তো পারতুম। অন্তত মনে মনে তো হয়েই গিয়েছিলুম, মনে হওয়াটাই তো আসল!

॥ ৫ ॥

পর পর দুটো সাইকেল রিকশা যেতে রাজি হল না। আজ কি কোনও পরব আছে নাকি?

বৃষ্টির তেজ নেই, বিরামও নেই। আকাশের মেজাজ খারাপ, আজকাল যাকে বলে ডিপ্রেশান।

আমি খানিকটা হেঁটেও দাঁড়িয়ে পড়লুম একটা গাড়ি বারান্দার নীচে। একা একা বৃষ্টিতে ভিজতে কারও ভাল লাগে না। সঙ্গে আর কেউ থাকলে অন্য কথা।

আমার এখন কিছুদিনের জন্য ডায়মন্ডহারবার আসার কোনও সম্ভাবনাই ছিল না।

www.amarboi.com

বরং ভুলে থাকব ভেবেছিলুম। একটা চাকরির মরীচিকা আমাকে এখানে নিয়ে এল।

প্রীতমের জহরকাকা কোমার মধ্যে আছেন। চিকিৎসায় দেরি হয়েছে বলে এখানকার ডাক্তাররা তাঁর জীবনের আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছেন। যদি কলকাতার বড় কোনও নার্সিংহোমে শেষ চেষ্টা করা যায়, তাই প্রীতম ওঁকে নিয়ে রওনা হয়ে গেল।

আমি আর গিয়ে কী করব, আমি তো কোনও কাজেই লাগব না। এত দূর এসে দুলুর সঙ্গে একবার দেখা না করে যাওয়ার কোনও মানে হয় না।

একটা সাইকেল রিকশা এসে থামল বারান্দার কাছে।

একটি মাঝ বয়েসি মহিলা ভাড়া মিটিয়ে দিয়েই দৌড় দিলেন ভেতরের দিকে।

রিকশা চালক একটা বিড়ি ধরাল আমার পাশে এসে।

এর বিড়ি শেষ না হওয়া পর্যন্ত ভাড়ার কথা জিজ্ঞেস করাই চলবে না। খেঁকিয়ে উঠতে পারে।

লোকটি নিজেই হঠাৎ বলল, আপনি ছোট পোস্টমাস্টারবাবুর বন্ধু না? গত মাসে আমার রিকশায় চেপেছিলেন।

সাইকেল রিকশায় প্রত্যেকদিন কত রকম মানুষ চাপে। আমাকে এর মনে রাখবার কী কারণ থাকতে পারে? আমার তো একে মনে নেই।

লোকটি আবার জিজ্ঞেস করল, যাবেন কোথায়?

পায়রাডাঙাতেই আমার বন্ধুর বাড়িতে যাব ভাবছি।

আমি আজ আর ভাড়া খাটব না। যথেষ্ট হয়েছে। নিন, উঠুন।

উঠব? আপনি যে বললেন আর ভাড়া খাটবেন না?

ঠিকই তো বলেছি। পোস্টাফিসের পাশেই আমার বাড়ি। এখন আমি বাড়ি ফিরছি। খালি রিকশা যাওয়া আর একজন লোককে নিয়ে যাওয়া একই কথা। ঠিক কি না বলুন? আপনি শুধুমুধু এখানে দাঁড়িয়ে থাকবেন কেন? উঠুন?

একেই বলে কার্য-কারণ। আমি যদি এই বারান্দাটার বদলে অন্য কোনও বারান্দায় দাঁড়াতুম, তা হলে এই রিকশা চালকের সঙ্গে আমার দেখাই হত না। এইসব ব্যাপারে আমার বেশ মজা লাগে।

লোকটিকে বললুম, বৃষ্টিটা একটু কমুক, তারপর যাবেন। আপনাকে ভিজতে হবে যে।

আমরা তো অনবরত ভিজছি। ও আমাদের অভ্যেস আছে। ব্যাঙের কি সর্দি হয়? আমার খিদে লেগে গেছে, তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে দু'টি খাব।

একটা ছাতা রাখেন না কেন? তা হলে ভিজতে হয় না।

ছাতা মাথায় দিয়ে রিকশা চালানো? জুতো পায়ে ধান রোওয়া যায়? মাথায় ছাতা থাকলে বাতাসে পিছন দিকে ঠেলবে। ছোট মাস্টারবাবুর তো এর মধ্যে জ্বর হয়েছিল, খবর পেয়েছেন?

না তো।

খুব জ্বর গেল ক'দিন। ওর পিওনটাও ছুটি নিয়ে দেশে গেল। আর আসেনি। ভদ্দরলোক একা একা থাকেন, নিজের হাত পুড়িয়ে রান্না করে খাচ্ছেন। আমার বউই

www.amarboi.com

তো ও-বাড়িতে গিয়ে বাসনপত্র মেজে দেয়।

তবে তো আমি ঠিক সময়েই এসেছি।

বাবু, আপনি কী কাজ করেন?

এইসব ক্ষেত্রে একটা মিথ্যে পরিচয় খুব কাজে লাগে। অধিকাংশ লোকের ধারণা, খবরের কাগজে যারা কাজ করে, তাদের কোনও নির্দিষ্ট সময়ে অফিস যেতে হয় না। সব সময় ঘুরে বেড়ায়।

এই লোকটি সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করে, আমি কোনও কাজ করি না, এ কথা বলাটা শ্রমের প্রতি অপমান। সুতরাং বলতেই হল, আমি খবরের কাগজে কাজ করি।

সঙ্গে সঙ্গে সে বলল, ও, রিপোর্টার?

আজকাল অনেকেই এইসব ইংরিজি শব্দ জানে। গ্রামের লোকও আজকাল রোজ কিংবা প্রতিদিনের বদলে বলে ডেইলি।

আপনি রিপোর্টার, আমাদের এই পায়রাডাঙার রাস্তাটা তো দেখছেন, বর্ষাকালে কী অবস্থা! আপনাদের কাগজে একটু ভাল করে লিখে দিন না।

এটাও এখন অনেকের বিশ্বাস যে খবরের কাগজে লিখে দিলে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

রাস্তাটা এর মধ্যে বেশ খারাপ হয়ে গেছে। অনবরত লাফাচ্ছে রিকশাটা।

আমার ধারণা ছিল, এ রাস্তায় গাড়ি ঢোকে না। কিন্তু এখন দেখছি, একটা জিপ ঢুকেছে। কালভার্টের কাছে একটা গর্তে চাকা পড়ে কাত হয়ে গেছে জিপটা।

আমাদের রিকশাটা কোনওক্রমে বেরিয়ে এল পাশ দিয়ে। জিপের ভেতরে কারা বসে আছে। ঠিক দেখা গেল না।

দুলুর বাড়ির সামনে রিকশা থামিয়ে লোকটি গামছা দিয়ে কপাল মুছতে লাগল। এই বৃষ্টির মধ্যেও ঘেমে গেছে।

রিকশা ভাড়া হওয়া উচিত দশ টাকা। দরাদরি করলে আট। বৃষ্টির দিনে আরও বেশি হওয়াও অন্যায্য নয়।

আমি দশ টাকার একটা নোট বার করতেই সে বলল, আপনার ভাড়া লাগবে না।

সে কী, ভাড়া দেব না কেন?

মা কালীর দিব্যি বলছি, আর কোনও সওয়ারি না নিয়ে আমি একাই ফিরব ঠিক করেছিলাম। আপনি এখানেই আসছেন, তাই আপনাকে তুলে নিলাম গে। আপনি তো নিজে থেকে কিছু বলেননি! আপনি আমাদের গেস্ট।

গেস্ট? কোন ক্লাস পর্যন্ত পড়েছেন?

ক্লাস এইট।

আর পড়লেন না কেন?

আর কারও দোষ নয়, আমারই দোষ। আমার বাপ অনেক করে বলেছিল, কিন্তু তখন আমার পেট গরম হয়ে গেসল যে!

পেট গরমের মানে ঠিক বুঝলুম না। যাই হোক, ওকে বললুম, আপনি আপনার দিকটা বলেছেন। আমার কথা এই যে, আমি বিনা ভাড়ায় রিকশা চাপি না।

www.amarboi.com

ঠিক আছে, পাঁচটা টাকা দিন। দু'জন সওয়ারিও তো হতে পারত। আমার নাম বিশ্ববন্ধু দাস। দরকার হলেই আমায় খবর দেবেন।

যদি "বাংলার জনসাধারণ" নামে কেউ কোনও প্রবন্ধ লেখে, তা হলে এই বিশ্ববন্ধু দাসের কথাও অবশ্যই লিখতে হবে।

দুলু দিনের বেলাতেই গায়ে একটা চাদর টেনে শুয়ে আছে।

আমি ঘরে ঢুকলেও ও টের পায়নি, একেবারে শিয়রের কাছে এসে ওর কপালে হাত দিয়ে জিজ্ঞেস করলুম, কীরে, এখনও জ্বর আছে?

ধড়মড় করে উঠে বসে দুলু বলল, নীলু? হঠাৎ এই সময়ে এলি? কী করে জানলি যে আমার জ্বর হয়েছে?

এক ভুরু তুলে হেসে বললুম, একখণ্ড মেঘ উড়তে উড়তে গিয়ে খবর দিল। তাই আর থাকতে পারলুম না। তোর তো রান্নার লোকটাও চলে গেছে, আমি তোকে খিচুড়ি রান্না করে খাওয়াব। বাজারটাজার কিছু করা আছে?

আমার জ্বর কালকেই ছেড়ে গেছে। আমি নিজেই খিচুড়ি রান্না করতে পারি। ক'দিন ধরে তো শুধু খিচুড়িই খাচ্ছি। এ জন্য তোর আসার দরকার ছিল না।

সে কীরে, বন্ধুর বিপদের কথা শুনে বন্ধু ছুটে আসে। তুই খুশি হোসনি?

প্রথম কথা, আমার এমন কিছু বিপদ হয়নি। এ অঞ্চলে সকলেরই মাঝে মাঝে জ্বর হয়। দ্বিতীয় কথা, খুশি নিশ্চয়ই হব, যদি তুই রান্নার চেষ্টা না করিস! সেই যে তুই লটকা না ঝটকা কী মাছ রান্না করে খাইয়েছিলি, ভাবলেই এখনও বমি উঠে আসে। বাপ রে!

ও মাছের টেস্ট অ্যাকোয়ার করতে হয়। প্রথমবার কিছু বোঝা যায় না।

দুলু গলা চড়িয়ে ডাকল, পেনু। এই পেনু!

তিনবার ডাকেও সাড়া দিল না কেউ।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, আজ কাজে যাসনি? জ্বর ছেড়ে গেলেও দুপুরে ঘুমোতে নেই।

আজ শনিবার, হাফ ডে না? কাজও নেই ছাই। আমি ঘুমোইনি, শুয়ে শুয়ে আকাশপাতাল চিন্তা করছিলুম। গ্রামে থাকার শখ মিটে গেছে। ভাবছি, এবার কিছুদিন দিল্লিতে গিয়ে থাকব।

দিল্লিতে কী আছে?

গ্রামের সঙ্গে কনট্রাস্টটা দেখা দরকার। দিল্লিতে আমার মামার একটা জুতোর দোকান আছে। সেখানে কাজ পেয়ে যাব কিছু একটা।

একটা বাচ্চা ছেলে দরজার কাছে এসে উঁকি মারল।

দশ-এগারো বছর বয়েস, কুচকুচে কালো আর তেল চকচকে মুখ। ঠিক যেন কেষ্টঠাকুরটি।

সে বলল, আমায় ডাকলেন সাঁর?

দুলু বলল, আবার সাঁর বলছিস? বলেছি না, দাদা বলবি?

আমায় ডাকলেন দাদা?

হ্যাঁ, ডেকেছি। তুই যে শুনতে পেয়েছিস, তাতেই ধন্য। দু' কাপ চায়ের মতন জল

www.amarboi.com

গরম কর। আমি চা বানিয়ে নেব।

আচ্ছা সাঁর।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, এ ছেলেটি আবার কোত্থেকে এল?

ওর নাম পেনু। ক'দিন হল আমার এখানে কাজ করছে।

এইটুকু ছেলে, একে দিয়ে কাজ করাচ্ছিস? ওর তো ইস্কুলে যাওয়া উচিত।

শিশু শ্রমিক! বাড়িতে রাখা অন্যায়, তাই না? ওর বাবা জোর করে আমার এখানে রেখে গেছে। বাড়িতে দু'বেলা খেতে পায় না। পেটে খিদে থাকলে ইস্কুলেই বা যাবে কী করে? তা হলে কোনটা অন্যায়? খেতে না পাওয়া, না এই বয়েসে পরের বাড়িতে কাজ করা?

এই বিচারের ভার আমার ওপর নয় ভাই!

আমি তবু ওকে পড়াবার চেষ্টা করি। তাও একেবারেই মন নেই। এই বয়েসেই পেট গরম হয়ে গেছে!

এই পেট গরম মানে কীরে?

এরা মাথা গরমকেই পেট গরম বলে! কাজও তো করে ছাই। সব সময় পুকুরধারে গিয়ে বসে থাকে। তোর সেই কচ্ছপটাকে পাহারা দেয়।

আমার কচ্ছপ?

হাট থেকে তুই একটা কচ্ছপ কিনেছিলি মনে নেই। সেটাকে নিয়ে মহা ঝকমারিতে পড়া গেছে।

সেটা আবার কী করল? কারওকে কামড়ে দিয়েছে?

ধ্যাত, অতটুকু কচ্ছপ, কামড়াবার ক্ষমতাই নেই। কিন্তু অতি চঞ্চল। কচ্ছপের তো জলেই থাকার কথা। কিন্তু মাঝে মাঝেই দেখা যায়, পাড়ে উঠে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাঠের মধ্যেও চলে যায়। মাঠের মধ্যে দেখতে পেলে তো অন্য কেউ ধরে নিয়ে যাবেই। এর মধ্যে দু'জন লোক ধরে নিয়েও ফেরত দিয়ে গেছে। সবাই কি আর ফেরত দেবে? দু'-একটা ছেলে চুরি করবার জন্য ঘুরঘুর করছে। ওই ছেলেরা পেলেই ওটাকে কেটেকুটে খেয়ে ফেলবে।

ওকে বাড়ির মধ্যে রাখা যায় না?

তাও চেষ্টা করেছি। কখন এক ফাঁকে সুট করে বেরিয়ে গিয়ে জলে নেমে পড়ে। জলে ছেড়ে দিলে ডাঙায় উঠে ঘুরে বেড়ায়। আর ডাঙায় রাখলে জলে নামে। এ এক বিচিত্র জীব। অতি বোকাও বটে। প্রকৃতি ওকে আত্মরক্ষার কোনও বুদ্ধি দেয়নি।

সেই জন্যই তো এনডেঞ্জারড স্পেশি।

নীলু, তুই কচ্ছপটা কলকাতায় নিয়ে যা। তোর বাড়ির ছাদে রেখে দেখ তো কী হয়!

আমাদের বাড়ির ছাদ নেই। মানে, আছে, কিন্তু তা অন্য লোকের।

তা হলে এটাকে আমরা কতদিন পাহারা দেব? আরে, ছোঁড়াটাকে জল গরম করতে বললুম, এতক্ষণ হয়ে গেল—

সঙ্গে সঙ্গে বাইরে থেকে চিৎকার শোনা গেল, সাঁর, সাঁর, নিয়ে পালাচ্ছে, নিয়ে পালাচ্ছে, দেখবেন আসুন—

www.amarboi.com

আমরা দু'জনেই বেরিয়ে এলুম বাইরে।

দুলুর কোয়ার্টারের পেছন দিকে একটা উঠোন। তার পরেই একটা ছোট পুকুর। ডোবা কিংবা পুকুরও বলা যায়। মাঝখানে কোনও বেড়াটেড়া নেই।

পুকুরটার ওপাশে অনেকখানি মাঠ।

সেই মাঠ দিয়ে ছুটছে একটি হৃষ্টপুষ্ট যুবক, তাকে তাড়া করে যাচ্ছে পেনু।

দুলু গর্জন করে উঠল, অ্যাই! অ্যাই!

সে যুবকটি থামল না। দুলু বলল, নিশ্চয়ই কচ্ছপটাকে নিয়ে পালাচ্ছে।

পেনু এর মধ্যে জাপটে ধরেছে ছেলেটিকে। তার এক হাতে এবার কচ্ছপটাকে স্পষ্ট দেখা গেল।

দু'জনে ঝটাপটি করতে লাগল আর পেনু চ্যাঁচাতে লাগল, সাঁর, সাঁর?

মহাভারতে পড়াছিল গজ-কচ্ছপের লড়াইয়ের কথা। এও যে দেখছি তাই।

মহাভারত না রামায়ণ? কিংবা বেতাল পঞ্চবিংশতিও হতে পারে!

ওইটুকু ছেলে পেনু একটা গাঁট্টা-গোট্টা জোয়ানের সঙ্গে পারবে কেন? একটা বড় ধাক্কায় পেনু পড়ে গেল চিৎপটাং হয়ে, ছেলেটা পালাল দৌড়ে।

আমরা দূর থেকে দেখলুম এই সংক্ষিপ্ত যুদ্ধের দৃশ্য। পেনুকে সাহায্য করার কোনও উপায় ছিল না, আমরা ছুটে যেতে যেতেই সব শেষ হয়ে যেত।

পেনু ফিরে এল ঈষৎ খোঁড়াতে খোঁড়াতে। তার ঠোঁটের এক পাশে লেগে আছে একটুখানি রক্ত।

আমি বললুম, ইস্! তোর দাঁতটাঁত ভেঙে দিয়েছে নাকি রে।

হাত দিয়ে রক্তটা মুছে পেনু বলল, না, আমি ওকে কামড়ে দিয়েছি!

দুর্লভরতন বসু ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলছে। ভুরু দুটো উঠে গেছে অনেকটা কপালের ওপর। এটা তার পৌরুষের লক্ষণ।

সে হুঙ্কার দিয়ে বলল, হারামজাদা, শুয়োরের বাচ্চা, ওটা কোন বাড়ির ছেলেরে পেনু?

বসাক বাগানের সাঁর!

আবার সাঁর বলছিস?

দাদা, দাদা, ওটা বসাকবাগানের দারোয়ানের ছেলে।

ওর এত বড় সাহস! দিনের বেলা আমাদের চোখের সামনে দিয়ে চুরি করল। আবার তোকে মারল? মগের মুলুক পেয়েছে! চল, আমার সঙ্গে চল। নীলু, তুই এখানে বোস, আমরা ঘুরে আসছি।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, বসাকবাগানটা কত দূরে?

দুলু বলল, ওটা বাগান নয়, বাগানবাড়ি। তোর সেই ভূতের বাড়িটা রে!

আমার ভূতের বাড়ি মানে?

যে বাড়িতে তুই একটা পেত্নী দেখেছিলি!

পেত্নী?

ন্যাকা সাজছিস কেন? যে-বাড়িতে একতলায় দুটো দারোয়ান ছাড়া আর কেউ থাকে

www.amarboi.com

না, সেখানে তুই তিনতলায় এক সুন্দরী মহিলাকে দেখেছিলি! সে পেত্নী ছাড়া আর কী হবে? লোকে ওই বাড়িটাকে এখনও বলে বসাকবাগান, যদিও বসাকরা অনেকদিন আগেই নাকি বাড়িটা বিক্রি করে দিয়েছে।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললুম, তোরা ওখানে যাবি, আর আমি এখানে বসে থাকব? কেন, আমি যেতে পারি না?

দুলু বলল, যেতে চাস? চল। ব্যাটারা কচ্ছপটাকে কেটেকুটে খেয়ে ফেলার আগেই সেটাকে বাঁচাতে হবে। আর ও ছেলেটা পেনুকে মেরেছে, তারও শাস্তি দিতে হবে!

পেনু বলল, সাঁর, দারোয়ানের বন্দুক আছে।

দুলু বলল, আবার? আবার সাঁর বলছিস? এবার তোকেই একটা থাবড়া মারব। বন্দুক আছে তো কী হয়েছে, আমরা বন্দুকে ভয় পাই?

শেষের কথাটা দুলু এমন বীর দর্পে বলল, যেন ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিপ্লবীদের ঘোষণা!

আমি বন্দুক-টন্দুক তেমন পছন্দ করি না, তবু ওই বাড়িটার ভেতরটা দেখার অদম্য কৌতূহলে সে কথা মনে পড়ল না।

পায়ে হেঁটে যেতে দেরি হয়ে যাবে। তার মধ্যেই যদি কচ্ছপটার পেটে ছুরি বসিয়ে দেয়?

আগেকার পিওন সাইকেলটা রেখে গেছে, দু'জনে বেরিয়ে পড়লুম তক্ষুনি। দুলু তার সাইকেলে বসিয়ে নিল পেনুকে।

বসাকবাগানের বাইরে লোহার পাতের গেট বন্ধ। ভেতরটা কিছুই দেখা যায় না। তবে, মনে হল, কে যেন যন্ত্রণায় চিৎকার করছে।

দুলু গিয়ে বীরদর্পে লোহার পাতটায় জোরে জোরে ধাক্কা মারল।

সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল গেট। এক সাদা গোঁফওয়ালা বুড়ো দারোয়ান তাকিয়ে রইল আমাদের দিকে।

দুলু বলল, হামলোগোকো কচ্ছপ কাঁহা হ্যায়?

কচ্ছপের হিন্দি কচ্ছপই কি না সে বিষয়ে আমি চিন্তা করছিলুম, সেই দারোয়ানটি পরিষ্কার বাংলা বলল, আসুন, আসুন, দেখুন না কী কাণ্ড!

কে বলল, বাচ্চা কচ্ছপ কামড়াতে পারে না?

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, কণ্টক যতই ক্ষুদ্র হউক, তাহারও বিদ্ধ করিবার ক্ষমতা আছে।

এ ক্ষুদ্র কচ্ছপও দারোয়ানের ছেলের বুড়ো আঙুল কামড়ে ধরেছে!

ছেলেবেলায় শুনেছিলুম, কচ্ছপ একবার কামড়ালে মেঘ না ডাকলে ছাড়ে না। বৃষ্টি থেমে গেছে কিছুক্ষণ আগে। আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে হঠাৎ।

এখন নতুন মেঘ পাব কোথায়? সেই মেঘকে আবার ডাকাতে হবে?

ছেলেবেলায় শোনা অনেক কথাই এখন একদম বাজে বলে বুঝতে পারি। যেমন, মাসি-পিসিদের কাছে শুনেছি, সাপকে দুধ-কলা খাইয়ে পুষতে হয়। এখন বইতে পড়ি, সাপ মোটেই কলা খায় না, আর দুধ খাবার ক্ষমতাই ওদের নেই!

সদা সত্য কথা বলিবে ব্যাপারটাও একই রকম আজগুবি!

www.amarboi.com

পেনু কচ্ছপটার পিঠে হাত বুলিয়ে কেছুয়া, কেছুয়া, আঃ, আঃ বলতেই সেটা দারোয়ানের ছেলের আঙুল ছেড়ে পেনুর হাতে চলে এল!

বৃদ্ধ দারোয়ান আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল, জয় মা সীতা!

এর মধ্যে সীতার ভূমিকাটা কী তা ঠিক বোঝা গেল না। তবে, দারোয়ান বোধহয় ধরেই নিয়েছিল, ওর ছেলের বুড়ো আঙুলটা গেল!

ছেলেটির যথেষ্ট শাস্তি হয়েছে। একে তো কচ্ছপে কামড়ে দিয়েছে ওর বুড়ো আঙুল, তার আগে পেনু কামড়ে দিয়েছে ওর কনুই! কোনটায় বেশি লেগেছে কে জানে!

বন্দুক আশেপাশে নেই, একটা খাটিয়া দেখিয়ে দারোয়ান বলল, বসুন বাবু, বসুন, একটু চা খাবেন?

আমরা মুখের চা ফেলে এসেছি, সুতরাং চায়ে আপত্তি থাকার কথা নয়। দুলুর নিশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে এসেছে।

সে খাটিয়ায় বসে পড়ে বলল, পেনু, তুই যা, ওটাকে বাড়ি নিয়ে যা। এখন ঘরের মধ্যে দরজা বন্ধ করে রাখ।

পেনু বলল, আচ্ছা সাঁর!

একটা কেরোসিন স্টোভে দুধ ফুটছে। দেখলেই বোঝা যায়, ফুটছে অনেকক্ষণ ধরে, গন্ধ আসছে ক্ষীর ক্ষীর ধরনের, দারোয়ান তার মধ্যে কিছু চায়ের পাতা ফেলে দিল।

এদের চায়ের সঙ্গে জলের সম্পর্ক নেই। মাঝে মাঝে এরকম চা খেতেও মন্দ লাগে না।

দুলু বলল, নীলু, তোর কাছে সিগারেট আছে? দে, একটা খাই!

দুলু সিগারেট ছেড়ে দিয়েছে অনেকদিন। এখন প্যাসিভ স্মোকিং-এ তার ঘোর আপত্তি। হঠাৎ এখন তার এই দুর্মতি হল কেন?

খুব সম্ভবত সে ধরেই নিয়েছিল, এখানে এসে দারোয়ান ও তার ছেলের সঙ্গে বিরাট একটা ঝগড়া আর প্রয়োজনে মারামারিও করতে হবে। সেসব কিছুই হল না বলে সে প্রাণপণে আবেগ দমন করার চেষ্টা করছে।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, দারোয়ানজি, আপনার এ-বাড়িতে আর কেউ থাকে?

সরল সত্যবাদীর মতন মুখ করে সে বলল, না বাবু, কেউ থাকে না। মালিকরাও অনেকদিন আসে না।

এর মধ্যে। মানে মাসখানেকের মধ্যে কেউ আসেনি?

না বাবু!

সিগারেটে একটা টান দিয়ে দুলু বলল, যে বাড়িতে মালিকরা অনেকদিন আসে না সে বাড়ির দারোয়ানরা অন্য লোককে দু-একদিনের জন্য ভাড়া দেয়। তুমি সে রকম ভাড়া দিয়েছিলে? আমাদের কাছে বলতে লজ্জা কী? আমরা মালিকদের কিছু জানাব না। বরং দরকার হলে আমরা আমাদের চেনা লোকের জন্য দু-একদিন ভাড়া নিতে পারি।

না বাবু, আমি ওসব কাম করি না। সীতা মায়ের দিব্যি!

কিন্তু আমার এই বন্ধু যে ক'দিন আগে ওপরতলায় একজন মেয়েমানুষকে দেখতে পেয়েছে?

www.amarboi.com

দারোয়ান চুপ। তার মুখখানাও যেন চুপসে গেছে।

আমার বন্ধু তো ভুল দেখেনি।

দারোয়ান এবারও চুপ করে নোখ খুঁটতে লাগল।

শোনো দারোয়ান, এ বাড়িতে কি ভূত আছে?

এবারে দারোয়ানটি চাঙ্গা হয়ে মুখ তুলে বলল, হাঁ বাবু, আছে।

তুমি নিজে দেখেছ?

অনেকবার।

কী রকম ভূত দেখেছ?

আমি একটা বাচ্চা ছেলেকেই শুধু দেখেছি। মনে হয়, উপরে আরও আছে। এই ছেলেটা, আপনাদের ওই পেনুর মতন, দশ-এগারো, খুব হারামি, সেটা তিনতলা থেকে একতলায় লাফ মারে, আমাদের রান্নার হাঁড়ি উল্টে দেয়।

তুমি ভয় পাও?

কী বলছেন বাবু, ভূত দেখলে ভয় লাগবে না? তবে কি টিকটিকি দেখে ভয় পাব?

তুমি তো বললে, এটা বাচ্চা ভূত। তাকে ভয় পাবে কেন? সে আর কী করবে?

ভূতদের মধ্যে সবচেয়ে ঢেঁটিয়া এই বাচ্চা ভূতগুলো। এ শালাদের বাপ-মায়ের ঠিক নেই। ওরা ঘুমের মধ্যে এসে কাঁধ কামড়ে দেয়।

ভয় পেলে কী করো? ভূতটাকে তাড়াও কী করে!

একটা গান গাই। সেই গানটা শুনলেই শালা হারামি হাওয়া হয়ে যায়।

কী গান, একবার গাও তো শুনি!

বৃদ্ধ দারোয়ান এবার উঠে দাঁড়াল, তারপর গান শুরুর আগে খুব জোরে গলাখাঁকারি দিল।

আমি ধরেই নিয়েছিলাম, ও গাইবে, 'ভূত আমার পুত, পেতনী আমার ঝি, রাম-লক্ষ্মণ বুকে আছে' ইত্যাদি।

তা তো নয়। সে গাইল, জয় সীতা মাইয়া, জয় সীতা মাইয়া? সীতা মায়ের দুই বেটা, তোরে করবে ঝাঁটা পেটা।

এ যে প্রায় সুকুমার রায়ের অক্ষম অনুকরণ। লোকটা লেখাপড়া জানে বোধহয়। রামকে গ্রাহ্য করে না, সীতারই শুধু ভক্ত। শুধু গান গাওয়া নয়, তার সঙ্গে নেচেও দেখাল দু' হাত তুলে।

তার সেই কাণ্ড সাঙ্গ হলে আমি তার কাঁধে চাপড় মেরে বললুম, বাঃ, বাঃ, খুব ভাল। তোমার নাম কী দারোয়ানজি?

সে বলল, লক্ষ্মণ ত্রিপাঠী।

অর্থাৎ লছমন তেওয়ারি, এখন বাঙালি বনে গেছে।

এর নামটা জানতে চাইলুম এই কারণে যে, ভবিষ্যতে যদি কেউ বাংলার জনসাধারণ বিষয়ে প্রবন্ধ লেখে, তা হলে, এই লক্ষ্মণ ত্রিপাঠীর কথা অবশ্যই উল্লেখ করা দরকার। কেন না, এমন তাৎক্ষণিক মিথ্যে সঙ্গীত রচনার জন্য বিশেষ প্রতিভা লাগে।

আমার এই পর্যবেক্ষণ যে সত্য তা প্রমাণিত হল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই।

www.amarboi.com

গেটের বাইরে একটা গাড়ি থামার শব্দ হল, তারপর দু'বার হর্ন।

দারোয়ানটি আমাদের দিকে একবার ভয়ার্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ছুটে গেল গেট খুলে দিতে।

এটা সেই জিপ গাড়ি, যেটা কালভার্টের পাশে কাত হয়ে পড়েছিল। এতক্ষণে উদ্ধার পেয়েছে?

সেই জিপ থেকে নেমে এলেন এক মহিলা। আর কে, রুমা বউদি!

উনি একঝলক দেখলেন আমাদের, গ্রাহ্য করলেন না। গট গট করে চলে গেলেন দোতলার সিঁড়ির দিকে।

তা হলে রুমা বউদি বেশ ঘনঘনই আসেন ডায়মন্ডহারবারের দিকে বোঝা যাচ্ছে। অথচ, দেবেনদা বলেছিলেন, তিনি এদিকে অনেক দিন আসেননি।

দুলু আমার দিকে চোখে প্রশ্ন ঝুলিয়ে একটা গাঢ় দৃষ্টিপাত করল।

আমি ঈষৎ মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মতি জানালুম। অর্থাৎ ইনিই তিনি, দুলু যাকে পেত্নী মনে করেছিল।

এরকম পরিস্থিতিতে আমাদের আরও বসে থাকা বোকা বোকা লাগে। কিন্তু আমাদের চা যে শেষ হয়নি। বড্ড গরম চা, ফোটালে যা হয়।

রুমা বউদি আমাকে চিনতে পারার কোনও ইঙ্গিতও দিলেন না। অথচ, আমাদের ছোট পৃথিবী নামের ক্লাবে এই তো গত রবীন্দ্রজয়ন্তীতেই রুমা বউদি আর আমি দু'জনে মিলে কর্ণ-কুন্তী সংবাদ আবৃত্তি করেছি!

বাস্তব জীবনেও, কুন্তীর মতনই রুমা বউদির একটা গোপন ভুবন আছে? কী সর্বনাশ! সেটা জেনে ফেলা তো আমার একদমই উচিত হয়নি।

আমি কি ইচ্ছে করে জেনেছি?

এখন এই দৃশ্য থেকে একেবারে মুছে যাওয়া, অর্থাৎ পালিয়ে যাওয়াই আমার পক্ষে একমাত্র উচিত কার্য।

উঠে দাঁড়িয়ে দুলুকে বললুম, চল, আমরা বাড়ি যাই!

দুলু একটু হকচকিয়ে গেছে। বারবার তাকাচ্ছে বাড়িটার ওপরের দিকে।

এ বাড়ির দোতলাতে একটা বারান্দা আছে। সেখানে এসে দাঁড়ালেন রুমা বউদি। নীরস গলায় বললেন, নীলু, শোনো। ওপরে উঠে এসো। তুমি একাই এসো!

আমি ইতস্তত করছি দেখে দুলু বলল, তুই যা। আমি বাড়িতে অপেক্ষা করব তোর জন্য। খিচুড়ি রেঁধে রাখব। ভদ্রমহিলার পায়ের চটি দুটো লক্ষ করিস। দু' পায়ে দু' রকম!

॥ ৬ ॥

সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলে দোতলায় বাঁ পাশে একটা বড় হলঘরের মতন। সেই ঘরের মধ্যে খট খট করে কীসের যেন একটা শব্দ হচ্ছে। আর কিছু দেখা না গেলেও মনে হয় যেন ঘরটা নির্জন নয়।

রুমা বউদি বসে আছেন বারান্দায় একটা কাঠের হাতলওয়ালা চেয়ারে। পরে আছেন

www.amarboi.com

একটা ধূপের ধোঁয়া রঙের টাঙ্গাইল শাড়ি। এই রে, আবার বুঝি ভুল করলুম, টাঙ্গাইল না শান্তিপুরী, না ধনেখালি। তা কি আমি জানি? বলতে গেলে একটা নাম মুখে এসে যায়।

রুমা বউদির মুখখানা গম্ভীর। ভুরু দুটো ঈষৎ কুঁচকোনো, ভাবখানা মহিলা-বিচারপতির মতন। ওঁর এমন রাগ রাগ ভাব আগে কখনও দেখিনি। প্রীতম থাকলে বলত, হেভি রেগে আছেন!

আর একটা চেয়ার আছে, কিন্তু রুমা বউদি আমায় বসতে বললেন না। সরাসরি ঝাল ঝাল গলায় জিজ্ঞেস করলেন, নীলু, তুমি আমাকে ফলো করছ কেন বলো তো?

আমি খাঁটি অবাক হয়ে বললুম, আপনাকে আমি ফলো করছি? সে কী!

আমি যখনই এখানে আসি, তুমিও আসো না?

ব্যাপারটাকে উল্টো করেও বলা যায় রুমা বউদি! আমি পায়রাডাঙায় এসেই আপনাকে দেখতে পাই।

বাজে কথা বলো না। আজ দুপুরে একটা সাইকেল রিকশায় আমাদের জিপটাকে ফলো করছিলে না?

রাগলে মানুষের কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। সাইকেল রিকশায় কখনও জিপ গাড়িকে ফলো করা যায়?

হেসে বললুম, না, রুমা বউদি। আমি আপনাকে দেখতেই পাইনি!

রুমা বউদি হাসির ধার ধারলেন না। আরও রেগে বললেন, মিথ্যে কথা। তুমি এই দুপুরবেলা এই গ্রামে এলে কেন? এটা কি বেড়াবার জায়গা?

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলুম।

শুরু করতে হয় জার্মানি থেকে। সেখানকার এক সার্থক বাঙালি স্ত্রী-পুত্র হারিয়ে এক বুক শোক নিয়ে ফিরে এসেছিলেন দেশে। একটা মস্ত ফুলবাগান সমেত বাড়ি কিনেছিলেন। ফুলের মধ্যে সর্বক্ষণ থেকে সান্ত্বনা খুঁজতে চেয়েছিলেন। ফুলের ব্যবসাও করবেন ঠিক করেছিলেন, যাতে স্থানীয় কয়েকজনের জীবিকার সংস্থান হয়। তাদের মধ্যে আমিও একজন। সেই বাগানের কেয়ারটেকারের চাকরি নেবার উদ্দেশ্যেই আজ আমার ডায়মন্ডহারবারে আগমন। একটা মাত্র বোকা সাপের অকারণ কামড়ে সব ওলটপালট হয়ে গেল। প্রীতমের জহরকাকার সাজানো বাগান শুকিয়ে যাবে। আমারও চাকরি হল না।

এত সব কি রুমা বউদি বিশ্বাস করবেন?

তাই মৃদু স্বরে বললুম, এ গ্রামে আমার এক বন্ধু আছে, তাই মাঝে মাঝে আসি। বন্ধুটির জ্বর হয়েছে—

এখানে তোমার বন্ধু আছে! তা হলে এ-বাড়ির মধ্যে ঢুকেছিলে কেন? এটা ট্রেস পাসিং। কী তোমার মতলব!

এই রে, যদি বলি, একটা কচ্ছপের খোঁজে এসেছি, সেটা হাস্যকর শোনাবে না? রুমা বউদি নিশ্চয়ই ভাববেন, আমি ওঁর সঙ্গে ইয়ার্কি করছি। অনেক সময়ই সত্যি কথাটাই পুরো মিথ্যের মতন শোনায়!

চট করে উত্তর খুঁজে পাচ্ছি না। সেই নীরবতার সুযোগে রুমা বউদি চিবিয়ে চিবিয়ে

www.amarboi.com

বললেন, নীলু, অন্তত একটা সত্যি কথা বলবে? তুমি কী করো? আমাদের ক্লাবের ছেলেরা প্রত্যেকেই কিছু না-কিছু কাজ করে। তোমার সম্বন্ধেই কিছু জানি না। তুমি এগজ্যাক্‌টলি কীসের সঙ্গে যুক্ত?

এবারেও আমার উত্তর দিতে দেরি হল।

রুমা বউদি বললেন, তুমি বলবে তো যে বেকার! যারা ইচ্ছে করে বেকার সেজে থাকে, তারা অনেকেই আসলে পুলিশের স্পাই। আমি যদি বলি, তুমিও একজন ইনফরমার, তাই আমার পিছনে পিছনে ঘুরছ?

জীবনে এর আগে অনেক রকম গালাগাল ও বিশেষণ শুনেছি। পুলিশের স্পাইটা এই প্রথম! স্পাই হতে গেলে বুঝি কোনও যোগ্যতা লাগে না?

এবারে অন্য চেয়ারটায় বসে পড়ে বললুম, এ সব কী বলছেন রুমা বউদি?

আমি সত্যি সত্যি যদি পুলিশের স্পাই হই, তা হলে আপনিও কি কোনও ক্রাইমের সঙ্গে যুক্ত? নইলে একজন স্পাই আপনাকে ফলো করবে কেন?

রুমা বউদি বললেন, হ্যাঁ, যুক্তই তো! আর তুমি যখন তা জেনে ফেলেছ, তখন তোমায় শাস্তি পেতেই হবে!

বিস্ময়ের পর বিস্ময়! রুমা বউদি নিজের মুখে বলছেন, উনি অপরাধ জগতের সঙ্গে যুক্ত!

কর্ণ-কুন্তী সংবাদে উনি আমার মা সেজে শেষের দিকে একেবারে কেঁদে ভাসিয়েছিলেন, আজ দেখছি একেবারে রণরঙ্গিণী মূর্তি।

পাশের ঘরটায় এখনও কীসের যেন শব্দ হচ্ছে।

রুমা বউদির দু'পায়ের চটির রং সত্যিই দু'রকম। মেয়েদের এরকম ভুল হয়?

জুতো সম্পর্কে অনেক মেয়েরই দুর্বলতা থাকে। প্রত্যেক রঙের শাড়ির জন্য ম্যাচ করা জুতো বা চটি চাই। ফিলিপিন্‌সের এক প্রেসিডেন্টের বউয়ের দু' হাজার জোড়া জুতো ছিল না?

ধ্যাত, এসব কী ভাবছি। এখন কি জুতো নিয়ে মাথা ঘামাবার সময়? গুরুতর ব্যাপার!

উদ্বিগ্ন মুখ করে জিজ্ঞেস করলুম, রুমা বউদি, কী হয়েছে বলুন তো? আপনি এত রেগে আছেন!

রুমা বউদি ডান হাতের তর্জনী তুলে বললেন, আগে বলো, তুমি এই বাড়ির মধ্যে ঢুকেছ কেন?

মুশকিল হচ্ছে কী, পেনু কচ্ছপটা নিয়ে চলে গেছে। প্রমাণ হিসেবেও তো সেটা দেখাতে পারব না।

এই, মানে, ভেতরের বাগানটা একটু দেখব ভেবে।

বাগান দেখবে? গেট সব সময় বন্ধ থাকে। তোমরা জোর করে ঢুকেছ। তোমার সঙ্গে অন্য লোকটা কে ছিল? পুলিশ?

না, না, ও আমার বন্ধু, পোস্ট অফিসে কাজ করে।

এই যে বললে, তোমার বন্ধুর জ্বর হয়েছে? শোনো নীলু, তুমি আমাদের পিছনে লাগলে নিজেও কিন্তু বাঁচবে না। আমাদের দলের লোক তোমায়...

www.amarboi.com

পাশের ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল একটি লোক। ডোরাকাটা পাজামার ওপর স্যান্ডো গেঞ্জি পরা। মুখে খোঁচাখোঁচা দাড়ি থাকলেও বোঝা যায়, শিক্ষিত, সচ্ছল পরিবারের মানুষ। বছর চল্লিশেক বয়েস। হাতে একটা টেনিস বল, সেটা মাটিতে ড্রপ দিচ্ছে।

এ বাড়িতে তা হলে আর একজন মানুষ আছে?

দারোয়ানটা কী গুল মেরেছিল। বাচ্চা ভূত! এই লোকটা ভূত হলেও একে খোকা ভূত বলতে গেলে উদ্দাম কল্পনাশক্তি দরকার। মধ্যবয়স্ক এবং রীতিমতন সুপুরুষই বলতে হবে।

লোকটি বলল, এখন এক কাপ চা পেতে পারি?

রুমা বউদি মুখ ঝামটা দিয়ে বললেন, না, এখন হবে না! বাইরে বেরুবেন না, যান, ভেতরে যান!

গ্রামের মধ্যে পাঁচিল ঘেরা গেটওয়ালা একটা বাড়িতে থাকে এরকম একজন মানুষ। রুমা বউদি তাঁর স্বামীকে কিছু না জানিয়ে এর সঙ্গে দেখা করতে আসেন মাঝে মাঝে।

অবৈধ সম্পর্কের প্রেমিক-প্রেমিকার গোপন মিলন, এরকম হলেই গল্পটা মানায়।

কিন্তু প্রেমিক এক কাপ চা চাইলে তাকে কি কোনও মেয়ে এমন মুখঝামটা দেয়?

দিনের বেলা ডোরাকাটা পাজামা পরে থাকাও কোনও প্রেমিককে মানায় না। দু'পায়ে দু'রঙের চটি, এ আবার কেমন প্রেমিকা?

লোকটি ঘর থেকে এক পা বেরিয়ে আসতেই রুমা বউদি বললেন, বেরবেন না, আপনাকে বাইরে আসতে বারণ করেছি না?

লোকটি বলল, বেশ করব বাইরে আসব। আমিও বারান্দায় বসব।

রুমা বউদি দ্রুত উঠে গিয়ে লোকটিকে ঠেলতে লাগলেন। কিন্তু একজন বয়স্ক পুরুষের সঙ্গে গায়ের জোরে পারবেন কেন? সে লোকটাও জোর করছে।

আমাদের পাড়ার বউদি, তাঁকে আমার সাহায্য করা উচিত না? আমিও উঠে গিয়ে ঠেলতে লাগলুম লোকটাকে।

দু'জনে মিলে তাকে নিয়ে গেলুম ঘরের মধ্যে।

এবারে আমার ক্ষীণ সন্দেহ হল, লোকটা পাগল নাকি? রুমা বউদির কোনও আত্মীয়? এর কথা নিজের স্বামীকে জানাবার ব্যাপারে কোনও বাধা আছে?

আমার সাহায্য নিলেন বটে, কিন্তু তাতে খুশি না হয়ে রুমা বউদি বললেন, তুমি এর গায়ে হাত দিতে গেলে কেন?

লোকটি বলল, এ ছোঁড়াটা আবার কে!

রুমা বউদি বললেন, মনে তো হচ্ছে পুলিশের দালাল!

লোকটি বলল, বাঃ, খোঁজ পেয়েছে শেষ পর্যন্ত! তবে যে শুনেছিলুম, রাস্তা খারাপ বলে এ গ্রামে কখনও পুলিশের গাড়ি ঢোকে না। খুব সেইফ জায়গা!

রুমা বউদি বললেন, ও এসেছে সাইকেল রিকশায়।

লোকটি বলল, আইডেন্টিফিকেশান হয়ে গেছে? চিনতে পেরেছ আমাকে?

রুমা বউদি বললেন, তা কি আর চিনতে বাকি আছে! শুধুমুদু কি আর ও আমার পিছু

www.amarboi.com

লেগেছে?

লোকটি স্বামী বিবেকানন্দের ভঙ্গিতে বুকের ওপর হাত দু'খানা তাড়াতাড়ি রেখে খানিকটা গর্বের সঙ্গে বলল, আমিই ধৃতিকান্ত বাগচী!

পৃথিবীর অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিরই আমি নাম জানি না। এই নামটিও আমার সম্পূর্ণ অজানা।

রুমা বউদি বললেন, তা হলে আর কী! আপনি চলে যান এর সঙ্গে। তারপর আমার যা হবার তা হবে।

ধৃতিকান্ত নামে লোকটি বলল, ইস্, বললেই হল। আমি মোটেই সাইকেল রিকশায় যেতে পারব না। আমার কোমরে বাত আছে। আমি জিপ গাড়িতেও চাপতে পারি না!

রুমা বউদি আমার দিকে চেয়ে আর একটা কিছু বলতে যেতেই আমি হাত জোড় করে বললুম, রুমা বউদি, আমি ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারছি না। একটু যদি পরিষ্কার করে দেন—

বুঝতে পারছ না? ন্যাকা সাজছ? প্রত্যেকদিন খবরের কাগজে বেরুচ্ছে!

এ দেশের কত পারসেন্ট লোক কাগজ পড়ে বলুন? আমিও না পড়ার দলে।

ধৃতিকান্ত বলল, তুমিও কাগজ পড়ো না? বেশ বেশ! যারা খুন জখমের গল্প ভালবাসে, তারাই খবরের কাগজ পড়ে। তবে এখন আমার নাম বেরুচ্ছে তো, তাই কিনে আনাই। হ্যাঁ, ভাল কথা, রুমা দেবী, আমায় কিছু হাতখরচ দিতে হবে! পান-সিগারেট আনাতে হয়।

রুমা বউদি বললেন, হাতখরচ দেব না ছাই দেব! আর এক পয়সা খরচা করব না। আপনাকে বলেছি না চলে যেতে। আপনি ফ্রি। চলে যান, এক্ষুনি বিদায় হোন! গেট আউট!

ধৃতিকান্ত হা হা করে হেসে উঠে বললেন, ইস্, গেট আউট বললেই হল! ধরে আনার সময় মনে ছিল না? এখন আমি নিজে নিজে চলে যাব কেন? আমাদের ফ্যামিলির একটা প্রেস্টিজ নেই!

আমি প্রায় আপন মনেই বললুম, ধরে আনা হয়েছে মানে?

ধৃতিকান্ত বলল, ফেমাস অ্যাবডাকশান কেস! গোল্ডেন জুবিলি জুট মিলের অন্যতম মালিক ধৃতিকান্ত বাগচী রিভলবার দেখিয়ে অপহরণ। কাগজে একটু ভুল লেখে, জুট মিলে আমার মালিকানা হাফ নয়, থারটি ফাইভ পারসেন্ট! এই যে মেয়েছেলেটিকে দেখছ, একটা ডাকাত দলের সর্দারনি! আজকাল গৃহবধূরাও এ লাইনে নেমেছে!

রুমা বউদি বললেন, খবরদার, মেয়েছেলে বলবেন না। আপনার শিক্ষা-দীক্ষা নেই? আমি মোটেই সর্দারনি নই! দলে সাতজন ছিল। দু'জন দিল্লির আর একজন ভাইজাগের আর তিনজন লোকাল। রিভলবার, বোমা, গাড়িটাড়ি ওরাই ব্যবস্থা করেছে। আমার দায়িত্ব শুধু কিছুদিন লুকিয়ে রাখা। এই বাড়িটা ভাড়া করতে হয়েছে।

ধৃতিকান্ত বলল, কত র্যানসাম চেয়েছিল জানো? আড়াই কোটি! এত ছোট নজর। অন্তত পাঁচ কোটি চাইবে তো! তা হলে লোকের চোখে আমার দাম বেড়ে যেত!

রুমা বউদি বললেন, আবার চালিয়াতি! ফতো কাপ্তেন! আড়াই কোটির বদলে যদি

www.amarboi.com

দু' কোটিও দিত। আমার শেয়ার ছিল পঁয়তাল্লিশ লাখ। সেটা পেলে আমার কত সমস্যা মিটে যেত! তোমাদের দেবেনদা ধারে একেবারে ডুবে আছে, বাড়িটা প্রমোটারকে দেওয়া যাচ্ছে না, কতবার বলেছি লটারির টিকিট কাটতে—

এইবার বোধহয় রুমা বউদি কেঁদেই ফেলবেন।

কোনও রকম অভিজ্ঞতা ছাড়াই এ লাইনে এসেছেন বোঝা যাচ্ছে। মানুষ অপহরণ! খুব চলছে বটে আজকাল। দু'-একটা কেসে তো ধরাও পড়ে। প্রত্যেক কেসেই দেখা যায়, একজন না একজন মহিলা জড়িত!

ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করে একটুখানি কেঁদে নিয়ে রুমা বউদি বললেন, এমন ছ্যাঁচড়া পার্টি, দু' কোটি থেকে নামতে নামতে দেড় কোটি, এক কোটি, পঞ্চাশ হাজার চাওয়া হল, তাতেও ওর বাড়ির লোক রাজি নয়!

ধৃতিকান্ত ডান হাতের বুড়ো আঙুল নাড়তে নাড়তে বললেন, লবডঙ্কা, লবডঙ্কা! তোমাদেরও যেমন বুদ্ধি, জুট মিলের অবস্থা কী, সে খোঁজখবরও নাওনি আগে! লালবাতি জ্বলে গেছে। এখন মারোয়াড়িদের কাছে বেচতে গেলেও যাচ্ছেতাই দাম দিতে চাইছে। একজন মারোয়াড়ি তো বলে গেল, একটা টাকায় ছেড়ে দিন! বোঝো অবস্থা।

রুমা বউদি বললেন, আমার নিজের অনেক খরচ হয়ে গেছে। কিছু পাবার আশা নেই বলে কেটে পড়েছে অন্য পার্টনাররা। আমি একলা চুরির দায়ে ধরা পড়ব শেষ পর্যন্ত। কোর্টে মুখ ঢেকে যেতে হবে! অন্তত কুড়ি হাজার টাকার ব্যবস্থা করুন না, মাত্র কুড়ি হাজার, আমার গয়না বেচে এই টাকা খরচ করেছি।

আমার বাড়ির লোক তো এক পয়সাও দিতে পারবে না বলে দিয়েছে।

কেন দিতে পারবে না? আপনার বউয়ের গয়না নেই? আপনার যদি একটা কিছু হয়ে টয়ে যায়!

আমার বউ গয়না বিক্রি করবে? পাগল নাকি। সব গয়না পরে সে স্বর্গে যাবে। আজকাল বিধবা হলেও নিরামিশ খেতে হয় না, সাদা শাড়িও পরতে হয় না, আমি মরে গেলেও তার কোনও ক্ষতি নেই!

এরকম অদ্ভুত ফ্যামিলির কথা কখনও শুনিনি! তিন-তিনবার আপনাকে মেরে ফেলার ভয় দেখানো হয়েছে, তাতেও কারও তাপ-উত্তাপ নেই।

যে বাড়ির ব্যবসায়ে লালবাতি জ্বলে, সে বাড়ির লোকের এরকমই হয়! একজন ফ্যামিলি মেম্বার কমে গেলেই ভাল।

তা হলে সব ব্যাপারটা চুকিয়ে ফেললেই তো হয়। আমার যা ক্ষতি হবার তা তো হয়েছেই। অন্যরা সবাই কেটে পড়েছে। আপনি ভালয় ভালয় বাড়ি চলে যান! সাইকেল রিকশায় না যেতে চান, ট্যাক্সি ভাড়া দিয়ে দিচ্ছি, একটুখানি হেঁটে গেলেই বড় রাস্তায় ট্যাক্সি পেয়ে যাবেন!

আহা-হা হা, অত সস্তা! আমি ওরকমভাবে যাব, আমার একটা মান-সম্মান নেই? হয় বাড়ির লোক টাকা দিয়ে আমাকে ছাড়াবে, নয় তো পুলিশ এসে আমাকে উদ্ধার করবে! পুলিশ উদ্ধার করলে কাগজে আমার ফটো বেরুবে। নইলে আমায় আর কেউ পাত্তাই দেবে না!

www.amarboi.com

রুমা বউদি আমার গায়ে একটা চাপড় মেরে বললেন, এই তো একটা পুলিশের লোক, এর সঙ্গে যান!

ধৃতিকান্ত বাগচি আমার আগাপাশতলা চোখ বুলিয়ে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন, এই চ্যাংড়া পুলিশ দিয়ে চলবে না। আমি একখানা জুট মিলের মালিক, আমাকে উদ্ধার করতে অন্তত ডি আই জি র‍্যাঙ্কের কোনও অফিসারকে আসতে হবে! টি ভি'র লোকদের খবর দিতে হবে!

রুমা বউদি ব্যাজার মুখ করে বললেন, বায়নাক্কার শেষ নেই! বলে, ছোলার ডাল খাব না। তরকারিতে কুমড়ো থাকলে খাব না। রোজ দই চাই। দুপুরে একটা করে সন্দেশ চাই!

ধৃতিকান্ত বললেন, শেষ পাতে একটা সন্দেশ খাওয়া আমাদের ফ্যামিলির বহুকালের ট্র্যাডিশান। এখন সন্দেশের সাইজ ছোট হয়ে এসেছে। তবু থাকে।

আতপ চাল ছাড়া মুখে রোচে না।

ধরে আনার আগে খোঁজ নেওয়া উচিত ছিল। আমি কী কী খাই আর খাই না! কালকে বাটা মাছ দিয়েছিল, আমি ফেলে দিয়েছি। আমি কাঁটা মাছ খেতে পারি না।

রুমা বউদি আবার কাঁদো কাঁদো হয়ে বললেন, আমি আর এভাবে কতদিন টানব? নীলু, তুমি যাও না, তোমাদের কোনও বড় পুলিশকে ডেকে আনো। তারপর যা হয় হোক!

রুমা বউদি, বিশ্বাস করুন, আমি পুলিশ নই। কোনও পুলিশকেই চিনি না।

তা হলে এখানে এসেছ কেন? তোমাদের দেবেনদার কাছে আমার নামে চুকলি কাটবে? সে কিছুই জানে না। আমি যে তার জন্যই এই ঝুঁকি নিয়েছি।

কাকতালীয় কথাটা শুনেছেন? সেইরকমভাবেই আপনার সঙ্গে আমার এখানে দেখা হয়ে গেছে। এই ভদ্রলোক যখন মুক্তি পেতে রাজি হচ্ছেন না, তা হলে আপনি হাত ধুয়ে ফেলুন। এখানে আর আসবেন না। এ বাড়িটা কার নামে ভাড়া নিয়েছেন?

অন্য নামে। কিন্তু এ ভদ্রলোক যদি না খেয়ে থাকতে শুরু করেন, কিংবা আত্মহত্যা করে ফেলেন, তখন আমি তার নিমিত্তের ভাগী হব?

ধৃতিকান্ত বললেন, হ্যাঁ, আত্মহত্যা করে ফেলতেও পারি। অনেক দিন আগে একবার ট্রাই করেছিলাম।

দেখেছ, দেখেছ, শুধু শুধু আমাকে বিপদে ফেলার মতলব!

হ্যাঁ, শুধু শুধুই বটে! ডাকাতদের সর্দারনিও সাজবে, অথচ দায়িত্বও নেবে না, তা কি হয়?

আবার সর্দারনি বলছেন? দলের মধ্যে কয়েকজনকে আমি চিনিই না, চোখেও দেখিনি!

ধৃতিকান্ত মুচকি মুচকি হাসতে হাসতে রুমা বউদিকে বললেন, তা হলে আমিই একটা বুদ্ধি দিচ্ছি! তুমি এক কাজ করো। তুমি নিজেই পুলিশকে খবর দাও যে আমি এখানে আছি।

রুমা বউদি বললেন, তারপর আমাকে কত বছর জেল খাটতে হবে? বিয়েটা তো ভাঙবেই।

www.amarboi.com

আরে ছি ছি, তোমার বিয়ে ভাঙুক, তা কি আমি চাইতে পারি? বিয়েটা টিকিয়ে রাখার জন্যই তোমার দেশের বাইরে থাকা দরকার। তুমি পুলিশকে টেলিফোন করবে, উড়ো টেলিফোন যাকে বলে, নিজের নাম বলবে না। তারপর তুমি কেটে পড়ো। বেশ কিছুদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকো।

আমার হাজব্যান্ড অফিসের কাজে সিকিম যাচ্ছে। সেখানে তার সঙ্গে চলে যেতে পারি।

বাঃ বাঃ, সিকিম খুব চমৎকার জায়গা। ওখানে কেউ ধরা পড়েছে, এমন শোনা যায়নি। বেশ কিছুদিন আর এমুখো হয়ো না। আমিও পুলিশের কাছে এক রহস্যময়ী নারীর কথা বলব, যার মুখ সব সময় ওড়নায় ঢাকা থাকত, যার উচ্চারণে পঞ্জাবি টান আছে—পুলিশ তাকে খুঁজে মরুক!

তাই করব? পুলিশকে ফোনে জানাব?

হ্যাঁ, আজই। দেরি করে লাভ কী!

কিন্তু পুলিশ এসে দেখবে, আপনি এখানে একা বসে আছেন। কোনও আসামি পাবে না। অন্তত একজন-দু'জন আসামিকে না ধরতে পারলে কি পুলিশের মানসম্মান থাকবে?

ধৃতিকান্ত একটু চিন্তিতভাবে বললেন, হুঁঃ, এটাও একটা সমস্যা বটে। দু'-একটা আসামি অন্তত ধরতে না পারলে খবরের কাগজওয়ালারা পুলিশকে নিয়ে নাচন-কোঁদন শুরু করবে। তা এ ছেলেটা থাকুক না আমার সঙ্গে। জোয়ান বয়েস, ওর আর কী ক্ষতি হবে! আমারও একজন কথা বলার সঙ্গী হবে এখানে।

রুমা বউদি করুণ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, নীলু, তুমি থাকবে? বলতে আমার লজ্জা করছে।

আমি? আমি এখানে থাকব? পুলিশ এসে আমাকে ধরবে? তারপর জেল খাটতে হবে?

তুমি তো বেকার। কিছুদিন থেকে এসো জেলে। শুনেছি, আজকাল জেলে খুব ভাল ব্যবহার করে, খাবারদাবারও ভাল দেয়। তোমারও বেশ একটা অভিজ্ঞতা হবে। কত রকম ক্যারেকটার দেখতে পাবে!

কতদিন?

বড় জোর বছর দশেক। তার বেশি কিছুতেই না। কিন্তু ভাই, তোমাকে একটু টর্চার সহ্য করতে হবে প্রথম ক'দিন। তখন আমার নাম বলে দেবে না তো?

এটা আর "যদি" নয়। বাস্তব। আসামি হিসেবে পুলিশ আমাকে ধরে জেরা করবে অবিরাম। আঙুলে আলপিন ফুটিয়ে দেবে। সিগারেটের ছ্যাঁকা দেবে ঊরুতে। তখনও কি আমি সব গোপন রাখতে পারব?

ধৃতিকান্ত বললেন, আরে না, না, দশ বছর হবে কেন? অপহরণের কেসে একবার উদ্ধার হয়ে গেলে তারপর কাগজওয়ালারাও আস্তে আস্তে এসব ভুলে যায়। পুলিশের অন্য কত কাজ আছে, তারাও আর এসব কেস সাজানো নিয়ে গা করে না। প্রমাণ অভাবে নব্বই দিনের মধ্যেই খালাস পেয়ে যাবে!

রুমা বউদি আমার একটা হাত চেপে ধরে কাতরভাবে বললেন, নীলু, প্লিজ, তুমি

www.amarboi.com

এইটুকু করবে না আমার জন্য? তোমাকে দেবেনদা আর আমি কত ভালবাসি। তুমি আমাদের ক্লাবের বলতে গেলে মধ্যমণি।

এ যেন কর্ণের প্রতি কুন্তীর ব্যাকুল আবেদন। ঠিক আছে, ‘আমি রব নিষ্ফলের, হতাশের দলে’!

রুমা বউদি আবার বললেন, নীলু, তোমার কথা সব সময় আমার মনে থাকবে। কারওকে বলতে পারব না, তবু বুকের মধ্যে থাকবে তুমি!

লজ্জায় আমার মাথা নুয়ে আসছে। রুমা বউদি যে আমায় এত ভালবাসেন, আগে একটুও টের পাইনি।

এই ভালবাসার বিনিময়ে নব্বইদিন কিংবা দশ বছর জেল খেটে আসা তো অতি সামান্য ব্যাপার।

আমি বললুম, না, না, এত করে বলছেন কেন, নিশ্চয়ই থাকব। আমার প্রাণ গেলেও পুলিশের কাছে আপনার নাম উচ্চারণ করব না। এক পঞ্জাবি মহিলার নাম ভেবে রাখছি।

রুমা বউদি বললেন, আমি দারোয়ানকে টাকাপয়সা দিয়ে এখুনি বিদায় করে দিচ্ছি। এ-বাড়িতে আর কারও না থাকাই ভাল। কিছু খাবারদাবার থাকবে। আপনারা চিন্তা করবেন না। কাল সকালের মধ্যেই চলে আসবে পুলিশ।

ধৃতিকান্ত বললেন, অন্তত ডি আই জি যেন হয়! আর টিভি-কেও উড়ো ফোন করো। ওরা আগে আসবে।

রুমা বউদি সিঁড়ির দিকে পা বাড়াতেই আমি বললুম, আপনি একদিন একটা ভিখিরি ছেলেকে একটা বেলুন দিয়েছিলেন, দেখে খুব ভাল লেগেছিল।

উনি অবাক হয়ে বললেন, তুমি কী করে জানলে?

আমি দেখেছি। সেই জন্যই তো ফলো করেছি আপনাকে।

রুমা বউদি খুব মিষ্টি করে হাসলেন এতক্ষণ পরে। মুখটা পরিষ্কার হয়ে গেল।

একটু পরেই জিপের শব্দ পাওয়া গেল, অর্থাৎ রুমা বউদির বিদায়। বারান্দা দিয়ে আমি উঁকি মেরে দেখলুম, রুমা বউদি দারোয়ান আর তার ছেলেকেও গাড়িতে তুলে নিয়েছেন।

সমস্ত বাড়িটা যেন হঠাৎ বড় বেশি নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

বড় হল ঘরটায় একটা খাট ছাড়া আর কোনও আসবাব নেই। সাদা দেওয়াল, তাতে গোল গোল ছোপ।

ধৃতিকান্ত তাঁর হাতের টেনিস বলটা দেয়ালে ছুঁড়ে আবার লুফে নিতে নিতে বললেন, হাঁটাচলা নেই, কোনও ব্যায়াম নেই, তাই এই বলটা নিয়ে খেলেছি দিনের পর দিন। এখন তোমার সঙ্গে খেলব। একটা জিনিস লক্ষ করলে? আমি কতক্ষণ আগে চা খেতে চেয়েছিলুম, মেয়েছেলেটি কিন্তু এক কাপ চা-ও দিয়ে গেল না। দারোয়ানকেও নিয়ে গেল, এখন কে আমাদের চা বানিয়ে দেবে!

দাঁড়ান, আমি দেখছি!

দারোয়ানের সেই কেরোসিন স্টোভটা রয়ে গেছে একই জায়গায়।

দুধ নেই, তবে কিছুটা চা আর চিনি আছে। দু’ গেলাস র চা বানিয়ে নিয়ে এলুম

www.amarboi.com

ওপরে।

তাতে একটা চুমুক দিয়ে ধৃতিকান্ত বললেন, বাঃ, বেশ! তুমি ওই মেয়েছেলেটির জন্য জেল খাটতে রাজি হয়ে গেলে এক কথায়?

আপনিই তো বললেন।

আমারটা তো কথার কথা। আমি তো আর জেল খাটব না। খাটবে তুমি!

অনেকদিন থেকেই আমার ইচ্ছে জেলের ভেতরটা একটু দেখে আসার।

মিছিলে লাফালাফি করেও তো জেলে যাওয়া যায়। তাতে মারধর করে না। পলিটিক্যাল প্রিজনার হলে খুব খাতির। এইসব ক্রিমিনাল কেসে বড্ড টর্চার করে। তুমি কি মেয়েমানুষটার নাম জানো?

মেয়েমানুষ, মেয়েছেলে কেন বলছেন? উনি একজন ভদ্রমহিলা। ওঁর নাম বলব না, প্রতিজ্ঞা করেছি।

তোমার ওই ভদ্রমহিলা অতি ধড়িবাজ। নইলে ডাকাতদের দলে ভেড়ে! আমার কি সন্দেহ হচ্ছে জানো? আমরা তো ওকে ছেড়ে দিলুম। এখন ও যদি কথা না রাখে? ধরো, ও পুলিশকে খবরই দিল না। সে ঝুঁকিই নিল না। স্বামীর সঙ্গে কেটে পড়বে সিকিমে। তখন আমরা কী করব? দিনের পর দিন বসে থাকব এখানে?

এটা আমি ভেবে দেখিনি।

আমার আরও সন্দেহ হচ্ছে, দু'একদিনের মধ্যেও যদি পুলিশ না আসে, তুমিও কোনও ছুতোয় সটকে পড়বে। সেটাই স্বাভাবিক। কী, তাই করবে না?

এ বুদ্ধিটা তো আপনিই আমাকে দিলেন।

আমি একলা পড়ে থাকব? এটা অন্যায় নয়! তোমার ওই ভদ্রমহিলার কাছে তুমি এটাও তো কথা দিয়েছ যে আমার সঙ্গে থেকে ধরা দেবে!

কাল সকাল পর্যন্ত। সেই কথা দিয়েছি, নিশ্চয়ই থাকব। কিন্তু কাল দুপুরে আমার একটা কাজের কথা মনে পড়ে গেছে!

ধৃতিকান্ত আর আমি বল লোফালুফি খেললুম কিছুক্ষণ। কিন্তু তাতে কি আর সময় কাটে?

এর মধ্যে সন্ধে হয়ে এসেছে।

এ বাড়িতে ইলেকট্রিসিটির লাইন কাটা। ঘরে রয়েছে একটা মাত্র মোম।

এক সময় বাইরে থেকে ডাক শোনা গেল, নীলু, নীলু!

চমকে উঠে ধৃতিকান্ত বললেন, ওই কি পুলিশ এল? দেখো তো ক'জন?

আমি বললুম, না, পুলিশ নয়। এ আমার এক বন্ধুর গলা। এখানেই থাকে।

বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াতেই রাস্তা থেকে দুলু বলল, কীরে, এখানে আর কতক্ষণ থাকবি? কী হচ্ছে ভেতরে?

সে রকম কিছু না।

আয়, নেমে আয়!

দুলু, আজ রাতটা আমি এখানেই থাকব। না, না, তুই যা ভাবছিস, তা নয়। রুমা বউদি চলে গেছেন অনেকক্ষণ। অন্য একজন ভদ্রমহিলা রয়েছেন। তোকে সব ব্যাপারটা পরে

www.amarboi.com

বলব।

তুই আমার বাড়িতে আসবি না? তোর জন্য খিচুড়ি রাঁধলুম এত যত্ন করে।

ধৃতিকান্ত আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন। তার দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করলুম, আমি কি ঘণ্টা খানেকের জন্য ঘুরে আসতে পারি? আপনি একলা থাকতে পারবেন? আপনার নিশ্চয়ই অভ্যেস হয়ে গেছে?

ধৃতিকান্ত বললেন, কী দিয়ে খিচুড়ি রেঁধেছে?

সেটা জিজ্ঞেস করতেই দুলু বলল, মুসুরি আর সোনা মুগ মিশিয়ে।

ধৃতিকান্ত বললেন, বাঃ, গোটা গোটা পেঁয়াজ দিয়েছে?

দুলু বলল, পেঁয়াজ আর আলু।

ধৃতিকান্ত অভিমানী শিশুর মতন বললেন, তোমার বন্ধু এত ভাল খিচুড়ি রেঁধেছে, আর তা আমাকে খেতে বলবে না? এই তোমাদের ভদ্রতা? ঠিক আছে যাও। আর তোমার সঙ্গে কথা বলব না!

আরে না, না, চলুন, চলুন!

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমরা চলে এলুম রাস্তায়। দুলুর সঙ্গে ধৃতিকান্তর আলাপ করিয়ে দিয়ে বললুম, বাকি গল্পটা পরে শুনবি!

খানিকটা হাঁটার পর গোল্ডেন জুবিলি জুট মিলের অন্যতম মালিক ধৃতিকান্ত বাগচি চুপি চুপি দুলুকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার বাড়িতে কি একটু আচারটাচার আছে? আঃ কতদিন যে আচার দিয়ে খিচুড়ি খাইনি! প্রায় এক মাস হয়ে গেল!

---

www.amarboi.com

www.amarboi.com

www.amarboi.com

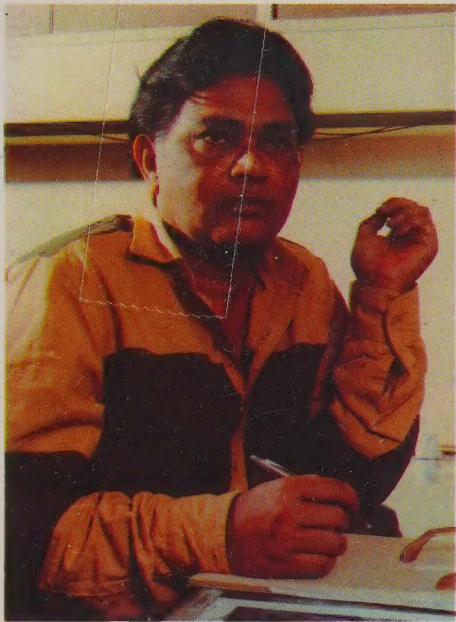

নীললোহিত এক ভ্রাম্যমাণ যুবক, যার বয়স কিছুতেই সাতাশের বেশি বাড়ে না। আজও কোনও চাকরি পায়নি সে, অথচ চাকরি-খোঁজার দিকেও মন নেই। সে এমন-এমন জায়গায় যায়, যা পৃথিবীর অনেকেই খুঁজে পায় না। কখনও তাকে দেখা যায় গানের জলসায়, কখনও রাস্তায় কাটা ঘুড়ির পিছনে দৌড়তে, কখনও জঙ্গলে, কখনও বাংলার অজ পাড়াগাঁয়ে, কখনও অনাহূতভাবে নেমন্তন্নবাড়িতে, কখনও-বা সাহেব-মেমদের দেশে। সে মিথ্যে কথা বলে বটে, কিন্তু সেগুলো সাদা মিথ্যে, একেবারেই কালো মিথ্যে নয়।
বহু মানুষের সঙ্গে সে মেশে, কিন্তু নিজে মিশে যায় ভিড়ের মধ্যে, তাকে চেনা যায় না। কখনও-কখনও তার সঙ্গে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের দেখা হয়ে যায়।

www.amarboi.com

প্রচ্ছদ সমীর সরকার

'পঞ্চশরের একটি কম' গল্পের আদি-অন্ত ছেয়ে আছে এক মিষ্টি প্রেমের আবহে। 'গভীর রাতে দিঘির ধারে' উপন্যাসের কাহিনী জুড়ে এক আধিভৌতিক বাতাবরণ। 'কর্ণ-রুমাবউদি সংবাদ' উপন্যাসের নায়িকা রুমাবউদির আছে মহাভারতের কুন্তীর মতো এক গোপন ভুবন। কী সেই জীবন? কর্ণের মতো নীললোহিতও কি সেই গোপনীয়তা জেনে ফেলেছিল?

9 788177 562583

www.amarboi.com

T2-BHP-500